ISSN: 2348-487X

# এবং প্রান্তিক

An International Research Refereed Journal
DIIF Approved Impact Factor : 2.29
Issue 4th Vol. 11th January, 2017

কমলকুমারের জনগণনাবীক্ষা

শ্লীলতা : অশ্লীলতা আর সাহিত্য

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আধুনিক কথকতা

বাংলা কবিতা : মহিলার কবিতা

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে কথা-নিরীক্ষা

সাহিত্য, সংস্কৃতি : মুসলমানী পদাঙ্ক

মাহফুজা : আধুনিক জীবনদেবতা

সম্পাদক
আশিস রায়

# এবং প্রান্তিক

An International Research Refereed Journal
DIIF Approved Impact Factor : 2.29
Issue 4th Vol. 11th January, 2017

এবং প্রান্তিক

*Ebong Prantik*
An International Research Refereed Journal

Issue : 4th Vol. 11th January, 2017

ISSN No. : 2348-487X

প্রকাশ : ১৫ জানুয়ারি, ২০১৭

প্রকাশক : এবং প্রান্তিক
আশিস রায়
ভগবানপুর, বি.এইচ.ইউ, বারাণসী - ২২১০০৫
কথা - ৯৩৩২৩৫৮৬৪৪, ৯৪১৫২৪৩৮১৬

প্রাপ্তিস্থান : দে'জ, দে বুক স্টোর (দীপু), পাতিরাম,
ধ্যানবিন্দু, তিলোত্তমা বুক স্টল, দিয়া

মুদ্রণ : অনন্যা
বুড়ো বটতলা, কলকাতা - ৭০০ ১৫০
যোগাযোগ - ৯১৬৩৯৩১৪৬৫

বিনিময় মূল্য : ১৩৫ টাকা

* লেখার দায়িত্ব লেখকের নিজস্ব। সম্পাদকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই পত্রিকার কোনো অংশের কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না।

# Ebong Prantik

An International Research Refereed Journal

## Editorial Board

**Executive Editor-** Prof. Bratati Chakravarty

**Associate Editor -** Pronab Naskar

**Editor-** Ashis Roy

**Co-Editor-** Tumpa Bapari, Tapas Kr. Sardar, Sujay Sarkar

**Advisory Board-** Bibhabasu Dutta, Biswajit Karmakar, Soma Mukherjee, Tarun Kr. Mandal, Akash Biswas, Asish Kr. Sau, Mrinmoy Paramanik, Md. Intaj Ali, Mohan Kr. Mayra, Parimal Roy, Swapan Majumder

**Expert Members-**

Dr. Alokranjan Dasgupta (Hedelberg University)
Dr. Achinta Chatterjee (California University)
Dr. Alokesh Dutta Roy (Scientist/Pharmaceuticals,Boston)
Dr. Manas Majumdar (Calcutta University)
Dr. Samar Ghosh (Principal Scientist, FIE, ICAR/Govt.of India)
Dr. Subalkumar Maity (Ex-Scientist, Min. of Ayush)
Dr.Tarun Mukhopadhyay (Calcutta University)
Dr. Sanatkumar Naskar (Calcutta University)
Dr. Soumitra Basu (Rabindrabharati University)
Dr. Himabanta Bandyopadyay (Rabindrabharati University)
Dr. Srutinath Chakraborty (Vidyasagar University)
Dr. Sucharita Bandyopadhyay (Calcutta University)
Dr. Bikash Roy (Gour Banga University)
Dr. Srabani Pal (Rabindrabharati University)
Dr. Monalisa Das (Kazi Nazrul University)
Dr. Mohinimohan Sardar (West Bengal State University)
Dr. Sk. Rafikul Hossain (Calcutta University)
Dr. Sandipkumar Mandal (Presidency University)
Dr. Uttamkumar Biswas (Presidency University)
Dr. Tania Hossain (Waseda University)
Dr. Soumitra Shekhar (Dhaka University)
Dr. Sumita Chatterjee (Banaras Hindu University)
Dr. Samaresh Debnath (Dhaka University)
Dr. Bhuina Iqbal (Chattagram University)

# সূচিপত্র


**সম্পাদকীয়** ৭

**কমলকুমার মজুমদার : লোকায়তের স্তরে-বিন্যাসে**
*ড. হিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায়* ৯

**সাহিত্যের শ্লীলতা-অশ্লীলতা প্রসঙ্গে কিছু কথা**
*ড. ব্রততী চক্রবর্তী* ৩২

**মেয়েদের কবিতা (১৯৫০-২০০০) ঃ বহমান অভিজ্ঞতার কথালিপি**
*ড. অপর্ণা রায়* ৩৫

**পুনর্নির্মাণে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন**
*ড. সনৎকুমার নস্কর* ৪৭

**বনফুলের 'তাজমহল' : শৈলীগত পাঠ**
*ড. বিভাবসু দত্ত* ৭০

**ভাষার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের উপন্যাস : ১৯৪৭ পরবর্তী পর্যায়**
*ড. মোনালিসা দাস* ৭৬

**আন্তঃসম্পর্কের আলোকে সমাজ ও সাহিত্য**
*ড. শিপ্রা সরকার* ৮২

**বাংলায় মুসলমানদের আগমণের সূত্রে সাহিত্য সংস্কৃতির স্থায়ী চিহ্নের অনুসন্ধান**
*ড. অরিজিৎ ভট্টাচার্য* ৮৯

**'কোয়েলের কাছে' : পালামৌর কাছে**
*তাপস রায়* ৯৮

**মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই-নহে কিছু মহীয়ান : নজরুল**
*ড. নন্দকুমার বেরা* ১০৩

**সরস্বতী ব্রাহ্মী**
*ডা. সুবলকুমার মাইতি* ১০৬

**বৈষ্ণবধর্মে হেমলতা ঠাকুরাণীর ভূমিকা**
*বিজলি দে* ১১০

**মাহফুজার সাথে কয়েক মুহূর্ত**
*সৌরভ চক্রবর্তী* ১১৫

**তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি' : এক কবিয়ালের জীবন সংগ্রাম**
*সুবর্ণা সিকদার* ১২৩

**রামকুমারের ছোটোগল্পের ঐতিহ্য : 'প্রিয়াঙ্কার ছেলেই'**
*প্রণব নস্কর* ১২৮

**বাংলায় সংগীতবিদ্যা ও ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী**
*নীলাংশু অধিকারী* ১৩৯

**শুভবিবাহ : অন্তঃপুর ও অন্তঃপুরিকাগণের জীবন্ত আলেখ্য**
*মৌমিতা তালুকদার* ১৪৯

**অপূর্ব্ব সতী : এক বিস্মৃত মহিলা নাট্যকারের নাটক**
*শুভশ্রী পাত্র* ১৫৬

**শেষ খেয়া ঃ পূর্ণাঙ্গ পাঠভিত্তিক বিবেচনা**
*ড. দেবকুমার ঘোষ* ১৫৯

**বাণী বসুর গল্পে বাঙালি দাম্পত্যের রূপ**
*রূপশ্রী ঘোষ* ১৬৪

**'তালনবমী' : এক স্বপ্নভঙ্গের আখ্যান**
*সুশান্ত মণ্ডল* ১৭৩

**জীবনানন্দ দাশ এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কাব্যভাবনায় ঐক্য ও বৈপরীত্য**
*সন্দীপকুমার মণ্ডল* ১৭৭

# *সম্পাদকীয়*

দেখতে দেখতে দশটি সংখ্যায় পা দিল 'এবং প্রান্তিক'। বয়সেও পা দিল চার বছরে। সংক্ষিপ্ত হলেও কষ্টকর দীর্ঘ এই যাত্রায় আমাদের অভিজ্ঞতার ঝুলিটি বেড়েছে। আমরা বারে বারে নিজেদের প্রশ্নমুখী করেছি — 'এবং প্রান্তিক' প্রকাশ কেন করছি, কি তার উদ্দেশ্য? কেন করব পত্রিকা নিয়মিতভাবে? পকেটের কড়ি গচ্ছা দিয়ে লিটল ম্যাগাজিন বার করার নেশায় কোনো কোনো পত্রিকা সাহিত্যে স্থায়ী দাগ রেখে গেছে — তার চরিত্রের জন্য, তার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের ও অভিমুখের জন্য। বলতে দ্বিধা নেই, আমরা সেই রকম কোনো মহান ও মহৎ ব্রতের দিশা এখনও দিতে পারিনি। পরিকল্পনাবিহীনভাবে কিছু প্রবন্ধ প্রকাশ করা ছাড়া এখনও আমরা তেমন কিছু করে উঠতে পারিনি; মানের দিক থেকে যাই হোক।

না-পারার মধ্য দিয়ে আমরা অর্জন করেছি অনেক অভিজ্ঞতা; উপলব্ধি করেছি, বিদ্বৎজনদের নিয়ে আমরা এখনও তেমন সংঘঠিতভাবে প্রাবন্ধিকগোষ্ঠী গড়ে তুলতে পারি নি। এক ছাতার তলায় আনতে পারি নি মেধাবী সুশিক্ষিত-স্বশিক্ষিত চিন্তকদের। আমাদের আয়োজন, প্রয়াস, অনুসন্ধান জারি রইল, তার সঙ্গে রইল সাদর আমন্ত্রণ প্রকৃত মেধার, চিন্তার, জিজ্ঞাসার, কৌতূহলীদের। সাহিত্য-সংস্কৃতি-সমাজভাবনার ওপর রচনার জন্য আমাদের দরজা উন্মুক্ত। সাদরে গৃহীত হবে ভালো রচনা। আপনারা 'এবং প্রান্তিকে'র অন্দরমহলে পদার্পন করুন।

আমাদের দ্বিতীয় ভাবনার মধ্যে রয়েছে প্রকৃত গবেষণায় উৎসাহ। সর্বভারতীয় গবেষণা প্রকাশের ছাড়পত্র পাওয়ায় আমরা সর্বভারতীয় ভাষার রচনা প্রকাশ করব। ভাষার ভেদ ভুলে প্রকৃত গবেষকরা আসুন। নিছক ডিগ্রি প্রত্যাশীদের নয়, রুচিশীল-চিন্তা, মেধার একটি সংঘঠিত বাহিনী গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য — যেমনটা 'সবুজ পত্র' পেরেছিল। বিগত শতাব্দী, যে শতক মনীষী গড়েছিল — তেমন উর্বর শতক নয় বর্তমান সময়টা জানি, তবু মধ্যমেধার মধ্যেও কোথাও উর্বর ও প্রান্তিক কতিপয় মানুষ নিশ্চয়ই বর্তমান, আমরা তাঁদের সন্ধানে অনলস অনুসন্ধানী। আপনাদের মণীষার ভাগ দিন আমাদের, আমরা তা সাধারণ্যে বিতরণ করে ধন্য হই। আমাদের দায়বদ্ধ করুন।

বর্তমান সংখ্যাটিতে কয়েকটি রচনাকে এক মলাটে নিয়ে এসে চেষ্টা করা হয়েছে বিষয়ের বৈচিত্র্যকে বর্ণময় করার। ইঙ্গিত দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে আমরা কেমন ও কী জাতীয় রচনা চাই। কাঙ্ক্ষিত রচনা আমরা পাইনি। ফলে এ সংখ্যাও ততটা পরিকল্পনার পরিশীলিত ফসল নয়। আগামী সংখ্যার থেকে আমরা পরিকল্পনা রেখেই এগতে চাই। মেধাবী পাঠক ও মেধাবী রচয়িতার মেলবন্ধন চাই। আপনারা সহায়তার হাত বাড়ান।

১৫ জানুয়ারি, ২০১৭

# কমলকুমার মজুমদার : লোকায়তের স্তরে-বিন্যাসে

**ড. হিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায়***

পশ্চিমবঙ্গের প্রথম সেনসাস কমিশনার অশোক মিত্র একটি সাক্ষাৎকারে আমাকে বলেছিলেন, ''তাঁর (কমলকুমারের) মতো শিক্ষিত মানুষ আমি দেখিনি।... তিনি জানতেন না, কি?'' শিক্ষিত বলেই কমলকুমারকে তিনি সেনসাসের কাজে নিয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল এই কাজটি 'তিনি ছাড়া আর কেউ পারতেন না।' তাহলে কমলকুমার জনগণনার কাজে নিযুক্ত হবার আগেই রীতিমতো সুশিক্ষিত এবং স্বশিক্ষিত দুই-ই হয়ে গিয়েছিলেন। অশোক মিত্রের মতো ঝানু আই সি এস কমলকুমারের বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি, তাদের জীবনজীবিকা সম্বন্ধে অগাধ জ্ঞানের পরিচয়টি সামান্য কয়েকটি কথাবার্তাতেই জেনে গিয়েছিলেন এবং তাঁকে সেনসাসের কাজে লাগিয়েছিলেন।[১] এতদিন যে কাজ ছিল প্রাণের আনন্দে, মনের খোরাক জোগাতে, খেলতে খেলতে যে বিদ্যা শেখা, তাকে, সরকারি প্রয়োজনে, বৈজ্ঞানিকভাবে নিয়মমাফিক ছকে ঢেলে — এক কথায় আকাডেমিক লেবেলে তথ্যানুগ রির্পোট লেখা কমলকুমারের এই প্রথম। যিনি প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মকানুন মানতে পারেন নি বলে, স্কুলের কড়াকাড়ি পছন্দ নয় বলে, স্কুল ছাড়েন, — সেই কমলকুমার জনগণনা বিভাগের নিয়মকানুন মেনে কাজে লেগে রইলেন, যোগ্যতার সঙ্গে কাজটি সমাপ্ত করলেন, বেশ বিস্ময়ের মতোই ব্যাপার। এর পেছনের কারণ, হয়ত, কর্মহীন, বেকার অথচ দুটি প্রাণীর অন্নজল জোগাড়ের চেষ্টা; এক কথায় পেটের টানে মুজরো খাটতে বাধ্য হয়েছিলেন। অশোক মিত্রকে প্রশ্ন করেছিলাম, কমলকুমার কি ও কাজে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন? গতবাঁধা কাজ মনে হয়নি? অশোক মিত্র এক কথায় জবাব দিয়েছিলেন, 'না। কমলবাবু এত আনন্দ বোধহয় আর কোন কাজে পাননি।' কথাটা যে কত খাঁটি তা বোঝা যায় কমলকুমারের লেখা কার্ডগুলি থেকে। মাঝে মাঝেই তিনি সারা পশ্চিমবঙ্গের কোন না কোন জেলায় গেছেন লোকসাংস্কৃতিক কৌতূহল মেটাতে। সেনসাস বিভাগে কাজ করাকালীন সেই দক্ষতাকে পূর্ণভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন, নিয়ম মেনে। তার থেকেই জন্ম নিয়েছে 'বাংলার টেরাকোটা'; 'বঙ্গীয় শিল্পধারা', 'বাংলার মৃৎশিল্প', 'ঢোকরা কামার', 'শোলার কাজ', 'পটকথা' প্রভৃতি বিস্ময়কর প্রবন্ধাবলী। প্রাণের তাগিদেই তিনি শুরু করেছিলেন লোক-সংস্কৃতির শেকড় সন্ধান। সেনসাস বিভাগে সে কাজ বৈজ্ঞানিক ধারা যুক্ত করেছিল।

সেনসাস রিপোর্টের ভূমিকায় (১৯৫১) অশোক মিত্র লিখেছিলেন: ''I asked Sri Kamal Majumdar and Chanchal Chattopadhyay if they would consider the

*অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়।

preparation of a good bibliography of articles, memories and book, published from ancient times of the present day on the natural resources, trade, commerce and industry of Bengal. The scope of the bibligraphical survey was discussed for sevral days and it was agreed that the best course would be to prepare a bibligraphy under several main heads together a connected account of the contests of the more important contribution on each subject." ১৯৫২ সালের মাঝামাঝি কমলকুমারের নিযুক্তি ও কাজের পরিধি বাস্তবে ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছিল চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে।[২]

সেনসাস রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, কমলকুমার মোট এগারোটি রিপোর্ট লেখেন, যার মধ্যে দুটি (৯ এবং ১১) চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে যুগ্মভাবে। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ কুটিরশিল্প সংক্রান্ত রচনাগুলিই ছিল কমলকুমারের। কমলকুমারের কাজের ধরনটি জানার ক্ষেত্রে রচনার তালিকাটি খুবই প্রয়োজনীয়।

১. Pith and pith Industry compiled : Page - 349

২. Samll boxes of various kinds compiled : Page - 357

৩. Two small Industry using cloth compiled

a. The umbrella : Page - 384

b. Oil cloth : Page - 389

৪. The biri Industry compiled : Page - 394

৫. Fishing in Bengal compiled : Page - 401

৬. Native Pottary compiled : Page - 436

৭. The Brush Industry : Page - 445

৮. The indigenous manufacture of Iron. : Page - 446

৯. A list of Iron implements in common use : Page - 456

১০. Brass and bell metal Industry : Page - 472

১১. Gold work : Page - 478.

সেনসাস বিভাগের কাজটি ছিল খুবই পরিশ্রম-সাপেক্ষ। সাইকেল নিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘোরার ধকল ছাড়াও ছিল তথ্য সংগ্রহের নানা ফ্যাকড়া। চঞ্চলবাবুর কাছে শুনেছি, কমলকুমারের অতি-আগ্রহ কখনো কখনো বিপত্তিও ঘটিয়েছে। গ্রামের মানুষরা সরল যেমন, তেমনি একগুঁয়েও। সংস্কৃতির গভীরতর তল পর্যন্ত যেতে গিয়ে কমলকুমারের অতি-আগ্রহ শ্রমজীবী নিরক্ষর গ্রামবাসীদের সন্দেহপ্রবণ করে তুলেছে কখনও, তিনি ঘুরপথে সরকারি প্রয়োজন মিটিয়ে নিতেন ঠিকই, কিন্তু কমলকুমার ছিলেন নাছোড়বান্দা। তাঁর দেশিমদ এক্ষেত্রে ভীষণ সহায়তা করেছিল। গ্রামের মানুষটির সঙ্গে গ্রামের মানুষটি হয়ে তাদের স্তরে নেমে যাবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল কমলকুমারের। সেই স্বভাবসিদ্ধ পূর্ব ক্ষমতায় কমলকুমার অনায়াসে তাঁর অভীষ্ঠ পুরন করতে পারতেন। যার ফলে দেখা যাচ্ছে, ১৯৫২

সালের পরে পশ্চিমবঙ্গের কুটিরশিল্পের ওপর এই জাতীয় তথ্যাশ্রয়ী কাজ আর দ্বিতীয়টি হয়নি। প্রতিটি শিল্পের বর্তমান অর্থনৈতিক ও তার বাস্তব ভিত্তির পরিপ্রেক্ষিতের পাশাপাশি সেই শিল্পের প্রাচীন ঐতিহ্য-সন্ধান শুধু সরকারের বিধিবদ্ধ তথ্য সংগ্রহ বা সার্ভেয়ারের শ্রমেই হয় না, তার জন্য লাগে অনুসন্ধানীর মৌলিক জিজ্ঞাসা, ধৈর্য, অধ্যবসায়, সর্বোপরি বুকভরা ভালবাসা। বহু প্রাচীন হাজার হাজার পুঁথি পত্রপত্রিকা ঘেঁটে ঠিক বস্তুটি খুঁজে বের করার মতন জেদ চাই এবং জানা দরকার বহু ভাষা। পশ্চিমবঙ্গের শ্রমশিল্পের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি যুক্ত আদিবাসী জনজাতির মানুষেরা। তাদের প্রাণের কথা জানতে হলে চাই তাদের ভাষা জানা। বিস্মিত হতে হয়, কমলকুমার কি নিষ্ঠায় সাঁওতালি ভাষা শিখছেন, কার্ডের পর কার্ডে লিখে রাখছেন সাঁওতালি শব্দের বাংলা অর্থ, সাঁওতালি প্রবাদ-প্রবচন। প্রবাদ-প্রবচনই একটা জাতির অর্ধেক পরিচয়, তাকে জানার কি প্রবল প্রয়াস কমলকুমারের। এখন সাঁওতালি ভাষাশিক্ষার বই লোকাল ট্রেনে হকারদের কাছেই পাওয়া যায়, ১৯৫২ সালে তা এত সহজ ছিল না। সাঁওতালি ভাষা কেবল বই পড়ে শেখা যায় না, যতক্ষণ না ঐ জনজাতির কাছাকাছি যাওয়া যায়। যাঁরা সাঁওতাল জনজাতি নিয়ে কাজ করেন, তাঁরা খুব ভালভাবেই জানেন, সাঁওতালরা এত সহজে নিজেদের খুলে দেন না, যতক্ষণ না ওঁদের বিশ্বাস অর্জন করতে পারছেন। কমলকুমার কিন্তু সফল হয়েছিলেন, সে ক্ষেত্রে। পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে কাজটি সীমাবদ্ধ থাকলেও কমলকুমার প্রায়ই গেছেন মানভূম জেলায়, যেটি তখনও পুরুলিয়া হয়নি, বিহারে অবস্থিত। আদিবাসী, মাহাত, মাহালি সম্প্রদায়ের মধ্যেও কাজ করেছেন কমলকুমার। প্রচুর ঝুমুর সংগ্রহ করেছিলেন। কমলকুমারই বোধহয় প্রথম ঝুমুর সংগ্রহ করে ছাপার অক্ষরে বিদ্বৎজনদের গোচরে আনেন। 'কয়েদখানা' গল্পে, 'অন্তর্জলী যাত্রা' 'পিঞ্জরে বসিয়া শুক' উপন্যাসে ঝুমুরের ব্যবহার আমাদের নজরে পড়েছে। টিলা ডুংরির আশপাশ থেকে সংগ্রহ করেছেন কেন্দুপাতা, লাক্ষা, কাঠসংগ্রহকারী জনজাতির অলিখিত জীবনেতিহাস।

এ-কি কেবল জনগণনা বিভাগের কাজের পরিধি মেনে? কমলকুমারের জানবার আগ্রহটা এমনিই—একেবারে শেকড় পর্যন্ত জানা চাই। হাঁপানির ভারে কাবু, তবু কমলকুমার বাসে ঝুলে গেছলেন মেদিনীপুরের গোপীবল্লভপুর; কেবল জানতে, এক বিলুপ্তপ্রায় রীতির শেষগুণীর কাছে খোলের বাদ্‌নপদ্ধতি। খোলের গড়ন, প্রকার, নির্মাণ-পদ্ধতি, পোয়ানের মাত্রা, নির্মাণস্থল এবং সর্বোপরি কীর্তনের চারটি অঙ্গের প্রধান অঙ্গীগায়কের গায়নরীতির পরিচয় জানতে — কারণ, এই গায়ক-ই চারটি আঙ্গিকের প্রথম অঙ্গের একমাত্র শেষ জীবিত গায়ক। শেষ জানতে লোকসংস্কৃতির যে-কোনো তল পর্যন্ত কমলকুমার যেতে প্রস্তুত। হাঁপানি কোন ছার, তার চেয়েও বড়ো বাধাকে পাত্তা না দিয়ে তিনি যেতে চাইতেন সংস্কৃতির অকুস্থলে — কমল-অনুচর অনিরুদ্ধ লাহিড়ির এমনই মত। এই সময়ের লিখিত কার্ডগুলি, যাতে কমলকুমার লিখে রাখতেন খুঁটিনাটি প্রাপ্ত তথ্য, যদি পাওয়া যেতো হয়ত

আরো বিশদে জানা যেতো কমলকুমারের কাজের পরিধি। খুবই দুঃখের বিষয়, কমলকুমার অপ্রয়োজনীয়জ্ঞানে সে-সব কার্ড যাকে-তাকে দান করেছেন। তাঁরা সেসব কাজে লাগিয়েছেন কৃতজ্ঞতাস্বরূপ কমলকুমারের নামোল্লেখ ছাড়াই। ডিগ্রির অভাবে কমলকুমার অর্জিত জ্ঞানকে ব্যবহারিক অর্থে কাজে লাগাতে পারেন নি। ফলে দেখা যাচ্ছে, সেই সব অব্যবহৃত জ্ঞানের ভাণ্ডারকে কাজে লাগাতে আসরে নামেন সুযোগসন্ধানীরা। নির্লোভ, সরল, ভদ্রলোক কমলকুমার অকাতরে সেসব তাঁদের দিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেছেন। কমলমধুতে পুষ্ট হয়েছেন বহু লোক, তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন বিনয় ঘোষ, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, শান্তি বসু ও সত্যজিৎ রায়।

মুখোশপরা শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের প্রতি কমলকুমারের একটি সময় এমন বিরক্তি জন্মেছিল, তিনি ঐ সমস্ত সুবিখ্যাত বিদ্বানদের সঙ্গ ত্যাগ করে সঙ্গী বেছে নিয়েছিলেন সাংস্কৃতিক জগতের সঙ্গে সম্পর্কহীন ব্যক্তিদের। কমলকুমার বলতেন, এঁরা আর যাই হোক হিপোক্রিট নয়, ঠকাবে না। কমবয়সী তরুণ, উঠতি লেখক-কবি, মাতাল, হুল্লোড়বাজরাই ছিল তাঁর সঙ্গী তারপর। শক্তি রায়চৌধুরীর কোনো সাংস্কৃতিক পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও তিনিই ছিলেন তাঁর নিত্যসঙ্গী। শিক্ষিত বলে পরিচিত হিপোক্রিট সংস্কৃতিমান মানুষদের সম্পর্কে কমলকুমারের কি মানসিকতা, শক্তি রায়চৌধুরীর কাছ থেকে শোনা, এখন প্রায় প্রবাদে পরিণত, কমলকুমার কথিত-বেদবাক্য; অনিরুদ্ধবাবুও তা উল্লেখ করেছেন : প্রসঙ্গটি হোল, সংস্কৃতি জগতের এক বাবু অধ্যাপক (নির্মাল্য আচার্য কি? শক্তি রায়চৌধুরী নামটি বলেন নি।) কমলকুমারকে অনুযোগ করেন শক্তিকে দেখিয়ে, ''ওই সব ওঁচাদের সঙ্গে মেশেন কি করে আপনি?'' কমলকুমার তৎক্ষণাৎ জবাব দেন, ''শক্তি ঠিক ওই কথাটাই বলছিল, 'ছি! কাদের সঙ্গে মেশেন আপনি। শেষকালে (বাবুটির নাম বলে) ওঁর মতো ওঁচার সঙ্গে!'' যা পছন্দ করেন না, তাকে প্রকশ্যে অস্বীকার করতে তিনি দ্বিধাবোধ করতেন না। শক্তি রায়চৌধুরী বলেছেন, 'একজন নামী অধ্যাপককে কমলকুমার 'টক' দিতেন খালাসিটোলায় প্রায়ই মদের বোতল খুলে। উন্নাসিক অধ্যাপকটি তা মেনে নিতেন নিজের কাজের গরজে। জেনে-বুঝে স্বীকৃত পণ্ডিতদের এড়িয়ে যাওয়া কমলকুমারের সাংস্কৃতিক মান, সৎ ও শুদ্ধ মনের প্রতি শ্রদ্ধার গভীরতর দেশ থেকে এসেছিল। তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্র কপটতা ছিল না বলে শুদ্ধতম জ্ঞানকে এক জীবনেই তিনি অর্জন করেন। একটি কথা তিনি প্রায়ই বলতেন, 'শুধু একটি ক্লাসিক্যাল প্যাসনই আমরা অ্যাফোর্ড করতে পারি, সেটি হল এনভি। — সবার চোখের রং সবুজ। গ্রিন-আইড মনস্টার সব শালা।' সত্যি তো, লক্ষ করিনি, অসুরদের চোখের রং সবুজ করে আঁকেন কুমোরেরা!

রাধাপ্রসাদ গুপ্তর টাটার উঁচু পদের চাকরিটি পেতে সাহায্য করেছিল কমলকুমার-অঙ্কিত কাঁথার ডিজাইনে করা ক্যালেনডারটি। এ বাবদ বরাদ্দ অর্থ কমলকুমারের ভাগ্যে জোটে নি। কমলকুমার সংগৃহীত অ্যানটিকের সবচেয়ে বড় ও ভালো খদ্দের ও দালালও ছিলেন

রাধাপ্রসাদ গুপ্ত। উপহার হিশেবে কমলকুমার রাধাপ্রসাদকে কিছু কিছু অ্যানটিক দিয়েছিলেন বলে নানা জনের কাছে শুনেছি। বসার ঘরভর্তি দুর্লভ অ্যানটিকের মাঝে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করাতে রাধাপ্রসাদ যথেষ্ট কুপিত হন আমার প্রতি।[৩] বিনয় ঘোষ সম্বন্ধে কমলকুমার নিজেই বলেছেন, 'ভদ্রলোক একটি প্ল্যান মানে method ছকিয়া দিতে বলিয়াছিলেন যাহার উপর তিনি কাজ করিবেন। অর্থাৎ বঙ্গ ও তৎনিকটস্থ অঞ্চলে মন্দির ও পোড়ামাটির কাজ (উহা ঠারে আছে) গৌণত পুতুল ও Soil ভাগ technique এই সব লিখিয়া দিতে অনুরোধ করেন—যাহার বশে তিনি কি বই লিখিবেন। আশ্চর্য কোন কথাই আজ মাস দুই-তিনের মধ্যে ভাঙ্গেন নাই!" শান্তি বসু কমলকুমারকে কীভাবে দুয়েছিলেন তার বিস্তৃত বিবরণ আছে মৎকৃত 'কমলকুমার মজুমদার : মুখ ও মুখোশের দ্বন্দ্ব" গ্রন্থের ২৯-৩০ পৃষ্ঠায়। এই সব পণ্ডিতপ্রবরদের সম্পর্কে কমলকুমার স্পষ্টতই অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন : 'আমরা কতটা কি জানি তাহা প্রমাণ করিতেই বিপদ ঘটিয়াছে। অথচ Mantaigue লেখার তলায় অজস্র উদ্বৃতি কিন্তু কি পর্যন্ত সরল। যেহেতু তাঁহার moi-meme সম্পর্কে যথেষ্ট পাকা ধারণা ছিল। আমি যে কি সেই সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান কোথায়? .....all falls!" পদের সিঁড়ি টপকে যাওয়ার জন্য তৈলমর্দন ও পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরকে যোগ্যতা-ধরা অধ্যাপক পদাধিকারীদের এই falls পাণ্ডিত্যের পরিচয় কমলকুমারের চেয়ে বেশি আর কে জানেন!

এই সমস্ত লা-পাতা কার্ডের মধ্যে কয়েকটি পাওয়া গেছে চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। কি আছে সে সব কার্ডে, সে-ত প্রকাশিতব্য; কি কি থাকতে পারে ওই সব লা-পাতা কার্ডগুলিতে, সেটাই প্রশ্ন। জনগণনার কাজের ধরন দেখে অনুমান করি, ছিল উৎপাদনের জেলাভিত্তিক পুঙ্খানুপুঙ্খ সার্ভে। ছিল, রং তৈরি হয় এমন গাছ-গাছড়ার ডাল পাতা ছাল শেকড়ের পরিচয়। ছিল, কি কি বীজ থেকে কি ধরণের কি পদ্ধতিতে তেল হয়, তার ব্যবহারিক বৈচিত্র্যের পরিচয়। ছিল, ঝুঁড়িবোনা বেত বাঁশ বনজ লতার রকম ও ব্যবহার-বিধি। ছিল, অর্থকরি গাছের বিবরণ; ম্যাচ বক্সের জন্য প্রকৃষ্ঠ কাঠের কথা। ছিল, মাটির ঘোড়ার জেলাভেদে গঠনবৈচিত্র্য ও থান দেবতার কাছে স্থাপনরীতি ও তার বিধিনিয়ম। ছিল, উলকির বৈচিত্র্য, অঙ্গভেদে ডিজাইন। খাদ্যাভ্যাস, সবজি কাটার রকম, দেয়ালচিত্রণ, পরিমাপক বস্তু — যথা, সের, পাই, পুয়া, ছটাক, কুনকোর গায়ে প্রতীক ও নকশার ব্যবহার; তেলের ভাঁড়ের ডিজাইন। বাঁশের তেল রাখার পাত্র বা কোঁড়া ও তার নকশা; চিরুনির উপাদান, স্থানভেদে গঠনবৈচিত্র্য, নকশা; গহনার বিবর্তন, গঠন ও আকৃতি; সাঁওতাল কুড়মিদের ধনুকের ডিজাইন ও নকশা; টাঙি কাস্তের হাতলে ও ফলায় ডিজাইন ও নকশা; শিকা'র বৈচিত্র্য, রন্ধনপাত্রের (মাটির) বৈচিত্র্য, নকশা ও গড়ন, অনুষ্ঠান ভেদে ব্যবহার-বিধি; টুসুখোলার বৈচিত্র্য, পিঁড়ি জলচৌকি, খাটিয়ার খুরায় (পায়া) নকশার বৈচিত্র্য; ঘরের খুঁটি ও মুধুনের গড়ন বিচিত্রতা ও নকশার বৈচিত্র্য, প্রাচীন পুঁথিপাঠের প্রতিক্রিয়া, স্থান-পরিক্রমার ফলে প্রাপ্ত তথ্য ও উপলব্ধি, তত্ত্ব, ইতিহাস, পুরাণ দর্শন, ভাষার তারিকা, খিস্তি-গালাগাল,

প্রবাদ-প্রবচন পর্যন্ত ওই সব কার্ডের ছিল বিষয়। সব তো জনগণনা বিভাগের কাজের বরাতের মধ্যে পড়ে না। তাহলে? এটাই কমলকুমার। এক সর্বগ্রাসী সাংস্কৃতিক খিদেয় কাতর, তাই মরীয়া অন্বেষক। সরকারী অনুসন্ধানের গণ্ডিতে তাঁকে বাঁধবে কে, তিনি দুহাতে লুটে নিচ্ছেন লোকসংস্কৃতিতে পরিপূর্ণ বাংলাদেশকে।

কমলকুমারের অনুসন্ধানরীতির দু-একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যেতে পারে।

সোলার কাজের অনুসন্ধান ও তার রিপোর্ট লিখিত হয় এভাবে : পৌরাণিক ভিত্তি হল, কৃষ্ণের মাথায় কংসের মালি ঠিকমতো মুকুট পরাতে না পারায় কৃষ্ণ তাদের শূদ্র করেন। ভারতচন্দ্রের বইয়ে জানা যায় যে মালাকাররা মিশ্র জাতি। জাহাঙ্গিরের আমলে মালাকাররা বাংলাদেশে migrated হন। মালাকাররা তিন ভাগে বিভক্ত : ১ বরেন্দ্র ২. রাঢ়ি এবং ৩. আটঘরিয়া। ঢাকা জেলায় এঁরা Dr. Wise এর মতে দুটি ভাগে বিভক্ত। যারা শোলার টোপর, গয়না বানায় তারা ফুলকাটা মালি আর যারা ফুল বিক্রি করে তারা দোকানি (দুকানি) মালি নামে পরিচিত। ধর্মের দিক থেকে সব মালাকারই বৈষ্ণব, গোঁসাই-এর শিষ্য। এদের গোত্র অল্পধারণ, কাশ্যপ ও শাণ্ডিল্য। পৌরাণিক-সামাজিক অনুসন্ধানের শেষে অর্থনৈতিক অনুসন্ধানও করেছেন কমলকুমার অসাধারণ সময় ও পরিশ্রমের বিনিময়ে। সোলার প্রকারভেদ, জমি অনুসারে গুণের ও দরের তারতম্য, সংগ্রহের তারিকা, বাজারমূল্য কত, কি কি প্রকারের গহনা হয়, বাজার কোথায়, নিজেরাই বিক্রি করে, না কি দালাল থাকে মাঝখানে ইত্যাদি বিষয়ের সুবিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন কমলকুমার।

কৈবর্ত সম্প্রদায় নিয়ে কমলকুমারের মত; এঁরা hybrid caste. 'কৈবর্ত' শব্দের সৃষ্টি হয়েছে সংস্কৃত কা (জল) এবং বৃত (সংযুক্ত) অর্থাৎ যারা জল নিয়ে জীবিকাবৃত, জলজীবী (Who are engaged on occupation in or on water) । এই জলজীবীরা দুভাগে বিভক্ত : হালিক কৈবর্ত আর জালিক কৈবর্ত। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও বৃহৎ ব্যাস সংহিতা অনুযায়ী জালিকরা হালিকদের চেয়ে উচ্চতর। কৈবর্তের জাতিগত বিভাগ, গোত্র, উপাধির বিবিধ পরিচয় ও কোন জেলায় বসবাসকারী তার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন কমলকুমার।

ভারতে দেশীয় লোহার উৎপাদন দেখাতে গিয়ে কমলকুমার পৌঁছে যান মিথ, বিশ্বাস, দেশাচার, লোকায়তধর্ম প্রভৃতি খুঁটিনাটি বিষয়ে। "It is customary to use this metal on many happy as well as unhappy occations of our daily life such as birth, churakaran, (cutting the hair), Upanayana (sacred theared ceremony) Marrige and Shardha." মেয়েদের বিয়ের সময় বাঁ হাতে একটি লোহার বালা পরানো হয়, যাকে 'নোয়া' বলে, সধবার প্রতীক। বিবাহিত মেয়েদের 'হাতের নোয়া অক্ষয় হোক' বলে আশীর্বাদ করা হয়। আঁতুড় ঘরের দরজায় লোহার পেরেক পোঁতা হয়, অসুস্থ রোগীর কাঁথার, বালিশের তলায় রাখা হয় কাস্তে। আইবুড়ো মেয়েরাও বাঁ হাতে লোহার বালা পরে থাকে, লোহা ডুবিয়ে সেই জলে বাচ্চাদের চান করানো হয়; যমের নজর থেকে বাঁচাতে, যার আগের বাচ্চাটি মারা গেছে, এরকম বাচ্চাদের পায়ে লোহার বালা পরানো হয়। সঙ্গে লোহা থাকলে

ভূতে ছোঁয় না — এই বিশ্বাসে কোমরের ঘুনসিতে লোহার টুকরো বাঁধা থাকে। এইভাবে লোহার সঙ্গে জনজীবনের গভীর সম্পর্ক খোঁজেন কমলকুমার।

কর্মকাররা বৃত্তি অনুসারে নয় ভাগে বিভক্ত, সাব কাস্টের বিভাগ আট। যথা : Iron smith, Silver smith, Brass smith, Gold smith, Khatra. (এরা লক্ষ্মী, পূজারসামগ্রী ও কাজললতা বানায়), Chand কামার (এরা ধাতু বা পেতলের আয়না বানায়), ঢোকরা (এরা নকশাদার পরিমাপক কুনকো বানায়), এবং Tamra কামার। অন্য subcaste নানা জেলায় নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে জীবিকার বদল ও সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে।

ছাতা বিষয়ে কমলকুমার বলেছেন, ইংরাজ আসার আগে পর্যন্ত ভারতে কৃতকৌশলগত উন্নতমানের ছাতার ব্যবহার ছিল না। গণ্যমান্যরা ছাতার ব্যবহার করতেন। সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য ছিল টোকা। ছাতার দেখাদেখি এই টোকা ছাতার রূপ ধারণ করে পরবর্তীকালে। ছাতা ইন্ডাস্ট্রি ছিল কুটিরশিল্প, ফ্যাকট্রি আইনের বাইরে। ১৮৬২ সালে বাংলায় প্রথম মহেন্দ্র দত্ত ছাতা ব্যবসা শুরু করে ছাতাকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেন। ১৯৫২ সালে কমলকুমারের মতে ৭৫টির মতো ছাতা ইন্ডাস্ট্রি ছিল।

প্রাচীন ভারতবর্ষে পদ অনুসারে ছাতা ব্যবহার করা হোত। মোঘল আমলে পদানুসারে ছাতা ব্যবহারের বিবরণ আবুল ফজলে আছে। মহাভারতেও ছাতাকে মর্যাদার চিহ্ন হিসাবে দেখা হয়েছে। ছাতার বর্ণ ও উপাদানভেদের ওপর মর্যাদাভেদ নির্ণিত হোত। ভালো কাঠের হাতল, ভালো বাঁশের শিক এবং স্কারলেট বর্ণের ঢাকনি দেওয়া ছাতা রাজার হাতে তুলে দেওয়াকে 'gift of warthy' হিসাবে ধরা হত। প্রাচীন ভারতে এর নাম ছিল 'প্রসাদ'। নীল কাপড়ের ঢাকনি দেওয়া সোনার হাতল-ওয়ালা ছাতা যখন রাজপুত্রদের দেওয়া হোত, তাকে বলা হোত 'প্রতাপ'। সুন্দরী কাঠের সোনাবাঁধা শিক ও হাতল, উপরে, কলস ও শাদা কাপড়ে ঢাকা ছাতাকে বলা হোত 'কনকদণ্ড'। সবচেয়ে সম্মানজনক ছাতা হোল, 'নবদণ্ড'। 'নবদণ্ড' ব্যবহার করা হত ''On occations of high state, such as coronations, the marriage of kings and princes and other royal celebrities.'' মোঘল পিরিয়ডেও ছাতা ছিল "Marks of divine vigore".

বিড়ি শিল্প কুটিরশিল্পের খোলস ছাড়াতে পারে নি আজও। কেন্দুপাতায় যে বিড়ি হয়, বিড়ি কেমন করে বানাতে হয় তা পোর্তুগিজরা ভারতবাসীকে জানায় ১৫০৪ সালে। কোন্ কোন্ জেলায় বিড়ি তৈরি হয়, তামাক, কেন্দুপাতা কোথা থেকে আসে, মজুরি কত, স্ত্রী, পুরুষ, বালক-বালিকা কতজন নিযুক্ত, কোন শ্রেণী থেকে শ্রমিকরা আসেন তার পূর্ণ বিবরণ লিখিত হয় গবেষকের নিষ্ঠায়।

এসব তথ্য জনগণনার রিপোর্ট থেকে খামচে তোলা। প্রকৃতপক্ষে কমলকুমারের কার্ডে লেখা নোটগুলি স-ছবি ও স-মন্তব্যে ভরপুর। কমলকুমার-লিখিত কার্ডগুলি হারিয়ে যাওয়া ভয়ানক সাংস্কৃতিক ক্ষতি। কমলকুমার লিখেছেন, 'কার্ডগুলি খোয়া গিয়াছে।' এই সমস্ত

কার্ডে-এক একটি বিষয় কিংবা একই কার্ডে অনেকগুলি বিষয় তিনি লিখে রাখতেন, সেগুলি পরে কোনো প্রবন্ধে ব্যবহার করতেন। ঠিক তাও নয়, কমলকুমার যা যা পড়তেন, সবই তিনি কার্ডগুলিতে নোট আকারে লিখে রাখতেন। তিনি জানতেন, সংস্কৃতির শেকড় কখন কোন মাটিতে কি খাদ্য আহরণ করবে তার জন্য আগেভাগেই সার সংগ্রহ করে রাখতে হয়, — কার্ডগুলি ঠিক তাই। বাস্তবক্ষেত্রে এই সমস্ত তথ্য সমৃদ্ধ করেছে শেষ পর্যন্ত তাঁর সাহিত্যকেই। কোন বিষয়ে তথ্যের শেষ পর্যন্ত যেতে যেতে হোঁচট খেয়েছেন, রুদ্ধ পথের পাশে দাঁড়িয়ে হতাশ; তিনি, কার্ডেই মন্তব্য করছেন, ''যাঁহারা আমাদের source তাঁহারা কেহই যথাযথভাবে লিখিয়া রাখেন নাই।'' নিজে ঠোক্কর খেয়েছেন বলেই কি এত যথাযথভাবে লিখে রাখার চেষ্টা? লিখে রাখার ধরন কেমন, দু-একটি Note উল্লেখ করা যাক :

**লোকউৎসব সংক্রান্ত নোট :**

করমপূজা। বনদেবী। লোধা পাতর পৌষ সংক্রান্তি। ১লা মাঘ বন্য জন্তুদের হাত থেকে রক্ষা করে। পাতররা শালগাছের তলে পূজা করে। লোধারা বছরে দুবার একবার পৌষ অন্যবার ভাদ্র। পৌষে ছাগল মুরগী — ভাদ্রে কোন বলি হয় না কখন যখন তসর গুটি বা ফলমূল দেয় ইদানীং শহরে পূজা হয়। গোপমেদিনীপুরস্থিত গোপনন্দিনী এখানে দেবী দ্বিভুজা ব্যাঘ্রবাহিনী। বিশালাক্ষী। বনদেবী। সুন্দরবনে মাহিষ্যরা মেদিনীপুর অঞ্চল থেকে বেশী করে। তার শুধুমাত্র মুখ আছে কিন্তু দেহ নাই। বন হাসিল করার সময় পূজা হয়।। বনবুড়ির টাট - দুবলাত (?) হাসিলের সময় থেকে পূজা আরম্ভ হয়।।

দামোদর।। অস্থি নিমজ্জন। সলই পূজা।। বসন্ত উৎসব।। ফাল্গুন।। পুরাতন বৃক্ষ শাল বা মহুয়ার ডাল দেয়। মাটির হাতীঘোড়া। পাঁচটি লাল মুরগী ও একটি ছাগল। রাঙামাটি রাঙা জলে ক্রীড়া হয়।। করম পূজা।। পূর্ণিমার ১১ শীতে ভুঁইয়ারা শুধু পূজা করে।। মোড়লের বাড়ি কদম গাছের ডাল পোঁতে। চারকোণে খোঁটা পোঁতে, পদ্ম দিয়ে সাজায়, সারারাত নৃত্যগীত পাতানৃত্য।। (সাঁওতালী) বৃক্ষপূজা। সারা জিলায় মাটির হাতী ঘোড়া। করমপূজা খুব প্রিয়।

**সংস্কৃত ভাষা ও হস্তিচিকিৎসা সংক্রান্ত নোট :**

Jaina-ayaranga Sutra. লাঢ়/রাঢ় শুদ্ধভূমি/সুমাকল্পসূত্রতে Jaina ascetic orders are named Pundravardhanya, Kativarshiya Tamralipika. পতঞ্জলি — পানিনি পরে; ভাষাগত সন্ধান আছে Dialectological Information কতক ক্রিয়াপদের অতি অদ্ভুত ব্যবহার (পূর্বদেশে) গুপ্তকাল হইতে সংস্কৃত আসে। মহাস্থানের ব্রাহ্মিলিপি and the lithic records (three lines) of Chandravarmana on Susunia Hills in West Bengal Gupta period copper plate 443 AD. 543 AD. : এতে সাহিত্য মর্যাদা নেই। 7শ শতাব্দীতে লোকনাথের ত্রিপুরা তাম্রশাসন বা ভাস্করবর্ম্মনের নিদানপুর কাব্য দেখা যায়। ফা হিয়েন

তাম্রলিপ্তিতে পাণ্ডুলিপি অনুকরণ অধ্যয়ন করেছিলেন ৫ শতাব্দী ৭ শতাব্দী হুয়েন পৌন্ড্র কর্ণসুবর্ণ সমতটে বিদ্যোৎসাহ দেখেছেন। ই সী সেই শতাব্দীর কিছু পরে শব্দবিদ্যা তমলুকে শিখেছিলেন।

২) এদের কথায় বোঝা যায় যে বঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষা ছিল। হস্তি, আয়ুর্ব্বেদ (গজ চিকিৎসা, গজ বিদ্যা গজ আয়ুর্ব্বেদ) শাস্ত্রীয় রীতিতে লিখিত এই বইটী বঙ্গের। পুরাণধামী। চম্পাতে রোমপদ অঙ্গের রাজার সঙ্গে মুণি পালকাপ্য (Pala Kapya) বা কাপ্পা প্রশ্ন জিজ্ঞাসামূলক। হাতীর আরোগ্য সম্বন্ধে। রোমপদ দশরথকালীন লেখক কাপ্য গোত্রীয় যার পিতা মুণি ও মা শ্রী হস্তিনী। পালকাপ্যের আশ্রমে লোহিত্য (Lanhitya) ব্রহ্মপুত্র) যেখানে সাগরে মিশেছে। অর্থাৎ সেখানেই এই লিখিত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন ৫/৬ শতাব্দী খৃ পূর্ব (BC) ক্ষীরস্বামী ১১ শতাব্দীতে অমরকোষ উদ্ধৃত করে। অগ্নিপুরাণ বলে অগ্নিপুরাণে যে গজ চিকিৎসা আছে তা পালকাপ্য থেকে নেওয়া। রঘুবংশে কালিদাস, অঙ্গর রাজা যা হাতি সূত্রকার দ্বারা পোষা — ইহা সূত্র নয় কবিতা সময়ে গদ্য। ১৬০ অধ্যায়। চার স্থানে বিভক্ত। মহারোগ (১৮ অধ্যায়), ক্ষুদ্র রোগ (৭২ অধ্যায়) শল্য ৩৪ উত্তর (uttare Mezapy bath dieties) ৩৬ কৌটিল্য উদ্ধৃত করেন হস্তী চিকিৎসা সম্ভবত গুপ্তকালে বা পরে হয়।

**তন্ত্রসাধন সম্বন্ধে নোট :**

সমস্তই প্রবহমান কালচক্রে ঘূর্ণ্যমান। এই কালচক্রই সর্বজ্ঞ এবং সকল বুদ্ধের জন্মদাতা। কালচক্র প্রজ্ঞার সঙ্গে যুক্ত হয়ে জন্মক্রিয়া সফল করে। কালচক্রযানী কালের উর্দ্ধে যেতে চান। কার্যপরম্পরা বা গতির প্রবহমানতা সাক্ষাতেই কাল নির্ণিত হয়। মানুষের ক্ষেত্রে এই কার্যপরম্পরা মূলত প্রাণক্রিয়া ফলে প্রাণক্রিয়াকে নিরুদ্ধ করলেই কাল নিরস্ত হবে। দেহাভ্যন্তরস্থ নাড়ী, নাড়ীকেন্দ্র, পঞ্চবায়ু আয়ত্ত করলেই প্রাণক্রিয়া নিরুদ্ধ করা যায় — কাল নিরস্ত তথাহি। এবং ফলে তিথি বার নক্ষত্র রাশিযোগ এঁদের শাস্ত্রে বড়। তাই গণিত জ্যোতিষ প্রাধান্য। সম্ভলনামক স্থান থেকে পাল কালে এখানে আসে। অভয়কর গুপ্ত রামপালের সমসাময়িক এই মতবাদের উপর প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত তিন যানের যোগ সাধনার উপর ভিত্তি। পার্থক্যও খুব বেশী নয় একজন সিদ্ধ তিনের উপর গ্রন্থ রচনা কৃ। বাঙালী সিদ্ধরা ধ্যান ও দেবদেবী ধ্যানকল্পনা গড়েন। তিনটী হটযোগে জাত। লালসা রসনা অবধূতী। অবধূতী উর্দ্ধে যায় বা বক্ষে থাকে। ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না বলে। কুলকুণ্ডলিনি জাগে। গুরু অপরিহার্য কিন্তু শিষ্য বাছা চাই। যথার্থ সাধন পন্থায় চালনা করা দুঃসাধ্য। এর যাচাই এর জন্য পন্থা পঞ্চকুল — ডম্বী, রজকী, চণ্ডালী, ব্রাহ্মণী। পঞ্চকূল প্রচার (অস্পষ্ট) পঞ্চবিধ রূপ। কুল পঞ্চ স্কন্ধর দ্বারা নির্ণিত হয় কারণ স্কন্ধক পঞ্চভূতে মনুষ্যদেহ গঠিত — যার যেটী বেশী তাকে হয়। (চণ্ডীদাস রজকী সাধন — তার কুলের সূচক। সিদ্ধিরা এই পন্থা সৃষ্টী করে। ৮৪ জন সরহ, নাগার্জুন, তিত্তোপাদ, নাড়োপাদ, অদ্বয়বজ্র, কাহ্ণ পা এ ব্যতীত লুইপাদ, শবর, ভুসুক, কুক্কুরী নাম পাই। পূর্বভারতে রাচ্চী নগরে সরহের বাড়ি রত্নপাল

রাজের সময়। উড়িষ্যরাজা কর্তৃক তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষা। নালন্দার আচার্য হন। নার্গাজুন সরহ শিষ্য। এদের সাক্ষাৎকার সেখানেই গুহ্য সাধন আরম্ভ হয়। বৌদ্ধ তন্ত্রসাধন ও al-chemy সরহ দ্বারা নালন্দায় শিক্ষা লাভ। তিব্বোর বাড়ি চট্টগ্রাম পণ্ডিত বিহার অধিবাসী মহীপাল সময়ে। নৈয়ায়িক জেতরী শিষ্য নাড়ো জয়পাল সময়ে। ন্যায়পাল প্রথমে কল্লুহরিতে পরে বিক্রমশীলায় ভুসুকুর বিক্রমপুর — অতীশ শিষ্য। লুইপাদ সম্ভবত বাহমী অদ্বয়বজ্র একই কুক্কু ব্রাহ্মণ বৌদ্ধতন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ডাকিনী দেশকে মহাযান তন্ত্র উদ্ধার। শবর সরহশিষ্য বঙ্গাল অধিবাসী।

কৌলমার্গ: শক্তি ও বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা নবশাক্ত সৃষ্টী করে কৌল। নেপাল প্রাপ্ত গ্রন্থে আদি মৎসেন্দ্রনাথ কুল থেকেই কৌলের উৎপত্তি। কুল অর্থে শক্তি — পঞ্চবিধ-পঞ্চ তথাগতি তার অধিষ্ঠাত্রী Sacred Lore কৌলবাদের — কৌলগম কৌলশাস্ত্র ইত্যাদি কৌলবাদীদের।

**মাটির লোকায়তিক ব্যবহার বিষয়ক নোট :**

১ ১/২´´ dia ((ডায়মিটার) মধ্যে ১/২-র কম ছিদ্র। মোট ১/১৬´´ ১ পয়সায় ৮টি পাওয়া যাইত, ইহা কুমোরেরা চাকে তৈয়ারী করিত বেশী পোড় খাইত না, অনেকটা ভাঁড়ের মত। প্রসূতিরা ইহা চিবাইত — দন্ত শুলায়।... ইত্যাদি।

বিচ্ছিন্নভাবে কার্ডে লিখিত নোটগুলির ব্যবহারিক মূল্য হয়ত কিছুই নেই, কিন্তু বুঝতে সাহায্য করে কমলকুমারের মানসিকতা, তথ্যসংগ্রহের ঝোঁক — এক কথায় মনের জিজ্ঞাসার তলের সন্ধান। নোটগুলির গুরুত্ব যাই থাক, বিস্মিত হতে হয়, তাঁর গ্রামপরিক্রমার পরিধি জেনে। দেখা যাচ্ছে ভ্রমণ তালিকায় বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম যেমন আছে, তেমনি বাংলার বাইরে দূর-দূরান্তও কম নেই। কমলকুমার লিখেছেন, ''সময় অনুপাতে আমাদের প্রত্যেক জিলা ধরিয়া অনুসন্ধান করা সম্ভব হয় নাই। সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যে যতদূর সাধ্য এই লোকশিল্পের রূপ বা পদ্ধতি বাহির করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।'' এই সীমাবদ্ধ সময়ের কাজটি যে কমলকুমারের জীবনে আজীবনের অসীম নেশার টান হয়ে উঠবে, টেনে নিয়ে চলবে বাংলাদেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত, জনগণনা বিভাগে যুক্ত হবার আগে কমলকুমারই কি জানতেন!

দুই

ক্যাথিড্রাল মিশন স্কুলে মাঝরাস্তায় পড়ার পাঠ চুকিয়ে কিছুদিন ন্যাড়া হয়ে টিকি রেখেছিলেন সংস্কৃত শিখবার জন্য, ভর্তি হন ভবানীপুর টোলে। তারপর কমলকুমার পরিপূর্ণ বেকার। পিসতুতো দু দাদা হরি এবং কেষ্ট, উপরের বাড়ির মেজদা আর কমলকুমার সাইকেল নিয়ে অনেক জায়গায় ঘুরেছেন। এই সাইকেল ভ্রমণ থেকেই কমলকুমার দেশকে, দেশের মানুষকে সামনে থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। নৈকষ্য হিন্দুরা 'দেশভ্রমণ' বলতে তীর্থযাত্রা বোঝেন, নিছক দেশ দেখার অভ্যাসটা মনে হয় ব্রাহ্ম প্রভাবের ফল, অন্তত

প্রথমজীবনে কমলকুমারের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছিল। বাল্যবয়স থেকে বাবা ও মা দুই বিপরীত আচারের প্রভাব কমলকুমার চরিত্রে জন্ম দিয়েছিল সাংস্কৃতিক টানাপোড়েন ও নিরন্তর জিজ্ঞাসার। ম্লেচ্ছ আচারে চলা পিতৃদেব এবং হিন্দু আচারে বিশ্বাসী মায়ের প্রভাব কমলকুমার সারাজীবনে কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। বাল্যকালে খ্রিস্টান প্রভাবিত 'শিক্ষাসংঘ' বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রেভারেন্ড সুধীর চট্টোপাধ্যায়, পরে ক্যাথিড্রাল মিশন স্কুল, তারপরই ভবানীপুরের টোলে সংস্কৃত শিক্ষার সুবাদে হিন্দু প্রভাব, ঠিক তার পরে-পরেই ফরাসী সংস্কৃতির সান্নিধ্য কমলকুমারকে স্থিত করেনি কোথাও। নানা সংস্কৃতির ধাক্কায়, টান ও আকর্ষণে ছিন্নমূল কিশোর / যুবক কমলকুমারের জীবনে সুযোগ এসেছিল সংস্কৃতিকে নিজের মতো করে পড়ে নেবার। প্রথম জীবনে রবীন্দ্রভক্তি, পরে বিরোধিতা 'বুজরুগ ব্রাহ্ম' ধারণারই ফল হয়তো। যে মানুষটি রবীন্দ্রনাথকে বলতেন, 'বেহ্ম', বলতেন 'পীরবাবা', 'দাড়িবাবু', 'মোল্লা'; প্রথমজীবনে তিনিই কিন্তু ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ভক্ত। প্রথম রবীন্দ্র-দর্শনের অভিজ্ঞতাটি কমলকুমারের এইরকম, ১৩৩৫-এ শান্তিনিকেতন গিয়াছিলেন — ''কাল পৌষ উৎসব, আমরা অতীব প্রত্যুষে স্নানাদি সারিয়া প্রার্থনা গৃহে গমণ করিলাম। শীতের হাওয়া বহিতেছে। এমন সময় হর্ষ মিশ্রিত ধ্বনি উঠিল, 'ঐ যে উনি, ঐ যে;' দেখিলাম সেই ভোরে প্রজ্জলিত অগ্নিবর্ণ পুরুষ — তাহার চটিজুতার শব্দ আসিতেছে — সে যে কি ব্যাপার তাহা বর্ণনা করা যায় না — তিনি শুভ্রবর্ণ আচ্ছাদিত...''। ট্রেনে, সাইকেলে, মা-বাবার সঙ্গে বেশ কয়েকবার শান্তিনিকেতন গেছেন। ব্রাহ্মবিরোধী হয়েও ব্রাহ্মপ্রভাবিত ফিরিঙ্গি মনোভাবাপন্ন পরিবারের সন্তান কমলকুমার (কমলকুমারের কোন না কোন আত্মীয় বিলাতফেরতা ছিলেন) চরিত্রে এক জগাখিঁচুড়ি মানসিকতা লক্ষ করা যায় আগাগোড়া। তাই তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মুখেও শুনি, ''এটা (রামকৃষ্ণ/মাধব ভক্তি) তাঁর পোজ না বিলিফ আমি জানি না। দেবদেবীর ছবির মধ্যে দৈব অনুভূতি আছে এমনও মনে হয় না।'' (অশোক মিত্র), রচনার শুরুতে 'মাধবায় নমঃ' পাঠটিকে ভক্তিভাব নয়, 'মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালির রুচিকে চিমটি কাটার মোক্ষম সুযোগ' হিশেবে দেখেছেন আরেক কমলপরিকর (অনিরুদ্ধ লাহিড়ি)। কমলকুমারের বৈষ্ণব শ্বশুরবাড়ির প্রভাব ও পত্নীর মন রাখা হিসেবেও বিষয়টিকে দেখতে চেয়েছেন অনিরুদ্ধবাবু। বাল্য-কৈশোর-যৌবনে যেমন হিমালয় নবদ্বীপ খেতুরী একচাকা গেছেন, গেছেন শান্তিনিকেতন, তেমনি গেছেন মূলতানের বেশ্যাপল্লিও। নিজামে যেমন গোমাংস খাচ্ছেন, তেমনি নিত্যপ্রাতে 'বহুবার গঙ্গায় চান'ও করছেন। কালাপাহাড়ি মনোভাব, যেটা তাঁর বাবার কাছ থেকে পাওয়া আর মাতৃ ও পত্নী প্রভাবে ধর্ম-মনোভাব দুই-এ মিলে কমলকুমার চরিত্রে প্রগতিশীলতা আর রক্ষণশীলতার এক মিশ্রণ সৃষ্টি করেছে যা সব সময় পাঠকের কাছে এক অমীমাংসিত রহস্য, সচেতন পাঠকও বিভ্রান্ত হতে পারেন।[৪] এই দুই মানসিকতাই তাঁকে বারে বারে টেনে নিয়ে গেছে ঘরের বাইরে। খুঁজে ফিরেছেন বাংলাদেশের নিত্যকাঠামো। কেতাবি শিক্ষার বাইরে যে বিশাল বিদ্যালয় পড়ে আছে সেখান

থেকেই বিদ্যালাভ করার একটি পর্যায় হল গ্রাম পরিক্রমা, পরিক্রমার পর নোট লেখা। কত নতুন কিসিমের বই পড়া, সে তো ডিগ্রি অর্জনের জন্য নয়, কেবল জানবার জন্য।

কমলকুমারের পড়াশুনোর ব্যপ্তি কেমন, একটি উদাহরণ টেনে দেখা যাক। বাংলাদেশের 'জাতি' সম্পর্কে জানবার জন্য কেবল বাংলা বই, যা তিনি পড়ছেন ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে, বই-এর নাম ও নং-এর তালিকাটি এমনি :

> হিন্দুজাতিভেদ ও বারুইজাতির ইতিহাস 182 PC 912.7, কায়স্থ সদগোপ সংহিতা 182PC 876/2, বঙ্গীয় জাতিমালা 182PC 900/4, ঢাকুর অর্থাৎ কায়স্থজাতি ও বরেন্দ্র কায়স্থসমাজের ইতিহাস - 182 PD 889.1, মূল ঢাকুর সমালোচনা- 182PD891/3, কায়স্থ কৌস্তভ-182PC875/3, ক্ষত্রিয় মহাসম্মিলনী-1/PD 926/15, কায়স্থ সমালোচনা - PD 926/17, ভেকাশ্রিত তত্ত্বনিরূপন - JC 92/72, গৌরিকান্ত বংশাবলী-CA 918/1, রাজবংশী কুলপ্রদীপ - PD 908/10, পুণ্ডরীক সমাজ-PC 930/4, ঘনশ্যাম ওঝা বৈশ্য কুম্ভকার জাতিদর্পণ-182PE/926.1, মৈথিল ব্রাহ্মণ তথ্য-182E 926.1, বাঙ্গালী এবং বৈদ্যজাতি গিরিজামোহন রায়, যোগেশ রায় জাতিতত্ত্ব-গিরিশ বসু - 182 PC 903.6, কায়স্থ সমাজের সংস্কার - 182PC 914.4, কায়স্থ নৃপ-182PC853 2(3), বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সংঘ-182RC 925.1, মোসলেম জাতিতত্ত্ব 182PC926/36, গন্ধবণিক তত্ত্ব-182PC 903.3, সুবর্ণবণিক বৈশ্য-182PC825.2 (1), গোপমিত্র (পত্রিকা)-182QB 922/6, বৈদ্যপুরাবৃত 182PC 905/1, বাঙ্গালার আচার্য ব্রাহ্মণ-182PC 932/4.

কেবলমাত্র একটি কার্ডে এতগুলি বইয়ের নাম লেখা। এর বাইরে আর কত বই তিনি পড়েছিলেন কে বলবেন?[৫]

শেষ তথ্যটি না জানা পর্যন্ত তাঁর পাঠের প্রক্রিয়া চলতেই থাকতো। যার ফলে যে কোন বিষয়ে কমলকুমারের অথরিটিকে স্বীকার করতে হতো সবাইকে। 'কমলবাবুর কথাই শেষ কথা', এটা বারবার বলতেন অশোক মিত্র; চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় বলতেন, 'কমলবাবুই আমাদের শেষ রেফারেন্স'; সত্যজিৎ রায় বলতেন, 'কমলবাবুর ওপর উড়তে পারে আমাদের সময়ে এমন কেউ ছিলেন না'। স্বেচ্ছায় ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থাকে পাশ কাটিয়ে স্বশিক্ষিত-দৈত্য তাঁর সমকালে কলকাতার বিদ্বৎজনদের শাসন করে গেছলেন।

তিন

কমলকুমার বাংলাদেশকে কি চোখে দেখতেন তাও আলোচনার দাবি রাখে। তাঁর দেখা বাংলা কি জীবনানন্দর রূপসী বাংলা, নাকি বিভূতিভূষণের চোখে দেখা গ্রামবাংলা? এর কোনটাই নয়। কমলকুমার বাংলাকে দেখেছেন বিশ্লেষণাত্মক চোখ দিয়ে, শিল্পীর চোখ দিয়ে, লোকায়তের চোখ দিয়ে। জাঁ রেনোয়াকে বাংলাদেশ সম্পর্কে ঠিক যা বলেছিলেন, সেই বাংলাদেশকে জানাই কমলকুমারের বাংলা। ''বাংলাদেশ নিয়ে ছবি করতে হলে হোটেলে

থাকলে চলবে না। লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে হবে, রাস্তাঘাটে ঘুরতে হবে, রোদে পুড়তে হবে, একপেট খেয়ে গরমকালে বটগাছের ছায়ায় ঘুমোতে হবে, জলে ভিজতে হবে, গঙ্গার রূপ দু-চোখ ভরে দেখতে হবে।" রাধাপ্রসাদ গুপ্ত আরো জানিয়েছেন, গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে রেনোয়ার সঙ্গে দেখা করতে গেলে কমলকুমার শালপাতার ঠোঙায় নকুড়ের কড়াপাক সন্দেশ নিয়ে যান। রেনোয়ার স্ত্রীকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে মাটিতে বসেন, তাঁর সমস্ত আচরণ দিয়ে যেন কমলকুমার চিরায়ত বাংলার রূপটিকেও তুলে দিতে চিয়েছিলেন শিল্পকলার দেশের মানুষটিকে। সবজি কোটার মধ্যেও যে আর্ট নিহিত তার পরিচয়ও তিনি ফ্রান্সের চলচ্চিত্র শিল্পী ও শিল্পিপুত্রকে দিতে ভোলেন নি। ব্যারাকপুরে The River' ছবির সুটিং লোকেশনের ''পশ্চিমে গঙ্গা সেখানে এক কলাকুঞ্জে একটি দারুন মর্ত্তমানের মোচা ধরিয়াছে — মোচা খাওয়ার কথা উঠিল। মোচা কোটার আর্ট কি দারুণ! থোড় কাটার পদ্ধতি — তিনি অবাক। পরে তরকারি কাটার পদ্ধতি...রেনোয়াকে বলি, এক প্রসিদ্ধ কলা আছে যাহাকে ডয়েরা কলা বলে — ইহাতে বিচি খুব — তাহার ডালনা গোটা ফোড়ন দিয়া আঃ। খাদ্য অভিমানী ফরাসী হাঁ হইয়া গিয়াছিলেন।" শিল্পকলায় ভরপুর দেশের মানুষকে কমলকুমার বোঝাতে চেয়েছেন বাংলার স্বভাবসিদ্ধ শিল্পচর্চাকে। বোঝাতে চেয়েছেন, বাঙালির জীবনধারণের ও জীবনযাপনের প্রতি পদক্ষেপে শিল্পকলা। কমলকুমার দেখেছেন, কুমোর প্রতিমা গড়ে, এবং ভক্তিভরে প্রণাম করে 'মা', 'মা' বলে ডাকে সেই প্রতিমাকেই। বাংলাদেশের নিত্যকাঠামো তার আচারে, আচরণে, ধর্মে, বিশ্বাসে, সংস্কৃতিতে — কমলকুমার তাকেই খুঁজে ফিরেছেন বাংলার প্রাচীন শিল্পাঙ্গিকের মধ্যে। নির্দিষ্ট প্রোজেক্ট নিয়ে কমলকুমারের খুঁজে ফেরা যেহেতু নয়, সেহেতু কমলকুমারকে সমাজতাত্ত্বিক গবেষকের তকমা পরানো ঠিক না, তিনি আদ্যন্ত শিল্পী — লোকায়ত শিল্পকলা অনুধাবনের স্তরে-বিন্যাসে জীবনকে যেমন দেখেছেন সেটুকুই তাঁর সমাজতত্ত্ব। প্রাণের আনন্দে খুঁজে ফিরেছেন হারিয়ে যাওয়া বাংলাদেশকে। শিল্পরসিকের চোখ দিয়ে বিচার ও বিশ্লেষণ করে বাংলার লোকশিল্পের সঙ্গে পরিচিত হওয়া ও পরিচয় করানোই তাঁর লক্ষ্য। তিনি মুগ্ধ নেত্রে লক্ষ্য করেছেন বাঙালির প্রাত্যহিক জীবনযাপনের সঙ্গে শিল্পের ঘনিষ্ঠতা, বাঙালি শিল্পকে আলাদা বস্তু বলে কখনো মনে করে নি। তার ধর্মচিন্তা, নিত্যপূজা, ব্রত, ছড়া, পাঁচালি, আলপনা সমস্তকিছুর মধ্যেই শিল্পকে জড়িয়ে নিয়েছিল। এমনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে শিল্পকে জড়িয়ে নেওয়া তখনই সম্ভব 'যখন তাহার মধ্যে কিছু বাস্তবতা থাকে এবং সেই বাস্তবতা তাহাকে রাত্রিদিন আনন্দ দেয়।' এই আনন্দের প্রকাশ সেঁজুতি ব্রত, পুণ্যপুকুর, টুসুপাত্র, নিত্যপূজার বিগ্রহ, আলপনা, দেয়ালচিত্রণ, উলকির মধ্যে। খেলার পুতুলের মধ্যে যে ভাস্করের টোন, যে রৈখিক আলো-ছায়ার ভাঁজ — বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভাস্করের তৈরি ভাস্কর্যের গুণে তা পূর্ণ। নিত্যপূজার বিগ্রহের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ শিল্পীর ছাপ, ব্রতের আলপনায় আলোছায়ার দক্ষ কৌশল, তার জন্য বাংলার মেয়েদের তালিম নিতে হয়নি। সহজাত ভক্তিভাব রৈখিক আলোকে বিভাজনের

কৌশল আপনা আপনিই এসেছে। চিরকল্পিত রেখার সীমায় শিল্পী তার অসীম আকাঙ্ক্ষাকেই বেঁধে রাখতে চায় 'আধোদৃষ্টির বাস্তবতা আধোদৃষ্টি' দিয়েই চোখের তলায় সমতল জমিতে। 'চিত্রচেতনাকে রূপান্তরিত করে বিশ্বপ্রকৃতি তাহার জল, তাহার ঝড়, তাহার অনন্ত আকাশ, তাহার আলোক-চাপল্য, তাহার মহিমা।' এই মহিমাই প্রাণিত করে বাস্তবতার চিত্রচেতনাকে। বাংলাদেশের চিত্রচেতনার ভিত্তি তার জীবনচর্চা। ব্রতর আলপনাগুলি ব্রতচারিনীর মনস্কামনার প্রতিরূপ নয়; ছড়ার বা কাব্যের রূপের কল্পনাও নয়, আপনার ধর্মেই আলপনাগুলি বাস্তব, সে ধর্ম বিশুদ্ধ শিল্পধর্ম যা পাশ্চাত্যের বাস্তবতার চেয়ে কোন অংশেই ন্যূন নয়। মনের আধখানি আর বাস্তবের আধখানি নিয়ে তার বাস্তব চেতনারই রূপারোপ। তাই বাঙালি মেয়েদের 'বর গড়া তাহার হাতে ছিল।' 'শিবলিঙ্গ যাহাতে সুন্দর হয় তাহার জন্য কি নিষ্ঠুর কেন না বেঁকা শিব গড়িলে বেঁকা বর হয়।' এই বিশ্বাসের জন্ম 'তাহার আধ্যাত্মাবাদ হইতে — তাহার আনন্দ হইতে।' পাশ্চাত্য যা চেষ্টা করে আয়ত্ত্ব করেছে, বাঙালি তা স্বভাবগুণেই পেয়েছে। এই স্বভাবগুণটি কমলকুমার আজীবন রপ্ত করতে চেয়েছেন তাঁর চিত্রকলায়, তাঁর সাহিত্যে। তাকেই তিনি খুঁজে ফিরেছেন হারানো মানিকের মতো। যার ফলে কমলকুমার, সেই অর্থে, নৃতত্ত্ব নিয়ে প্রবন্ধ ফাঁদার চেষ্টা করেন নি। কমলকুমারের ঝোঁকটি ১৯ শতকের ফিরিঙ্গি আচারে ও অনুকরণে হারিয়ে যাওয়া বাংলার শিল্পচর্চা ও শিল্পচর্যার ভিত্তিমূলের অনুসন্ধান, আর তাকে সাহিত্যের ভেতর চারিয়ে দেওয়া। ফিরিঙ্গি-আচার ও কৌম-সংস্কৃতির দ্বান্দ্বিক রূপটির শিল্পসমৃদ্ধ অর্ন্তবয়ন দেখা গেল 'পিঞ্জরে বসিয়া শুক'-এ, যার সূচনা খুব স্থূলরেখায় হলেও পাওয়া গিয়েছিল 'সুহাসিনীর পমেটম'-এ।

**পাঠসহায়ক সূত্র :**

১. কর্মহীন কমলকুমারকে এই কাজটির সন্ধান দেন চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়। অশোক মিত্র মশাই তখন এমন একজন লোক খুঁজছিলেন যিনি 'আদিম লৌকিক, প্রাথমিক ও দরবারি শিল্প ও শিল্পী বিষয়ক জ্ঞানের' অধিকারী। কমলকুমারের কথা স্বভাবিকভাবেই মনে পড়ে চঞ্চলকুমারের। তিনি কমলকুমারকে প্রস্তাব দিলে কমলকুমার প্রায় লুফে নেন প্রস্তাবটি। চঞ্চলবাবু কমলকুমারকে নিয়ে যান অশোক মিত্রের কাছে। 'তিন কুড়ি দশ' গ্রন্থে অশোক মিত্র এ কথার উল্লেখ করেছেন। চঞ্চলবাবু কমলকুমারের সুখ-দুঃখের সাথী ছিলেন আমৃত্যু। এত দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক কারো সঙ্গে ছিল না কমলকুমারের। সেনসাসের কাজের সূত্রে আলাপ, পরে এই কেজো পরিচয়টি অচিরে বন্ধুত্বে পরিণত হয়ে আমৃত্যু বজায় ছিল অশোক মিত্রের সঙ্গেও।

২. শোনা যায় এই রচনাগুলির ইংরাজি অনুবাদ করেছিলেন রাধাপ্রসাদ গুপ্ত। রাধাপ্রসাদ গুপ্তর সঙ্গে কয়েক সিটিং কমলকুমার প্রসঙ্গে আলোচনা করার পরও তিনি দুটি তথ্য পরিষ্কার করে জানান নি, — ১. জনগণনা বিভাগের রচনার অনুবাদ প্রসঙ্গ এবং ২. টাটার পি আর ও থাকাকালীন তাঁর তত্ত্বাবধানে কমলকুমার রচিত ক্যালেন্ডার প্রসঙ্গে বিস্তৃত কোনো তথ্য। প্রসঙ্গদুটির কথা তিনি প্রতিবার জানতে চাওয়ার সময় প্রতিবার এড়িয়ে গেছলেন। চঞ্চলবাবু জানিয়েছেন,

কমলকুমার নিজেই লেখাগুলির ইংরাজি অনুবাদ করেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে জানিয়ে রাখি, দয়াময়ীর সংগ্রহে ফুলস্কেপ কাগজে অন্তত একশ পাতার ফরাসি ভাষায় লেখা একটি পরিচ্ছন্ন পাণ্ডুলিপি দেখেছি। কবি অরুণ মিত্রের কাছে সেটি নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। রাজি হয়েও, শেষে, কেন জানিনা, দয়াময়ী তা আর দেন নি। সেটি কোথায়?

৩. অ্যানটিকের কারবারে শুভো ঠাকুরের সঙ্গে কমলকুমারের একটা যোগসূত্র ছিল বলে জানতে পারা যায়। সম্ভবত দুজনেই সাহেব-ঠকানোর ব্যবসার পার্টনার ছিলেন। শুভো ঠাকুরের সঙ্গে কমলকুমারের আলাপ করিয়ে দেন রাধাপ্রসাদ গুপ্ত। তাঁরই পরামর্শে কমলকুমার এ্যানটিকের ব্যবসায় নামেন। কমলকুমার শুভো ঠাকুরের মতো ব্যাপক ও বিস্তৃত মাপে এই সাহেব-ঠকানো কারবারটি ফাঁদতে পারেননি। শুভো ঠাকুরের কারবারটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুবিস্তৃত ছিল, কমলকুমারের ক্ষেত্রটি মোটামুটি কলকাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। সংগৃহীত অ্যানটিককে বাজারজাত করার জন্য মিড্‌লম্যানের প্রয়োজন হয়, এই কাজটি সম্ভবত করতেন রাধাপ্রসাদ গুপ্তও। প্রাথমিক পর্যায়ে শুভো ঠাকুর বরাত দিতেন কমলকুমারকে, পরবর্তীকালে পুরো এই দায়িত্বটি নেন রাধাপ্রসাদ। গ্রামগঞ্জ ঘোরার অভিজ্ঞতায় কমলকুমার অনায়াসে সে-সব হাতিয়ে আনতেও পারতেন, অনায়াসে বানাতেও পারতেন। এসব কারবারে শুভো ঠাকুর বেশ টু-পাইস কামিয়েছিলেন কমলকুমারকে ঠকিয়ে। রাধাপ্রসাদও যে কমলকুমারকে সব সময় ন্যায্য মূল্যে বিদায় করেছেন — তা কিন্তু নয়। যা পেয়েছেন, তাতেই সন্তুষ্ট গরিব-মানুষটি নতুন বরাত নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন। এই অসৎ কাজটি কমলকুমার ছেড়ে দিয়েছিলেন স্ত্রীর কাছে ধমক-টমক খেয়ে, দয়াময়ী এমনিই বলেছিলেন। কাজটি ছাড়ার পেছনে, তাহলে দেখা যাচ্ছে ধম্মটম্ম নয়, ধর্মবোধের পীড়নেও নয়, নীতিবোধের তাড়নাতেও নয়, কেবলমাত্র সংসারে শান্তি বজায় রাখতে; স্ত্রীকে খুশি করতে। প্রসংগত জানিয়ে রাখি, কমলকুমার যে মূর্তিটি 'মাধব' বলে পূজা করতেন, সেটিও একটি অ্যানটিক।

৪. কমলকুমারের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আমার গবেষণাকালে প্রকৃতপক্ষে কেউ মুখই খুলতে চাননি। কমলপরিকর ও বহু ঘটনার স্বাক্ষী, সাউথ পয়েন্ট স্কুলের শিক্ষক ও সহকর্মী শুভ মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত আমাকে সে-সময় এড়িয়ে গেছলেন। অনিরুদ্ধ লাহিড়ীর 'কমলকুমার ও কলকাতার কিস্‌সা' গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর দেখতে পাচ্ছি আরেক কমলপরিকর শক্তি রায়চৌধুরীও আমাকে রেখেঢেকেই যা-বলার বলেছিলেন। সত্যজিৎ রায়ও অনেক কথা বলার পরও তা নিজ-হাতে কেটে বাদ দিয়েছিলেন। এর কারণ আমি প্রথমে বুঝে উঠতে পারি নি। ১২.১২.৭৯ তারিখের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় কমলকুমার-পত্নী দয়াময়ী মজুমদার একটি রচনার (শান্তি বসুর 'বাবু শ্রী কমলকুমার মজুমদার') প্রতি তাঁর আপত্তি জানিয়ে একটি চিঠি লেখেন, তাতেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। চিঠিতে তিনি বলেছেন, লেখাটি তাঁর পরলোকগত স্বামী সম্বন্ধে অপ্রত্যাশিত কুৎসা প্রচার করেছে। রচনাটি কতদূর কমলকুমার বিষয়ক তথ্যের নির্ভরযোগ্য উৎস এ বিষয়ে আমি বিস্তৃত লিখেছি আমার 'কমলকুমার মজুমদার : মুখ ও মুখোশের দ্বন্দ্ব' গ্রন্থে। ব্যক্তি কমলকুমারকে

নিয়ে শান্তি বসু খুব একটা মিথ্যে কিছু বলেন নি। এই রচনাটি প্রথম একটি সাহসী লেখা, যাতে রক্তমাংসের কমলকুমারকে পাওয়া গেল।

দয়াময়ীর সব দিক বিবেচনা না করে চিঠিপত্র লেখার অভ্যাস ছিল। তথ্যের উৎস হিসেবেও তিনি খুব নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন না, পদে পদে বিভ্রান্ত করেছেন। গত ২ নভেম্বর ২০১৫ 'দেশ' পত্রিকায় বাদল বসুর 'পিওন থেকে প্রকাশক' রচনায় দেখলাম দয়াময়ীর একটি চিঠি ছাপা হয়েছে — যাতে আমার প্রসঙ্গ আছে। চিঠিটি সম্পর্কে আমার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে 'দেশ' সম্পাদককে একটি চিঠি লিখি ১৬.১১. ২০১৫ তারিখে। 'দেশ' চিঠিটি প্রকাশ করেনি। দয়াময়ীর চিঠিটি কয়েকটি অজানা তথ্যের প্রসঙ্গ অবতারণা করেছে যা হয়ত চিরকালই পাঠকের অজানা থেকে যেত, আমার পক্ষেও তা প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। রুচিকরও ছিল না। পাঠকের জ্ঞাতার্থে 'দেশ' পত্রিকায় প্রেরিত চিঠিটি হুবহু প্রকাশ করা হচ্ছে; 'দেশ' ছাপেনি বলে নয়, প্রসঙ্গের অবতারণা হয়েছে বলে কিছু তথ্য পেশ করার উদ্দেশ্যে।

মাননীয় সম্পাদক, 'দেশ' পত্রিকা।

সবিনয় নিবেদন,

গত ২ নভেম্বর, ২০১৫ সংখ্যার 'দেশ' পত্রিকায় বাদল বসু 'পিওন থেকে প্রকাশক' ধারাবাহিক রচনায় কমলকুমার মজুমদারের গ্রন্থ প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি কী ঝামেলায় পড়েছিলেন তা বোঝানোর জন্য ১৭.১০.১৯৮৯ তারিখে তাঁকে লিখিত দয়াময়ী মজুমদারের একটি চিঠি প্রকাশ করেছেন। চিঠিটি প্রকাশের জন্য বাদল বসুর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। যে প্রসঙ্গটি চিরকাল অন্ধকারে রয়ে যেত তা আলোয় আনার সুযোগ করে দিয়ে গেলেন তিনি।

বাদল বসুকে লিখিত চিঠিতে দয়াময়ী মজুমদার আমার সম্পর্কে যা-যা লিখেছেন তা বর্ণে বর্ণে সত্যি। আরো কিছু তথ্য সংযোজন করে আমি এই 'সত্যি'গুলোকে মজবুত-সত্যি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাই।

কমলকুমারের 'গল্প সমগ্র'-র সম্পাদনার প্রস্তাব স্বয়ং দয়াময়ীই আমাকে দিয়েছিলেন এবং আমি তা সানন্দেই করতে রাজি হয়েছিলাম। এমন লোভনীয় ও সম্মানীয় প্রস্তাব এলে কোন আহাম্মক অরাজি হয়? দয়াময়ীর কথামত আমি সম্পাদনার কাজ শুরু করে দিই। প্রকাশকাল অনুসারে গল্পগুলি সাজাতে শুরু করি। তখনো অনেক গল্প সংগ্রহ করতে পারিনি — দ্বিগুণ উৎসাহে তার সন্ধানে নেমে পড়ি। প্রায় সিংহভাগ গল্প যখন সংগ্রহ হয়ে গেছে, ঠিক তখনই দয়াময়ী আমাকে ডেকে জানান, আমি নয়, সম্পাদনা করবেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার তুলনা চলে না। কিন্তু মাঝপথে হঠাৎ আমাকে বাতিল করায় আমি খুব কষ্ট পেয়েছিলাম, হতাশ হয়েছিলাম। তা সত্ত্বেও আমি 'গল্প সমগ্র' প্রকাশে কোনো রকম অসহযোগিতা করিনি। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যখনই যা গল্প সংগ্রহ করেছি তৎক্ষণাৎ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলাম। আমি চেয়েছিলাম সমগ্র গল্প নিয়েই 'গল্প-সমগ্র' প্রকাশ পাক। তবুও শেষ পর্যন্ত 'স্বাতী নক্ষত্রে জল' গল্পটি যথাসময়ে সংগ্রহ করতে পারি নি বলে ওই গল্পটি ছাড়াই 'গল্প সমগ্র' প্রকাশ পায়। (এখনো ওই গল্পটি ছাড়াই 'গল্প সমগ্র' প্রচারিত।

অন্যান্য প্রমাদগুলিও অমনিই আছে।) আমার গল্প পৌঁছে দেওয়ার কথা গ্রন্থটির ভূমিকায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন এই ভাষায় : ''....উষ্ণীষ নামে অধুনা বিস্মৃত একটি পত্রিকায় প্রকাশিত 'মধু' নামে একটি গল্প দিয়ে যান এক যুবক।'' আমার নামের পরিবর্তে কেন 'যুবক' লিখতে হল সে সম্পর্কে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৭.১১.১৯৯০ তারিখের একটি চিঠিতে আমাকে জানান, ''তুমি কমলকুমার মজুমদারের একটি দুর্লভ গল্প আমাকে দিয়ে গিয়েছিলে। তারপর অনেক দিন আসো নি। তোমার ঠিকানা জানি না, পুরো নামটা মনে পড়েনি বলে ভূমিকায় তোমার নাম দিতে পারি নি। নইলে, তোমার নামের স্বীকৃতি দিতে কোনো অসুবিধাই ছিল না।'' সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কেমন সম্পাদনা করেছিলেন, সে সম্পর্কে আমি বিস্তৃত লিখেছিলাম 'প্রতিক্ষণ' আগস্ট, ১৯৯১ সংখ্যার পুস্তক সমালোচনা বিভাগে 'গল্প সমগ্র'-র আলোচনা করে।

মালা চক্রবর্তীর কাছে রক্ষিত প্রয়াত সুব্রত চক্রবর্তীর সংগৃহীত কমলকুমার বিষয়ক 'সব কিছুই' আমি নিয়েছি — সত্যি কথা। মাসের পর মাস প্রতি রবিবার কিংবা ছুটির দিনে ঘন্টার পর ঘন্টা মালাদির উপস্থিতিতে সে-সব আমি লিখে নিয়েছিলাম। সামান্য কিছু জেরক্স করি। সব কিছু জেরক্স করার মত আর্থিক সংগতি আমার ছিল না, আমি তখন এম. এ-র ছাত্র। তাছাড়া বর্ধমানে জেরক্স যত্রতত্র পাওয়াও যেত না তখন। আমি যে অরিজিনাল কিছুই নিই নি তা বাদল বসুর রচনাতেই ইঙ্গিত রয়েছে স্পষ্ট। তিনি দয়াময়ীর চিঠি পেয়েই বর্ধমান গিয়ে মালা চক্রবর্তীর কাছে 'অনেক লেখাপত্র উদ্ধার করে' এনেছিলেন। 'সব কিছু'-ই নিলে বাদল বসু 'অনেক লেখাপত্র' পেলেন কি করে? আর সেগুলো নিয়ে তিনি কি করেছেন আজও ত জানা গেল না।

সুব্রত চক্রবর্তীর সংগ্রহে কী কী ছিল সুব্রত নিজেই তা প্রকাশ করে যান 'এক্ষণ' ১৩৮৮-র শারদ সংখ্যায়। মালা চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার যোগাযোগ হবার আগেই বেশ কিছু 'লেখাপত্র' দয়াময়ী ফেরৎ নিয়েছিলেন। সুব্রত সংগৃহীত 'শবরী মঙ্গল' আংশিক উপন্যাসটি, যার প্রথম অর্ধেকটা হারিয়ে যায়, দয়াময়ীর হস্তাবলেপনে সম্পূর্ণ হয়ে 'রবিবাসর' শারদ সংখ্যা ১৯৮৩ তে প্রকাশিত হয়, তাতেই তা প্রমাণ হয়। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, মালা চক্রবর্তীর সন্ধান ও তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ দয়াময়ীই স্বয়ং করিয়ে দিয়েছিলেন এবং সুব্রত সংগৃহীত 'লেখাপত্র' ব্যবহারের অনুমতিও দিয়েছিলেন।

'কবিতীর্থ' শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত 'প্রিনসেস' গল্পটি নিয়ে দয়াময়ী যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন চিঠিতে, তা অমূলক। 'প্রিনসেস' একটি প্রকাশিত গল্প। আসলে দয়াময়ীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক-দূরত্ব এই উদ্বেগের কারণ। গল্পটির উৎস আনন্দ পাবলিসার্স থেকে প্রকাশিত রাঘব বন্দ্যোপাধায় রচিত 'কমলকুমার, কলকাতা : পিছুটানের ইতিহাস' গ্রন্থের (দ্বিতীয় মুদ্রণ) ১৯১ পৃষ্ঠায় আমার নামসহ উল্লেখ আছে। 'কবিতীর্থ' গল্পটি পুনর্মুদ্রণ করে এবং তা আমিই দিয়েছিলাম।

'দু হাজার টাকার বিনিময়ে' লেখাগুলো দেব বলেছিলাম এটাও সত্যি কথা। দু-হাজার টাকাই বা কেন, কেন পাঁচ/দশ হাজার টাকা নয়? লেখাগুলো সংগ্রহ করতে আমার যে-টাকা খরচ হয়েছিল কেবলমাত্র ততটুকুই আমি দাবি করেছিলাম। লেখাগুলো তো নিয়েছেন (নইলে 'গল্প সমগ্র' প্রকাশ হল কি করে), কোনো টাকা কি আমাকে দিয়েছিলেন দয়াময়ী? দিলে, চিঠিতে তা

উল্লেখ থাকতো অবশ্যই। এত সবের পরও তো আমি বিনাশর্তে আমার সংগ্রহ থেকে কমলকুমার মজুমদারের সমস্ত প্রবন্ধ ফাইল বন্দি করে তুলে দিয়েছিলাম 'প্রমা'-র প্রকাশক সুরজিৎ ঘোষ মশাইকে। তিনি 'প্রবন্ধ সমগ্র' প্রকাশ করবেন বলে প্রবন্ধগুলি নিয়ে যান দয়াময়ীর নাম করে। একটু দেরি করে হলেও, ফটোকপি করে সমস্ত প্রবন্ধগুলিই সুরজিৎ ঘোষ আমাকে নিজে ফেরৎ দিয়ে যান 'প্রতিক্ষণ' দপ্তরে। স্বাক্ষী, কবি শিবশম্ভু পাল। তিনি শেষ পর্যন্ত কেন গ্রন্থটি প্রকাশ করেন নি, বলতে পারব না। বাদল বসুর রচনাটি থেকে জানতে পারলাম সুরজিৎ ঘোষ মশাই নাকি পাণ্ডুলিপিটি হারিয়ে ফেলেন।

এখানেও একটা ধন্দ রয়ে যাচ্ছে। কমলকুমার মজুমদারের যে প্রবন্ধগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে তাতে কৃতজ্ঞতা স্বীকারের নামের তালিকায় আমার নামটিও রয়েছে। গ্রন্থটি প্রকাশে আমি তো কোনো সাহায্য করিনি। প্রকাশক, সম্পাদক কাকেও আমি চিনি না, তাঁরাও সম্ভবত আমাকে চেনেন না — তবে আমার নামটি কেন? কিসের জন্য কৃতজ্ঞতা? বিবেকের তাড়নায়? তবে কি আমারই সংগৃহীত প্রবন্ধগুলি নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে গ্রন্থটি, তাই? সুরজিৎ ঘোষ কি পাণ্ডুলিপিটি হারিয়ে ফেলেন নি তবে? নাকি তা খুঁজে পেয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তা দয়াময়ীকেই ফেরৎ দিয়ে আসেন? দুর্ভাগ্যের বিষয়, এসব প্রশ্নের মীমাংসা যাঁরা করতে পারতেন তাঁরা সবাই আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে।

তবুও একটা প্রশ্ন অসীমাংসিত রয়ে গেল — 'প্রমা'র গ্রন্থ প্রকাশ না করা এবং অন্য প্রকাশকের প্রবন্ধ সংগ্রহ প্রকাশ করার মাঝের সময়টিতে বাদল বসুর ঠিক কী ভূমিকা ছিল তিনি তা জানান নি। তিনি কি গ্রন্থটি প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন? আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশের দায় নিলে তুলনায় একটি অনামী প্রকাশন সংস্থায় দয়াময়ী তা দেবেনই বা কেন? নাকি ও-গ্রন্থে বাণিজ্যিক সম্ভাবনা কম দেখে বাদল বসু কোনো উদ্যোগই নেননি প্রকাশের? সুরজিৎ ঘোষ পাণ্ডুলিপি যদি হারিয়েও ফেলেন, তার উৎস ত দয়াময়ী জানতেন। তিনি অনায়াসে আমার কাছ থেকে তা পুণরায় সংগ্রহ করতে পারতেন। আমি যখন 'প্রমা'কে দিয়েছি, 'আনন্দ'কে কি দিতাম না? কমলকুমারের রচনাবলি প্রকাশে বাদল বসু কতটা আন্তরিক — এ সম্পর্কে একটা সন্দেহ থেকে যাচ্ছে না কি? 'গোলাপ সুন্দরী' থেকে পা টিপে-টিপে 'উপন্যাস সমগ্র'-য় পৌঁচেছেন নিছক কমল-প্রেমে নয় তাহলে? ইন্দ্রনাথ মজুমদার ও বাদল বসুর মধ্যে পার্থক্যটি কোথায় তিনি নিজেই কিন্তু দেখিয়ে দিয়েছেন।

দয়াময়ী লিখেছেন, আমি তারপর নাকি ওনার 'ক্ষতি করার' চেষ্টা করেছি। দয়াময়ী মজুমদারের ক্ষতি করব আমি? আমি কে? কতটুকু ক্ষমতা আমার? পুরুলিয়া জেলার একটি গ্রামের নগণ্য এক ছোকরা, কলকাতা শহরে ভেসে বেড়াচ্ছি। দয়াময়ীর ঘনিষ্ঠ, স্নেহভাজন বিখ্যাত সব মহামানবদের সামান্যতম কৃপাদৃষ্টির আশায় সব সময় তাঁদের পদতলে নতজানু, কীটানুকীট আমি দয়াময়ীর কি ক্ষতি করতে পারতাম?

তবে হ্যাঁ, দয়াময়ীর নিজের লেখাকে কমলকুমারের বলে চালিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে আমি সাধ্যমত সরব হয়েছিলাম। 'আনন্দমেলা' শারদীয় সংখ্যা ১৯৮৮ - তে কমলকুমার মজুমদারের নামে একটি 'ছড়া' প্রকাশিত হয়, আসলে তা ছিল দয়াময়ীর রচনা। আমি তথ্যসহ এর প্রতিবাদ

করি। 'আনন্দমেলা' তার সংশোধনী ছাপে। ১৯৮৯ সালের শারদীয় 'কবিতীর্থ' পত্রিকায় আমি 'কমলকুমার মজুমদার : মুখ ও মুখোশের দ্বন্দ্ব' নামে চার কিস্তির ধারাবাহিক রচনায় কমলকুমারের রেখে যাওয়া অসম্পূর্ণ রচনাগুলিকে দয়াময়ীর সম্পূর্ণতা দেওয়ার বিরুদ্ধে তথ্যসহ তীব্র প্রতিবাদ করেছিলাম। কমলকুমারের ব্যক্তিজীবন নিয়ে আরো কিছু প্রসঙ্গ সে লেখায় ছিল — যা দয়াময়ীর হয়ত মনঃপুত হয় নি। তিনি কিন্তু ওই লেখাটির বিরুদ্ধে কোনো রকম তথ্যবিকৃতির অভিযোগ আনতে পারেন নি। প্রকাশিত চিঠিটির তারিখ দেখে বুঝতে পারছি, আমার এই সব প্রতিবাদ বা আপত্তি ও কমলকুমারের জীবন নিয়ে বেশ কিছু নতুন তথ্য প্রকাশের পর-পরই দয়াময়ী বাদল বসুকে এই চিঠিটি দিচ্ছেন। তিনি কি বিপন্ন বোধ করেছিলেন? তিনি কি কোনো ভাবে আমাকে নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন? বাদল বসুকে তিনি কি এ বিষয়ে ত্রাতার ভূমিকায় দেখতে চেয়েছিলেন? হয়ত। আমি শুনেছি, দয়াময়ী আমাকে নিরস্ত করবার জন্য আরও কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে এই জাতীয় চিঠি লিখেছিলেন। আমাকে ত লিখেইছেন।

কমলকুমারের রচনা - সমগ্র যে আজ আমাদের হাতে, তাতে আমার কি ভূমিকা — সময় সঠিক তথ্যই পরিবেশন করবে একদিন। 'এক্ষণ' ১৩৮৮ শারদীয় সংখ্যায় সুব্রত চক্রবর্তী কৃত কমলকুমারের রচনার তালিকা এবং 'উত্তরাধিকার' কমলকুমার সংখ্যায় আমার কৃত রচনা-তালিকার দিকে চোখ বোলালেই পাঠক বুঝতে পারবেন কমলকুমারের রচনা সম্পর্কে তাঁর ঘনিষ্ঠ নিত্যসহচর ও অনুরাগীরাও কতটা অন্ধকারে ছিলেন। কমলকুমারের তথ্যনিষ্ঠ জীবনী আজও প্রকাশ হয় নি, সেও ত আমাকেই লিখতে হচ্ছে! কমলকুমারের পত্নী এবং স্বঘোষিত কমল-অনুরাগীদের কাছ থেকে এজাতীয় কুৎসা, অসহযোগিতা ও বিরুদ্ধ আচরণ কাজ করার প্রায় প্রথম দিন থেকেই পেয়েছি। এ সব গ্রাহ্যের মধ্যে না রেখে আমি আমার কাজ করে যাব।

১৬.১১.২০১৫
হিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায়
আসানসোল

৫. 'কমলকুমার, কলকাতা : পিছুটানের ইতিহাস' গ্রন্থে রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় কমলকুমারের ব্যক্তিগত লাইব্রেরি ও তাঁর পাঠ-পরিধির খোঁজ নিতে গিয়ে হতাশ হয়েছেন বলে জানিয়েছেন। শানু লাহিড়ির কাছে রক্ষিত মাত্র কয়েকটি বই ছাড়া তিনি তাঁর বাড়িতেও কোন বই দেখতে পান নি। না পাওয়ারই তো কথা। বিবাহ-পরবর্তীকালে যে মানুষের থাকারই কোন ঠিকঠিকানা নেই, সে মানুষ কেন মিছিমিছি বইয়ের বোঝা বাড়াবেন ব্যক্তিগত লাইব্রেরি বানিয়ে? বই কেনার অর্থই বা কোথায় তখন? যখন তিনি থিতু হন, ততদিনে বই পড়ার খিদে অনেকটা মিটে গেছে। পাঠের প্রয়োজন তিনি লাইব্রেরিতেই মিটিয়ে নিতেন। তিনি আর কি কি বই পড়তেন, তৎকালীন ন্যাশনাল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিককে অনুরোধ করেছিলাম ন্যাশনাল লাইব্রেরির সংরক্ষণাগার থেকে সম্ভব হলে সরবরাহ করতে, তিনি কিছু সুরাহা করতে পারেন নি। কমলকুমার কি কি বই পড়তেন, তার একটা তালিকা প্রকাশ করার ইচ্ছা বহুদিন ধরেই আছে।

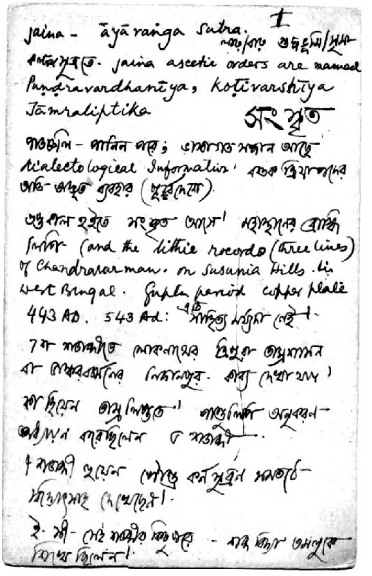

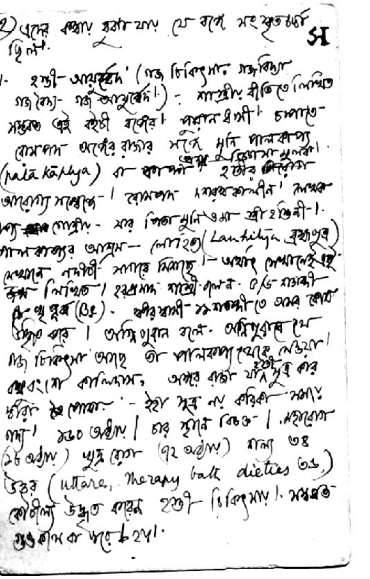

সংস্কৃত / প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থের বিবরণ

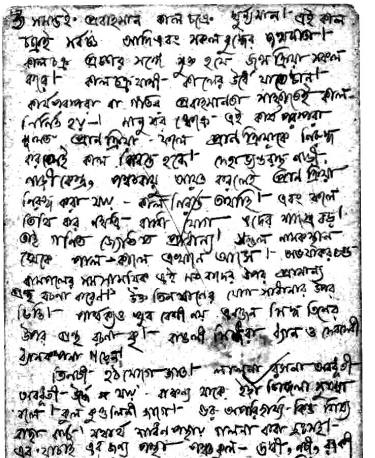

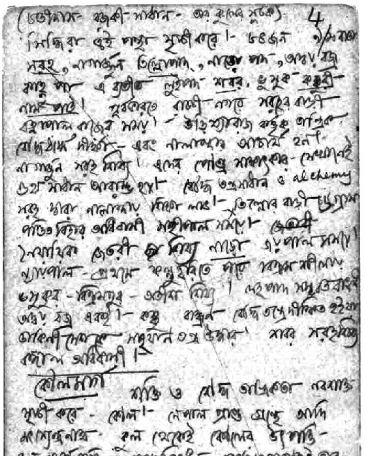

প্রাচীন সাহিত্য পাঠ

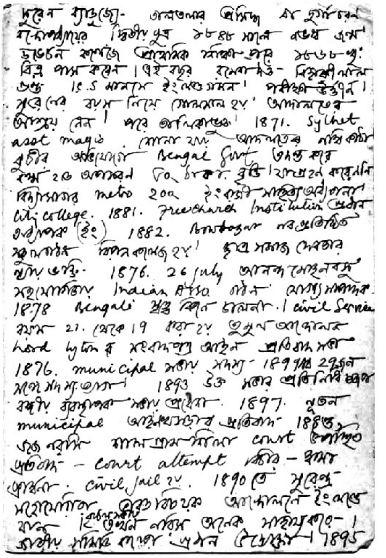

সংস্কৃত / প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থের বিবরণ

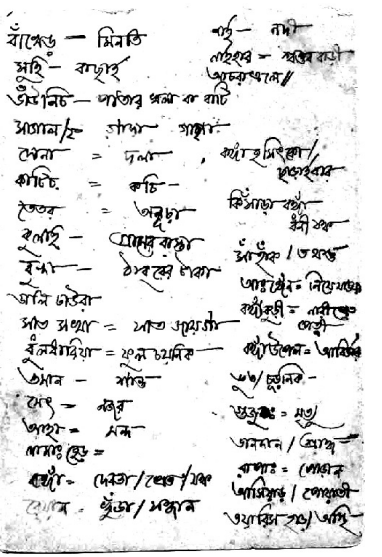

সাঁওতালি শব্দের বাংলা

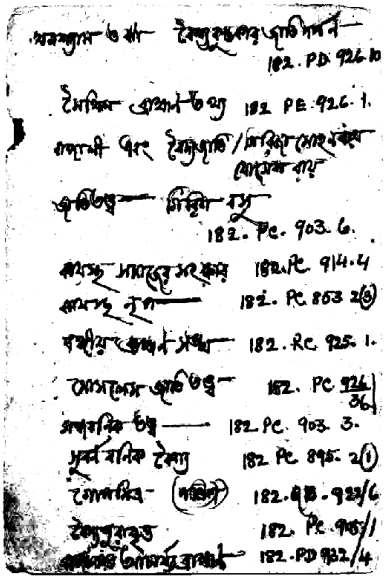

গ্রন্থতালিকা

বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাস পাঠ কমলকুমার নোট লেখার সঙ্গে ছবি দিয়ে সাজাতেন, তেমন একটি কার্ড

গহনা বিষয়ক সার্ভে

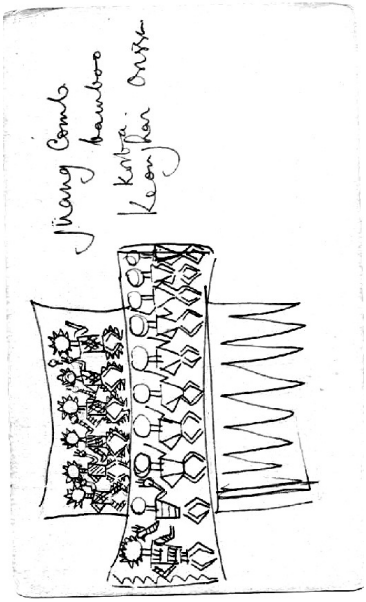

বাঁশের চিরুনি : উড়িষ্যা

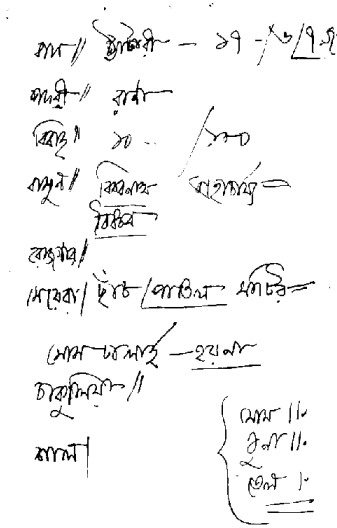

জনগণনা বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কার্ড

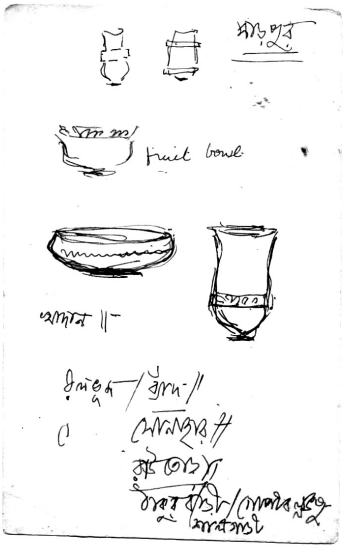


কাঁচের পাত্রের স্কেচ
জনগণনা বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কার্ড

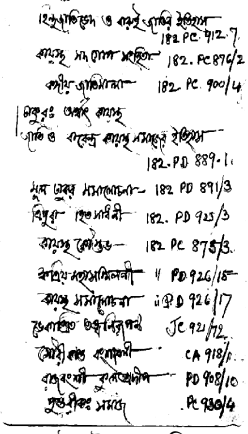

পাঠ্য বইয়ের তালিকা

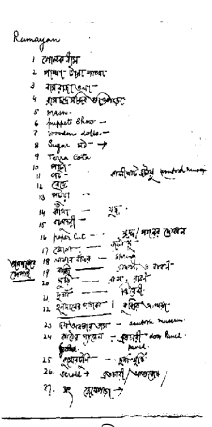

লোকায়ত জীবনে পুরাণ

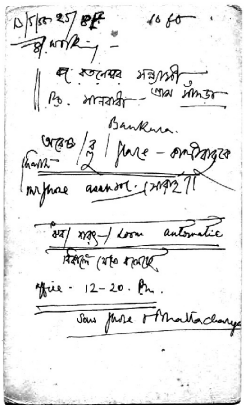

জনগণনা বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কার্ড

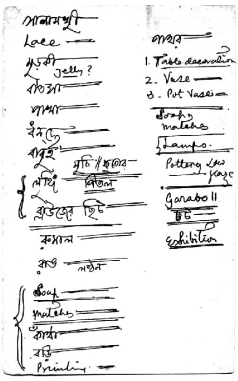

জনগণনা বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কার্ড

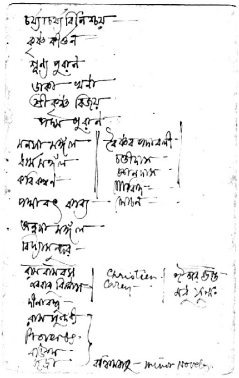

প্রাচীন সাহিত্য পাঠ

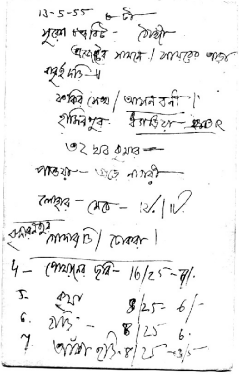

জনগণনা বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কার্ড

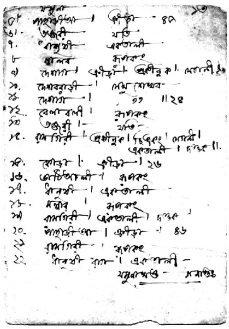

প্রাচীন সাহিত্য পাঠ

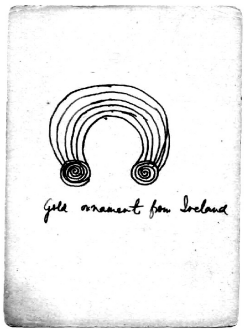


গহনার স্কেচ

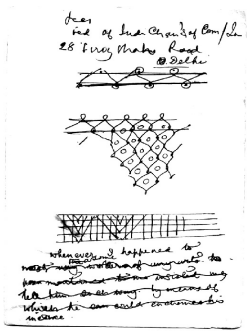

জনগণনা বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কার্ড

# সাহিত্যের শ্লীলতা-অশ্লীলতা প্রসঙ্গে কিছু কথা

ড. ব্রততী চক্রবর্তী*

শিল্প-সাহিত্যে শ্লীল-অশ্লীলের প্রশ্ন, তৎসম্পর্কিত জিজ্ঞাসা এবং সে বিষয়ে বিচার-বিবেচনা চলে আসছে অনেক কাল থেকেই। সকলেই সেই গল্পটি জানেন, এক চিত্রকরের আঁকা নগ্নিকা নারীর চিত্রটি বস্তুত অশ্লীল হয়ে পড়ল তখনই, যখন চিত্রকর তার দুটি পায়ে মোজা এঁকে দিলেন। ছবিটি তখন পূর্বের সমস্ত স্বাভাবিক সৌন্দর্য হারিয়ে অরুচিকর-অশ্লীল হয়ে উঠল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে সৌন্দর্যবোধ, পরিমিতিবোধ বা ঔচিত্যবোধের প্রয়োজনীয়তার কথা ভারতীয় সাহিত্য সমালোচকেরা অনেককাল আগেই জানিয়েছেন। এর অভাবে সাহিত্যের রসহানি ঘটে, এমনকি সাহিত্যে অশ্লীলতা দোষও ঘটতে পারে। রসোত্তীর্ণ সাহিত্যের সঙ্গে সত্য-সুন্দর মঙ্গলের যোগ অপরিহার্য। সৎ-সাহিত্য মনে গ্লানি আনে, যা অশোভন-অরুচিকর অভিমুখে নিয়ে যায়—সে রচনার সাহিত্য-গুণ সম্পর্কে সংশয় জাগে, সে রচনা অশ্লীল হয়ে উঠতে পারে।

ভারতীয় সাহিত্যে আদি রসকে প্রথম ও শ্রেষ্ঠ রসের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সাধারণত অশ্লীলতার সঙ্গে আদিরসকেই যুক্ত করা হয়ে থাকে। আদিরসের বর্ণনার ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ বা ঔচিত্যবোধের অভাব ঘটলে, রচনা অশোভন-অশ্লীল হয়ে উঠতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে, এক সময় যে সকল রচনাকে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, পরবর্তীকালে মাত্রাভেদে সে রচনাকে হয়ত আর তত দোষাবহ বলে মনে হয় না। বাংলা সাহিত্যে এমন উদাহরণের অভাব নেই। আবার এক দেশের সমাজ-ব্যবস্থায় হয়ত তেমন আচরণটাই স্বাভাবিক। দেশ-কাল-পাত্রভেদে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচি বদলায় এবং সেই রুচি অনুযায়ী সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচি অনুযায়ী সাহিত্যের উপাদান, বর্ণনাভঙ্গিমাও বদলায়।

প্রতিভাশালী লেখক কিন্তু যে-কোনো বিষয়কে রসোত্তীর্ণ সাহিত্যের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারেন, অপরপক্ষে প্রতিভাহীনের কলমে সাহিত্যের উপাদান হয়ে উঠতে পারে অশ্লীল। প্রতিভাশালী লেখক সময় বিশেষে সাহিত্যেরই প্রয়োজনে অশ্লীতাকে প্রশয়ও দিতে পারেন, কিন্তু সেই অশ্লীলতা দোষ-যুক্ত হয় না। অপরপক্ষে কোনো-কোনো লেখক বিশেষভাবে তুলে ধরতে চান নর-নারীর সম্পর্কিত জীবনের গোপণ দিকগুলিকে, বাস্তবতার নামে অনৈতিক-অভব্য আচার-আচারণকে। এই প্রবণতা তাদের রচনাকে বা রচনার অংশবিশেষকে অশ্লীল করে তুলতে পারে। কিন্তু বর্ণনীয় বিষয় যাই হোক না কেন যথার্থ প্রতিভাধর সাহিত্যিক ঔচিত্যের অলিখিত সীমা না ভেঙে সাহিত্যকে রসলোকে পৌঁছে দিতে পারেন।

---

*অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়।

ভারতীয় সাহিত্যে-ভাস্কর্যে আদিরসের পরম সৌন্দর্যময় প্রকাশ আজও রসপিপাসুদের মুগ্ধ করে। বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিকতাতেও আদিরসকে অলৌকিক রসলোকে পৌঁছে দেবার মত বড় প্রতিভার অভাব ঘটেনি। ভারতীয় সাহিত্য দেহকে স্বীকার করতে দ্বিধা করেনি, দেহের উপভোগ্য বর্ণনা করতেও সংকুচিত হয়নি, কিন্তু সেই সঙ্গে অস্বীকার করেছে দেহসর্বস্বতার প্রবৃত্তিকে। সৎ-সাহিত্য দেহাশ্রিত কিন্তু দেহাতীত মানবাত্মার সন্ধান দিয়ে থাকে। কিন্তু সাহিত্যে যদি দেহসর্বস্বতা আসে, তাহলে আবিলতাও আসবে।

শুধু আদিরসের অনুচিত বর্ণনা নয়, আচার-আচরণগত অনৌচিত্য ও সাহিত্যকে অশ্লীল করে তুলতে পারে। কোন সময় কোন আচরণ করা শোভনীয়, কার সঙ্গে কেমন আচরণ করা প্রয়োজন, এই বোধ যদি না থাকে, তাহলে ব্যবহারিক জীবনে যেমন, সাহিত্যের জগতেও তেমনি আসে অশ্লীলতা।

সাহিত্যে বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার উপর লেখকের অধিকার কেমন, তার ওপরও নির্ভর করে সাহিত্যের শ্লীলতা অশ্লীলতার প্রশ্নটি। যিনি অভ্রান্তভাবে ভাষার প্রয়োগ করতে পারেন না, যাঁর বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গে ভাষার সামঞ্জস্য ঘটে না, সেই রচনা দোষ যুক্ত হয়ে পড়ে। আবার বড় লেখকেরা সজ্ঞানে অপশব্দ প্রয়োগ করেন পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী, সাহিত্যেরই প্রয়োজনে, তখন কিন্তু তা অশ্লীল হয়ে ওঠে না। রবীন্দ্রনাথের মতো বিরল প্রতিভাধর সাহিত্যিকের রচনাতেও কিছু অপশব্দের প্রয়োগ এমন সহজ স্বাভাবিকভাবে ঘটেছে যে তা পড়ার সময় কখনই অশোভন শ্রুতিকটু ঠেকে না। কত সহজে রবীন্দ্রনাথের রচনায় এসেছে — হারামজাদা লক্ষ্মীছাড়া (বৈকুণ্ঠের খাতা), পিল হারামি (নৌকাডুবি), পোড়ারমুখী (চিরকুমার সভা), বেহায়াগিরি (তাসের দেশ), পোড়াকপালে মিনসে (মুক্তির উপায়), পাজি হতভাগা (পুরাতন ভৃত্য)-র মত বেশ কিছু অপশব্দ। এমনকি চোখখাকী। ভাতারখাকীর মত রূঢ় শব্দগুলিও হাস্যরসাত্মক হয়ে উঠেছে, যখন তিনি লিখলেন 'কোথা হইতে এক চক্ষুখাদিকা, ভর্তার পরমায়ুহন্ত্রী, অষ্টকুষ্টির পুত্রী উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিবে' (রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা)। প্রতিভাবান লেখকের হাতে অপশব্দও গ্রহণীয় হয়ে ওঠে।

সাহিত্যে শ্লীল-অশ্লীলের প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক কালের কয়েকজন মহিলা লেখকের নাম বারংবার এসে পড়ে। পুরুষশাসিত সমাজে ক্রমেই সর্বস্তরে নিজের যোগ্যতায় নারী তার নিজস্ব স্থান অধিকার করে নিচ্ছে। আর এর জন্য ঘরে-বাইরে নানাভাবে তাকে চরম মূল্যও দিতে হচ্ছে। আজকের মহিলা লেখকদের কলমে মহিলাদের সমস্যার নানা কথা রূপায়িত হচ্ছে ব্যাপকভাবে। মহিলাদের সংলাপের ভাষা সময় বিশেষে তীব্র-ক্ষুরধার, অশোভন, এমনকি অশ্লীল হয়ে ওঠে কারও কলমে। কেউ কেউ স্পষ্ট-সাবলীল-অকুণ্ঠিত ভাষায় নির্দ্বিধায় নরনারীর অনৈতিক, অন্তরঙ্গ শারীরিক সম্পর্কের বর্ণনা করেন পাঠককে স্তম্ভিত করে দিয়ে। আমরা লজ্জিত হই, আমাদের নীতিবোধ গভীরভাবে আহত হয়। আমরা আতঙ্কিত হই। এমন রচনাকে গ্রহণ করা যায় না আবার রচনার সামগ্রিকতার বিচারে সব

সময় তাকে অস্বীকারও করা যায় না। কারণ অশ্লীলতার বিচার তো রচনার অংশবিশেষ নয়, তার আদি-মধ্য-অন্ত্য নিয়ে পরিপূর্ণ বিন্যাসের মধ্যে নিহিত!

সম্ভবতঃ পুরুষ লেখক এবং মহিলা লেখিকা, এমন বিভাজনকে অস্বীকার করে, শুধুমাত্র লেখকের পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে চেয়েছেন আধুনিক মহিলা লেখকরা। লেখার ব্যাপারে পুরুষেরা যতটা স্বাধীন, ততটা স্বাধীন তারাও হতে চেয়েছেন। মহিলাজনোচিত শালীনতার নামে সীমায়িত হয়ে থাকতে চাননি। তাদের রচনাংশের আবিলতা বা আশ্লীলতা তাদের রচনার শেষ কথা অবশ্যই নয়।

শেষের একটি কথা বলতে চাই। সাহিত্যে অশ্লীলতার দায় কি শুধু লেখকের? প্রকাশকের কি কোনো দায়িত্ব নেই? প্রকাশকেরা হিসাব করেন কোন লেখাটা বাজারে কাটবে এবং তার জন্য কী করণীয় তাও ভাবতে তাদের হয়। যে লেখকের রচনায় যেখানে যত উত্তেজক বর্ণনা থাকে, সেই অংশটুকু বড় অক্ষরে বিজ্ঞাপিত করা হয় পাঠকদের আকৃষ্ট করার জন্য! এক সময় সাহিত্য পাঠের আনন্দকে চরম সম্মানিত করে বলা হয়েছিল, সে আনন্দ ব্রহ্মানন্দ সহোদর। সেই মূল্যায়ন কি আজকের দিনে সংশয়াচ্ছন্ন করে না আমাদের?

সমাজ-বাস্তবতা, জীবনের সামগ্রিকতা সাহিত্যে থাকবেই। কিন্তু মানুষ তো কখনও নীতিসর্বস্বহীনতায় পর্যবসিত হতে পারবে না। তাই সৎ সাহিত্য চাই। ভালোর সঙ্গে মন্দের মত, শ্লীলের সঙ্গে অশ্লীলও থাকবে চিরকাল। পাঠকের রুচি যত উন্নত হবে, উন্নত রুচির সাহিত্য-ই হবে তার কাম্য। সরস্বতীর বরপুত্রের সাধনা করতে হবে শুধু লেখককে নয় পাঠককেও।

**প্রকৃত গবেষণামূলক রচনা প্রকাশে আমরা দায়বদ্ধ।**

**গবেষক-অধ্যাপকদের সাদরে আহ্বান জানানো যাচ্ছে আপনার চিন্তা-সমৃদ্ধ রচনাটি আমাদের দেবার জন্য।**

**আগামী সংখ্যা মার্চে।**

**আপনার রচনাটি নকল রেখে হাতে লিখে বা ডি.টি.পি করে আমাদের দপ্তরে পাঠিয়ে দিন।**

**ই-মেল মারফৎও পাঠাতে পারেন।**

E-mail : ashis.jibonda.roy@gmail.com

# মেয়েদের কবিতা (১৯৫০-২০০০) ঃ বহমান অভিজ্ঞতার কথালিপি

ড. অপর্ণা রায়*

সময়টা ততদিনে অনেকটাই বদলে গেছে। দস্তয়ভস্কির সোনিয়া বা নাস্তাসিয়া, পুশকিনের তাতিয়ানা, তুর্গেনিভের লিজা কিংবা ইলিনা, তলস্তয়ের মাসলোভাদের আর্কেটাইপ ভেঙেচুরে জ্বলে উঠেছে 'মান্দারলে'(manderley) হাউস। সেই আগুনে দ্যু মারিয়াঁর রেবেকারা সশব্দে গড়ে নিয়েছে তাদের যাপিত জীবনের একান্ত নিজস্ব বর্ণমালা। নারীর চারপাশে জড়িয়ে থাকা, ছড়িয়ে থাকা স্নিগ্ধতা প্রত্নবলয় পুলিয়ে অ্যান সেক্সটন লিখেছেন, 'In Celebration of My Uterus'-এর মতো অসাধারণ কবিতা। বলেছেন,

Everyone in me is a bird,
I am beating my wings...

বিংশ শতাব্দীর শেষ পঞ্চাশ বছর। বর্ণ-বর্গ-লিঙ্গ বিভাজিত সামাজিক পরিসরে সারা বিশ্বে নারীর অবস্থান প্রাতিষ্ঠানিক নির্মাণের বৃত্তে। কিন্তু নান্দনিক ভুবনে সে ক্রমাগত বিকল্প বিশ্বের সন্ধান করে চলেছে। বাঙালিনির কবিতাও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। জৈবিক আনুভূমিক স্তর থেকে চৈতন্যের উল্লম্ব রেখায় চলেছে মেয়েদের কঠিনতম অভিযাত্রা। তৈরি হয়েছে নারীর নিজস্ব ভাষা, কথা বলার নিজস্ব ভঙ্গিমা। বঙ্কিমের সূর্যমুখী, শৈবলিনী, আয়েষা বা শ্রী থেকে শুরু করে 'যোগাযোগ'-এর কুমুদিনী বা 'ঘরে-বাইরে'-র বিমলারা কেউই এ ভাষায় কথা বলতে জানত না। এমনকি হালদার বাড়ির মেজোবউ ক্রমশ 'মৃণাল' হয়ে ওঠার কঠিন পথ-হাঁটায় সামিল হলেও নিজের প্রতিবাদী স্বরটুকু তুলে ধরার জন্য তাকে চিঠির 'নিরাপদ দূরত্ব' আশ্রয় করতে হয়েছিল। সব মিলিয়ে দৈনন্দিন যাপিতজীবন ও সেই জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ দৃষ্টিকোণ থেকেই বৈশ্বিক নারীদের সমান্তরে বাঙালিয়ানিরাও বিশশতকে দ্বিতীয়ার্ধের কবিতায় তাদের নিজস্ব বিনির্মাণ।

৯ মার্চ, ১৯৮৯ খ্রি. মানবী বিদ্যাচর্চাকেন্দ্র, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত 'Indian Women : Myth & Realtiy' শীর্ষক একটি আলোচনাচক্রের সূচক ভাষণে আশাপূর্ণা দেবী গভীর অক্ষেপের সুরে বলেছিলেন, আমাদের সমাজে নারীকে প্রতিদিনই সামাজিক প্রত্যাশাপূরণের জন্য আত্মঅতিক্রম করার চেষ্টা চালাতে হয়। কেননা, এই সমাজ 'নারী' শব্দটিকে চিরায়তরহস্য এবং অপ্রতিম সৌন্দর্যের আধারে 'আদর্শায়িত'রূপে দেখতেই স্বস্তিবোধ করে। সুতরাং সমাজে সম্মানজনক অস্তিত্বরক্ষার তাগিদে বাস্তব সংরক্ত নারীকে

*অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।

নিরন্তর আপস করতে হয় 'নারীত্ব' সম্পর্কিত নানা অর্ধসত্য ধারণার সঙ্গে। আর এই আপস আর আত্মসমর্পণের উপরেই নির্ভর করে তার সামাজিক মূল্যমান; সমাজ তার সেই 'আদর্শ ভূমিকা'র কাছে নিয়ত আত্মত্যাগ ও আত্মবিলোপ প্রত্যাশা করে। সহমরণসূত্রে মেয়েদের আত্মহনন, আত্মবিসর্জন ও সতীরূপে পূজিত হওয়ার মধ্যে আমরা এই সামাজিক ইচ্ছাপূরণের দৃষ্টান্ত খুঁজে পাই। এরই পরিমাণে উনিশ শতকের প্রথম দিকে বাঙালি মেয়ে কবিতা লিখত অপরিচয়ের অবগুণ্ঠনে। 'পিঞ্জরেতে পাখি বন্দী, জালে বন্দী মীন'-এর মতো হতশ্বাস সেই মেয়েলি জীবনে কালি-কলমের জন্য হাহাকার থাকলেও স্বাধীন কাব্যচর্চার সামাজিক অনুমোদন ছিল না। তবু সেকালে স্বশিক্ষিত কিংবা অন্তঃপুর শিক্ষায় শিক্ষিত এইসব মেয়েদের আত্মপ্রকাশের একমাত্র মাধ্যম ছিল কবিতা। অতএব 'জনৈক বঙ্গললনা', 'জগদ্দলবাসিনী' 'বারাসতস্থ ভদ্রকুলবালা', বর্ধমানস্থ কোন স্বপ্নভঙ্গ, মায়া ও নির্মমতা, মাধুর্য ও কুশ্রিতা মেলে ধরেছিলেন কবিতার অখরমালায়। আর এই সূত্রেই উনিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছরে, বাঙালিনির কবিতাভূবনে ধরা দিয়েছিল সামাজিক প্রত্যাশার চাপে নিয়ত ক্ষতবিক্ষত, বিধ্বস্ত মেয়েদের অসহায়তার বয়ান, তাঁদের আত্মজাগরণের ইশারা।

ঊনবিংশ শতকের শেষ পঞ্চাশ বছর। ফেব্রুয়ারি, ১৮৫১ খ্রি. ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠার পর বেথুন সাহেব ঘোষণা করেছিলেন,

"For her own sake and in her own right I claim for women her proper place in the scale of created beings. God has given her an intellect, a heart and feeling like your own and these were not given in vain."

পরিণামে সমাজের উপরতলায় মেয়েদের জীবনে অন্তঃপুর শিক্ষার পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রসার শুরু হয়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে যদি হয় বাঙালিনির আত্ম-অন্বেষণের কাল, তাহলে দ্বিতীয়ার্ধ হল বাঙালি মেয়েদের আত্মপরিচয় ও আত্ম-উন্মোচনের পর্ব। ১৮৫০-১৯০০ সময়কালে আমরা দেখি, মেয়েরা ক্রমশঃ স্বনামে, স্বতন্ত্র পরিচয়ে সাহিত্য-বিশ্বে পা রেখেছেন। এবার আর পত্র-পত্রিকায় শুধু খণ্ড কবিতা নয়; প্রকাশিত হয়েছে নানা মুদ্রিত গ্রন্থ। সংঘমিত্রা চৌধুরী 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহিলা রচিত রচনার ক্রমবিকাশ' (১৮৫০-১৯০০) আলোচনা প্রসঙ্গে মেয়েদের লেখালেখিকে কয়েকটি দশকে পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন,

| সময় | প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ | মোট মুদ্রিত গ্রন্থ |
|---|---|---|
| ১৮৫০-৫৯ | ১টি | ৫টি |
| ১৮৬০-৬৯ | ৫টি | ১৯টি |
| ১৮৭০-৭৯ | ২৭টি | ৬১টি |
| ১৮৮০-৮৯ | ৩৭টি | ৮৯টি |
| ১৮৯০-১৯০০ | ৭০টি | ১২৩টি |

অর্থাৎ, সব মিলিয়ে উনিশ শতকের শেষ পাঁচ দশকে মহিলারচিত প্রায় ২৯৭টি মুদ্রিত গ্রন্থের খবর পাওয়া যায়, তার মধ্যে ১৪০টি ছিল কবিতার বই। এই পরিসংখ্যানের পাশাপাশি কিন্তু রয়েছে কবিতা লেখার অপরাধে 'রোষপরায়ণ' কবিতাবিরোধী এক পতিদেবের মানস অত্যাচারে ক্লিষ্ট হয়ে' কবি নীলনলিনী বসুর মাত্র ১৯ বছরে মারা যাওয়ার নির্মম বাস্তবতা। এই কবি তাঁর একমাত্র কাব্যগ্রন্থ 'বালুকণায়' (প্রকাশ, ১৯০৩) লিখেছিলেন,

''হৃদয় চিরিয়ে মম/যদি দেখাবার হত/দেখতাম তবে হায়/তাতে কি দারুণ ক্ষত।''

আসলে প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিয়ত যুদ্ধের পরিণামে এই দীর্ঘশ্বাস, এই যন্ত্রণা ছিল সেকালে অধিকাংশ মেয়েদের জীবনের চরম সত্য।

তাই কোনো বৌদ্ধিক পরিপূর্ণতার অনুসন্ধান কিংবা আত্মপ্রচারের তাগিদে নয়, নিজের মনের কথা নিজের মনের মতো করে বলার অপরিসীম আকুতিই ছিল বাঙালিনির কবিতাচর্চার প্রাথমিক প্রেরণা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কৃষ্ণকামিনীদাসীর 'চিত্তবিলাসিনীর' (১৮৫৬) কথা। বাঙালি মেয়ের লেখা প্রথম মুদ্রিত কাব্যগ্রন্থ। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচয়হীন এই কবি প্রতিকূল সামাজিক প্রতিবেশের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে কৌলীন্যপ্রথা নিপীড়িত বঙ্গীয় সমাজের নানা সমস্যার প্রেক্ষিতে তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। এক্ষেত্রে কবিতাগুলির শিরোনাম লক্ষণীয়— 'লম্পট ব্যক্তির পত্নীর সহচরী সমীপে বিলাপ', 'নায়ক আশায়ে নায়িকা জাগরণে যামিনী যাপন করিয়া প্রভাতে সখি প্রতি বলিতেছেন', 'কোনো বিরহিনীর বিলাপ', 'নিদ্রোত্থিত বিরহিনীর বিলাপ' ইত্যাদি। কৃষ্ণকামিনী ছাড়াও রেভারেন্ড জেমস্ লঙ, সাতজন লেখিকার কথা বলেছেন— বামাসুন্দরী দেবী, হরকুমারী দাসী, কৈলাসবাসিনী দেবী, সৌদামিনী সিংহ, রাখালমণি গুপ্ত, কামিনীসুন্দরী দেবী, বসন্তকুমারী দাসী। সেদিন বাঙালিনিদের বহু কাব্যগ্রন্থের শিরোনাম থেকে অনায়াসেই তাঁদের সামাজিক অবস্থান ও অভীপ্সা অনুধাবন করা যায়। যেমন, হরকুমারী দাসীর কাব্যগ্রন্থের নাম ছিল 'বিদ্যাদারিদ্রদলনী' (১৮৬২), অন্নদাসুন্দরী দাসীর কাব্যনাম 'অবলাবিলাপ' (১৮৭২), ইন্দুমতী দাসীর 'দুঃখমালা' (১৮৭৪), কামিনীসুন্দরীদাসীর 'কল্পনাকুসুম' (১৮৮১) ইত্যাদি। ঠাকুরবাড়ির উজ্জ্বলবৃত্তের বাইরে দাঁড়ানো উনিশ শতকের সাধারণ মেয়েলি জীবন এইসব কাব্যগ্রন্থে তার আধ্যাত্মিক বিশ্বাস, প্রকৃতিমুগ্ধতা, জীবনের নৈতিক মূল্যবোধ, তার ব্যক্তিক শোকদুঃখ ও বিদ্যার্জনের দ্বারা মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আবর্তিত হয়েছে।

The Statesman and Friend of India, March 12, 1883-র রিপোর্ট থেকে জানা যায়, প্রায় ৫০ হাজার মহিলা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও অন্তঃপুর শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিলেন। উনিশ শতকের অন্তিম পর্বে নারী-শিক্ষার এমন অগ্রগতি ও সমাজ মানসিকতার ক্রমপরিবর্তনসূত্রে, উদারমনস্ক পারিবারিক প্রতিবেশের সাহচর্যে বেশ কিছু মহিলা বাংলা কাব্যজগতে তাঁদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। কিছু খণ্ডিত কবিতা বা দু'একটি মুদ্রিত গ্রন্থ নয়, এঁদের প্রায় সকলেই ধারাবাহিক কাব্যচর্চার ইতিহাস ছিল। মহাকাব্য থেকে আখ্যায়িকা

কাব্য, সনেট থেকে গাথাকবিতা ও খণ্ডকবিতার ব্যাপ্ত ক্যানভাস ছিল এঁদের কবিতাভুবন। তবে শুধু কবিতা নয়, এঁরা অনেকেই বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় নানা স্বাধীন রচনা লিখতেন; গল্প-উপন্যাস তো লিখেছেনই— পত্র-পত্রিকা সম্পাদনাও করতেন। কারো নাম ছিল, জগন্মোহিনী দেবী (১৮৪৭-৯৮), মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় (আনু. ১৮৪৮-১৯০০), তরু দত্ত (১৯৫৬-৭৭), প্রসন্নময়ী দেবী (১৮৫৭-১৯০৯), গিরীন্দ্রমোহিনী দত্ত (১৮৫৮-১৯২৪), মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩), অনঙ্গমোহিনী দেবী (১৮৬৪-১৯১৮), কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩); মহারাণি সুনীতি দেবী (১৮৬৪-১৯৩২), নীরদমোহিনী বসু (১৮৬৪-১৯৫৪), সুরবালা ঘোষ (১৮৬৭-১৯৩৩), ফুলকুমারী গুপ্ত (১৮৬৯-১৯৩১), অম্বুজাসুন্দরী দাশগুপ্ত (১৮৭০-১৯৪৫), হিরণ্ময়ী দেবী (১৮৭০-১৯২৫), প্রিয়ম্বদা দেবী (১৮৭১-১৯৩৫), প্রমীলা নাগ (বসু) (১৮৭১-১৮৯৬), সরলাবালা দাসী (১৮৭২-৯৬), সরলাবালা দেবী চৌধুরাণী (১৮৭২-১৯৪৫), অন্নদাসুন্দরী ঘোষ (১৮৭৩-১৯৫০), সুরমাসুন্দরী ঘোষ (১৮৭৪-১৯৪৩), লজ্জাবতী বসু (১৮৭৪-১৯৪২), হেমলতা ঠাকুর (১৮৭৪-১৯৬৭), সরলাবালা সরকার (১৮৭৫-১৯৫৮) প্রমুখ রঙ্গলাল-মধুসূদন-হেমচন্দ্র- নবীনচন্দ্রের কালেই এঁরা কবিতা লিখেছিলেন। অনেকের ক্ষেত্রেই 'শোক' থেকে জন্ম নিয়েছিল শ্লোক। এইসব কবিতা সূত্রে উনিশ শতাকীয় গীতিকবিতার জগতে 'সারদামঙ্গলী'য় রোমান্টিকতার সঙ্গে গার্হস্থ্য বাস্তবতার মেলবন্ধন রচিত হয়। তবু শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যখন এইসব কবিতা 'তুলসীতলায় জ্বালা সন্ধ্যাপ্রদীপের স্তিমিত আলোকের ন্যায়' বলেন, তখন সে অভিমত সর্বাংশে সমর্থন করা যায় না। এইসময় বাঙালিনির কবিতা ভুবনে সংবেদী মন ও মননের সার্থক সমন্বয়ও লক্ষ করা যায়। নিছক জৈবিক প্রজননক্ষেত্রের পরিচয়টুকু পার হয়ে সেদিন বঙ্গললনারা শৈল্পিক সৃজনের ব্যাপ্তক্ষেত্রে আত্মদীপ্তির প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। শুরু হয়েছিল কবিতা বিশ্বে নারীর বিকল্প ভুবন গড়ার প্রস্তাবনা পর্ব।

এইভাবে শতক গড়িয়ে যায় শতকের গায়ে। পঞ্চাশ পেরিয়ে ষাট, ষাট পেরিয়ে সত্তর, আশি নব্বই। বাঙালিনির কবিতাভুবনে ছড়িয়ে যেতে থাকে জীবনসংশ্লেষ— প্রতিষ্ঠান বিনির্মিত বলয়ের ওপারে।

ষাটের পর্বে কবিতা-মানচিত্রে যেন এক নতুন রেখা সংযোজন করেন নির্জনতম কবি দেবারতি মিত্র। 'কবিতাসমগ্র'র কথামুখে বললেন, ''অনেকবার বিফলতায় বিসর্জনে ডুবে অনুভব করেছি নদীতে জগদ্ধাত্রী প্রতিমার গয়নার মতো আমার অস্তিত্ব কবিতা হয়ে ভেসে উঠতে চায়। কবিতায় কোনো চৌকো আকৃতির রত্নভর্তি সিন্দুক নয়, দিগন্তের দিকে ঢেউ খেলানো অদৃশ্য বাতাসকেই আমি খুঁজি, যদিও জানি তার দেখা পাওয়া প্রায় অসম্ভব।''

দীর্ঘ বহুশতক ধরে কবিতাভুবনে বহমান বাঙালিনির অভীপ্সা এমনভাবেই মেলে ধরেছেন দেবারতি। তাঁর কবিতায় নারীর একান্ত অন্তর্জগৎ 'গাছের' সহিষ্ণু, নিথর, ছায়াময়

প্রতিমায় প্রোথিত হতে চেয়েছে। কবিতার অবয়ব জুড়ে হাতজড়াজড়ি করে ঘুরে বেড়িয়েছে 'ছায়া', 'সমুদ্র', 'কোমল', 'শান্ত', 'নিরালা', 'সঞ্চার'-এর মতো বেশ কিছু মায়াবী শব্দ। একদিকে দেবারতি বলেন, ''গাছ ভরা বারান্দাটি, গাছের ভিতরে ভেসে আছে, গাছ থেকে বহুদূরে, গাছের আভাসে'', অন্যদিকে তিনিই শিকড়-বিচ্ছিন্ন বৃক্ষে চিহ্নিত করে দেন নারীর আত্মমুক্তির আকাঙ্ক্ষা। তখন 'গাছ' উজান বেয়ে 'নৌকো' হয়ে ওঠে। গাছের ছায়া শরীরে মেখে নিঃস্রোত সেই নৌকোয় বসে কবি নারীর নিজস্ব নির্জনতার বর্ণমালায় নির্মাণ করেন এক অন্যতর মগ্ন-ভুবন।

... যত শুদ্ধ শব্দ ছিল অন্যহত অথবা আহত
বেদনার যূপকাষ্ঠে একান্ত স্বেচ্ছায় নুয়ে পড়ে।
জারুল গাছের স্তব্ধ পা জড়িয়ে ধরে
বুনো-সূর্যমুখী গাছ ছায়া দিয়ে আছে...
এখানে অনেক বাড়ি দিশাহীন মন্দিরের মতো
বাড়ির বিস্তৃত রেখা প্রায় বহুদূর
লোকে লোকান্তরে যেন চলে গেছে
শ্বেতাভ কোমল ছায়া নিয়ে একা সমুদ্রের কাছে।
সেখানে সে নত হয়
ঢেউয়ে ঢেউয়ে কখনো বিচূর্ণ
তার বিহ্বল স্মরণ সুকঠিন পাথরের...
ও চোখ অনেক দেখে গাছের মাথায় জাগরণ
কখনো তন্দ্রায় চকিতে নিঃশেষ হলে আত্মার বিকার
কার অনিমেষ স্তব্ধ চিরআকাঙ্ক্ষার রঙ
অসম্ভব অপরূপ গভীর সঞ্চার
দুচোখ ছাপিয়ে আসে অন্তরে বা একাকী বাইরে
নিরালা গোপন কোনো প্রিয়তম ছবি। ( 'অন্ধস্কুলে ঘন্টা বাজ')

দেবারতির মতোই আত্মমগ্ন চলমানতার কবি গীতা চট্টোপাধ্যায় এঁকেছেন বাঙালির তথাকথিত 'প্রগতি'র উজ্জ্বল আখ্যানমালার আড়ালে লুকিয়ে থাকা 'প্রথাবন্দী অন্ধকার জীবন'— 'ক্বচিৎ ঝরোকা কাঁচে পিতামহী মাতার ঘুলঘুলি'; খুঁড়ে দেখেন 'বৃদ্ধা হয়ে আসে তবু কখনও হলো না জানালা খোলার 'ইতিহাস'। 'কর্তার ঘোড়া দেখে রাসসুন্দরী'র মতো কবিতায় বলেন,

উঠোনে ধানের রাশি খেয়ে যায় মহিমার ঘোড়া
কর্তার ঘোড়ার সামনের কী করে বা যেতে পারে নারী....
আমি যে দেখিনি তাঁকে কখনো রৌদ্রের দুঃসাহসে!

যৌবনে, প্রেম, নিঃসঙ্গতা জড়ানো মেয়েদের একটা গোটা মেয়েবেলা পুড়িয়ে ছাই করে গীতা করতলে খুঁজে নিতে চেয়েছেন সৃজনের নীলকান্ত মণি— চেয়েছেন লোকোত্তর আকাঙ্ক্ষার উজ্জীবন।

সত্তরের দিনবদলের দিনে মেয়েদের কবিতা ক্রমশ প্রখর থেকে প্রখরতর হয়ে উঠেছে। বিশ্বব্যাপী যুব আন্দোলনের আঁচে যখন পরিপার্শ্ব জ্বলেছে, বাঙালিনি তখন প্রতিষ্ঠান বিনির্মিত নির্মোক পুড়িয়ে নির্মাণ করেছে অন্যতর আত্মপ্রতিমা। চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, বিজয়া মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণা বসু, সুতপা সেনগুপ্ত, সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিতা অগ্নিহোত্রী, নমিতা চৌধুরী, অহনা বিশ্বাস, মহুয়া চৌধুরী, মল্লিকা সেনগুপ্ত, মন্দার মুখোপাধ্যায়, জয়া মিত্র, চিত্রা লাহিড়ী, ঈশিতা ভাদুড়ীর দশক-শতকের সব বিভাজন মুছতে মুছতে একান্তভাবে মেয়েদের নিজস্ব বসবাসের জায়গা তৈরি করেছেন কবিতায়— নিজ হাতে, নিজস্ব ভাষায় গড়া এই জগতে ছড়িয়ে পড়েছে বাঙালিনির স্তরান্তর ও স্বরান্তরের নানা চিহ্ন।

বিজয়া মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, ''ভেতরে যাকে লালন করি/সে আসলে অহংকার/ আমার বেড়ালছানা,'' বলেছিলেন,

ভেবেছিলাম বলব, আমাকে ছুঁয়ো না অর্জুন,
ভীম আমাকে অশুচি করে দিয়েছে।
বলতে গিয়ে হঠাৎ দেখলাম
তোমাকে একপাশ থেকে ভীমের মতো দেখায়
অন্যপাশে অর্জুন। ( 'অন্যপাশে অর্জুন')

এই বোধেরই অনিবার্যতায় আমরা দেখি বাঙালিনির কবিতা ধীরে ধীরে পুরুষের বন্দিশালা থেকে বেরিয়ে আসার এক প্রতিবাচন হয়ে উঠেছে। হেলেন সিখো কি একেই বলেছেন 'মেয়েলি লিখন', নাকি, সিমোন দ্য বেভোয়ার ভাষায় এটাই 'নারী হয়ে ওঠা'? আমরা দেখি, বিশ শতকের শেষ, চারদশকের কবিতায় নারী পরিচয়ের দহন ও সর্বনাশ স্পষ্টতই বৌদ্ধিক অভিব্যক্তি পেয়েছে। কৃষ্ণা বসু 'মেয়েমানুষের লাশ'-এর মতো কবিতায় লিখেছেন,

সঁকোর কিনারে এসে আটকে আছে লাশ,
মেয়েমানুষের লাশ;
আটকে আছে, বেরুতে পারছে না।
তার মুখ ফেরানো রয়েছে সন্তানের দিকে,
তার মুখ ফেরানো রয়েছে পুরুষের দিকে,
প্রহারে প্রহারে তাকে পর্যুদস্ত করে গেছে যে পুরুষ
তার মুখ ফেরানো রয়েছে তার দিকে।

'সুপ্রাচীন প্রতারক' এই দেশে কবি দেখতে পান, ''ভারত মায়ের/গলা থেকে ঝোলে মৃত মেয়েদের মুণ্ডমালার শিকল, শত,/শত বছরের নারীমেধযজ্ঞের উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে,

/মাগো, শবাসনা ভারত জননী!"

ঐতিহ্যলালিত প্রেমের নিটোল অবয়ব ভেঙে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন,

তোকে আর কেউ খুঁজে পায় নি রাধিকা; তোর জন্য কষ্ট হয়; তোর
জন্য মায়া হয়; তোর ওপর ক্রোধ হয় খুব কৃষ্ণ ভোলার পর কি
তার রইল মেয়ে? কে তোর রইল বল আর?...
তার যুবতীলোভন রূপ দেখে মুগ্ধ হয় আবিশ্বভারত আজো। বলো বড়ু
চণ্ডীদাস, বলো বিদ্যাপতি, বলো জ্ঞানদাস, শ্রীদাম সুদাম সখা, বলরাম দাস, কেউ
কিছু জানো নাকি তার কথা? রাধিকার কথা? (রাধিকা সংবাদ)

অন্যদিকে নমিতা চৌধুরী তাঁর 'দুর্ভিক্ষের জ্যোৎস্নায়' দেখিয়েছেন একলা রাধিকার আত্মহত্যা।

রূপের আতিশয্য রাধার থাক্ না থাক্
সঙ্গে করে আনে নি সে অন্তত ছোট্ট একটাও
রূপোর পাহাড়
এবং অবশ্যই কৃষ্ণ দুলবে না, একসাথে দুলবে না
ঝুলনে ঝুলবে না।
একা তাই রাধা চলেছে ঝুলন যাত্রায়
শাড়ির একপ্রান্ত বাঁধা আছে কদমের ডালে
অন্যপ্রান্ত গলায় জড়িয়ে রাধা ঝুলছে, রাধা দুলছে।

ঘরে বাইরে বিপণনের জটিল পাশাখেলায় ধ্বস্ত মেয়ের এই মৃত্যু আসলে 'প্রতিবাদ'। এই অবমাননা, এই প্রতিবাদের মাটি থেকেই কবিরা খুঁজে নিয়েছেন তাঁদের অস্মিতার ভাষা। কবিতা হয়ে উঠেছে পুরুষ চিন্তায় অন্তর্ঘাতের সশব্দ আয়োজন। মল্লিকা সেনগুপ্ত ঘোষণা করেন,

ভালোবাসব আদর দেব
যৌনকাতরতা
তোমার দিকে গড়িয়ে দেব
আদিম রূপকথা
মুগ্ধ হয়ে বলবে তুমি
বকমবকম বক
পুরুষ চায় চিরনতুন মুগ্ধতার ছক
আমিও কত হাজার যুগ
মুগ্ধতার শেষে
নতুন প্রতিরোধের দেশে
পৌঁছলাম এসে। ('ভালবাসব')

'ছেলেকে হিস্ট্রি পড়াতে গিয়ে' লক্ষ করেন তিনি,

পুরুষ একাই ছিল ভগবান আর ভগবতী
পুরুষ জননী ছিল পুরুষ জনক
পুরুষ স্বয়ং সুর এবং বাঁশরি
পুরুষ স্বয়ং লিঙ্গ এবং জরায়ু
আমরা হিস্ট্রি থেকে এরকমই জনতে পেরেছি
আসলে হিজড়ে ছিল ইতিহাসবিদ।

অতএব আগুনের খোঁজে হাঁটতে থাকে মেয়েদের কবিতা। 'কথামানবী'দের পথ পার হয়ে 'ফুলনদেবী'র কথায় উঠে আসে অন্ধকার নিপীড়ন-বিশ্বে মানুষীর অমোঘ জেহাদ, যেখানে 'each object is in reality a small virtual Volkano'—

তোমরা আমাকে যারা একে একে ধর্ষণ করেছ
মেয়ে বলে, কালো বলে, নিচু জাত বলে
তোমরা আমাকে যারা একে একে চুম্বন করেছ
কামুক ঠোঁটের চাপে চুষে পিষে ডলে
শেষ যুদ্ধে সকলের সামনে দাঁড়াই।

ইতিহাস, পুরাণের হাত ধরে মল্লিকারা দেখেছেন সীতার অগ্নিপরীক্ষা (চর্তুদশ শতক), নয়না সাহানীর তন্দুরে পুড়ে মারা যাওয়া (১৯৯৬), রূপ কানোয়ারে সতীদাহ (১৯৯৫) এক আবহমান হননের ইতিহাস। এই ইতিহাস তাঁদের সতর্ক ও অভিজ্ঞ করে তুলেছে; প্রতিবাদ প্রতিরোধের ভাষা গেছে বদলে। তসলিমার কবিতা নির্মমভাবে ভেঙেছে প্রতিষ্ঠান নির্মিত আধিপত্যবাদের কাঠামো। একদিকে বলেছে,

পুরুষের খল স্বভাব-চরিত্রের
জালে পড়ে নারী কাতরায় নীল শোকে।
চুমু নয় কোনও। রক্তে তোমার আগে
আছে কি না দেখ এইডসের ভাইরাস। ('রোসো')

অন্যদিকে উচ্চারণ করেছে,

তুমি যদি নারী হয়ে জন্ম নাও...
জীবনভর তোমাকে শাসন করেছে পুরুষ।
এবার তুমি মানুষ হও, মানুষেরা কারও শাসন মানে না—
তারা জন্মের সঙ্গে সঙ্গে অর্জন করে স্বাধীনতা।
( 'পিতা, স্বামী ও পুত্র')

ভাঙতে থাকে মিথ। সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমে নতুন করে লেখা হয় 'ঠাকুমার ঝুলির ভূমিকা'। সেখানে পুরুষতন্ত্র সংজ্ঞায়িত সৎমা-রাক্ষসী-ডাইনির অবয়বব ভেঙে নারী নিজের প্রকৃত 'নিজত্ব'কে খুঁজে বেড়িয়েছেন। বলেছে,

পায়ের পাতায়, বুকে বিঁধে নেব কাঁটা ও পুরুষ
আমরা রাক্ষুসি হব, সৎমা হব, গলে তুলব ডাইনি-গোপনতা।

ভালো-মন্দ, সতী-অসতী, খারাপ মেয়ে-ভালো মেয়ের সব বয়ান এদিন উল্টেপাল্টে গেছে। বাঙালিনি তাঁর স্বনির্মিত বিকল্প-বিশ্বে দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করেছে, যা শিখেছি, সে সব দিল্লাগি পুরোটাই আপনাকে শেখাতে পারি লাজ ও নখরায়/... সে খুন খারাপি রং, ঝকমারি সইতে পারেন কিনা আগেভাগে ভেবে নিন ঠিক। ( 'কুট্টিনী বিলাস')।

এই বিকল্প বিশ্বে স্তন, জরায়ু, রজঃস্রাব, স্বমেহন, অবৈধ সম্পর্ক, ব্যভিচার-এর মতো বিষয়ে কবিতা লিখে মেয়েরা সমাজের বাধ্যতামূলক নীরবতার বিধি ভেঙেছেন। মল্লিকা লিখেছিলেন, 'স্ত্রীলিঙ্গনির্মাণ'-এর মতো কবিতা। সুতপা সেনগুপ্ত স্বচ্ছন্দে লিখেছেন 'পুরুষ-ঘেঁষা মেয়ের কবিতা'—

ও ন্যাকা পুরুষ, শোনো তোমাকেই বলি
ভালোবাসাবাসি কিছু আমরাও বুঝি
চেনাচিনি শান্ত হলে— যুদ্ধ কি নিয়তি?
তাহলে কী চাই আমি, শোনো কী চেয়েছি
প্রত্যেকেরই সঙ্গে কিছু পূর্বরাগ করি

স্বচ্ছন্দে বলেছেন,

শ্যামরায়? যাও, যথেষ্ট হয়েছে, বাড়ি যাও
বউকে নিয়ে লংড্রাইভ, পার্টি শার্টি, বিলিয়ার্ড, হেলথ ক্লাব
যেখানে যা খুশি
যাচ্ছেতাই করো, প্লিজ— হাতজোড়— আর কাছে এসো না
এসো না বললেই স্রেফ চলে যাবে? মাইরি আচ্ছা ছেলে
টিপিকাল মেয়ে নই বলে কখনো কি মুখে না না
মনে মনে হ্যাঁ বলতে পারি না?

সুতপার কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৪-তে, 'ছোকরা-ছোকরা শ্যাম রায়— বাই' লেখা হয়েছে ২০০২-'০৩-এ।

এইভাবে বিশ শতকের শেষ পঞ্চাশ বছর ধরে বাঙালিনি কবিতায় একদিকে অবিরাম অনিঃশেষ প্রশ্ন আর প্রশ্ন তুলে ধরেছে; অন্যদিকে প্রতিবাদে, প্রতিরোধে নিজের হাতে নির্মাণ করেছে নিজেরই প্রতিমা। বহু শতক ধরে নারীর দেহ ও আত্মার নিরন্তর হননের মূল্যে গড়ে ওঠা সভ্যতায় এই মেয়ে বড়ো অপরিচিত। যতটা না নন্দিত তার চেয়ে অনেক বেশি। তবু,

....দৌড়ে যায় মেয়ে,
অবাক দুচোখে দেখে তাবৎ পৃথিবী তাকে,
শূন্যের দিক থেকে সে চলেছে পূর্ণের দিকে ছুটে

ঐ তার দৌড় দেখা যায়...
ও মেয়ে চিনবে না তুমি, ও এখন ঘনিষ্ঠ প্রত্যয়;
প্রভুর না, পিতার না, ও মেয়ে কারোর আজ নয়! (কৃষ্ণা বসু)

বিশের নয় দশকে প্রতিষ্ঠিত এই মেয়েদেরই কারও নাম পৌলমী সেনগুপ্ত, রোশেনারা মিশ্র, মন্দাক্রান্ত সেন, মিতুল দত্ত, শ্বেতা চক্রবর্তী, সেবন্তী ঘোষ, চন্দ্রানী বন্দ্যোপাধ্যায়, বল্লরী সেন, সৌমনা দাশগুপ্ত; কেউ বা রাজশ্রী চক্রবর্তী, পাপড়ি ভট্টাচার্য, সুমনা সান্যাল, সুস্মেলী দত্ত, তমালিকা পণ্ডাশেঠ, সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তিলোত্তমা মজুমদার প্রমুখ। বিশ্বে বাজারি অর্থনীতির প্রভাবে মানবিক সম্পর্কে এসেছে পালাবদল, পণ্য এ সমাজে অধিদেবতা। যা কিছু ব্যক্তিগত সবই নিয়ন আলোয় পণ্য হয়ে যাওয়ার যন্ত্রণা জড়িয়ে ধরেছে মেয়ের স্পর্শকাতর মনকে। তাই যশোধরা রায়চৌধুরী নব্বইয়ের মাঝামাঝি লেখেন 'পণ্যসংহিতা'। প্রবল পণ্যায়নের জোয়ারে নারী অস্তিত্বের নিরবলম্ব অবস্থান উঠে আসে কবিতায়। লেখা হয় 'প্রচ্ছদ কাহিনী' নামে কবিতা। সেখানে দুটি ছোট তাৎপর্যপূর্ণ নির্দেশিকা দেন কবি, 'গ্রীষ্মে কি করে সুন্দরী থাকবেন' এবং 'রাতের রূপচর্চা'। নিজেকে, নিজের চারপাশকে যেন সতর্ক করতে করতে পথ হাঁটে, ভুল পথে ঠিক পথ খুঁজতে চায় মেয়ে। বলে,

যশোধরা, তুই কিন্তু ক্রমশই ঢুকে যাচ্ছিস অন্ধকারের গর্তে
অবলম্বনহীন, লাট খেয়ে গড়িয়ে যাচ্ছিস মহার্ঘ দোকানের মধ্যে
ঠাণ্ডা দরজা ঠেলে ঢুকছিস, কাচের লণ্ঠন ভেঙে ঢুকছিস
ক্রিস্টালের গেলাস, ফুলদানি, হক কথা, মেরাওয়ালা ইয়েলো...

এই অন্ধকারে 'রূপের টেবিল, রূপের ফাইলপত্র, লাল দড়ি, ফাঁস'— সেখান থেকে পালানো কঠিন। অতএব যশোধরা কবিতায় 'বিশেষত্বক সংখ্যা' রচনা করেন। শহরে রূপকথার জীবনে, কেরিয়ারের সোপানমালা টপকে, যেতে যেতে উচ্চাকাঙ্ক্ষী মেয়ে দেখতে পায়, ''পাড়ার সমস্ত জানলা খুলে যায়।/মাসিমা জীবন, বৌদিজীবন, কাকিজীবন, সমস্ত রান্নাঘর/ সরষের তেলের মধ্যে তুমুল ডিমের শব্দ, তুমুল গন্ধের মত করে।" এ জগতে মেয়ের মাথার উপরে উড়ন্ত আকাশ; ছুটন্ত পায়ের তলায় খসে যায় মাটি, বেড়ির সব দাগ মুছতে মুছতে অন্তঃসারশূন্য চারপাশে সে খুঁজে বেড়ায় এক আঁজলা জল; 'পিশাচিনী' কাব্যে যশোধরা তুলে ধরেন সেই তৃষ্ণা,

অসংখ্য হৃদয় কষ্ট। নুনকাটা আবেগ, ধ্বংস হওয়া
এত যে খাবার দিচ্ছো, খাওয়ার সময়ই নেই...
ডানদিকে তাকাচ্ছি, কই, জল, পরিষ্কার?...

সম্পর্কের নানা জটিল বিন্যাস, স্বাবলম্বন, স্বাশ্রয়, স্বপ্ন-দুঃস্বপ্ন, জেদ, কান্না, শূন্য ও পূর্ণের নানা কাটাকুটি খেলার দাবাছকে দাঁড়িয়ে পৌলমী সেনগুপ্তরা বলেন,

যখন দরকার, তখন তুমি নেই
বলছ ছেড়ে গেলে সঙ্গে থাকবেই—
সত্যি ছেড়ে যাব? উড়ব ডানা মেলে?

কথার কথা সবই! প্রমাণে গোলমেলে...
পাব কি ফিরে সেই হারানো বিশ্বাস? ( 'এস এম এস')

চন্দ্রাণী বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যে ঘটান ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার— 'আমরা বঙ্গের নারী/ঘরকে দুয়ার করি/হুহু শব্দ ধরাই উনান/হাঁড়িতে উথলায় শুধু জল'।

আর মন্দাক্রান্ত সেনের কবিতায় উঠে আসে মেয়েদের নির্জন সময় যাপনের নিভৃত অবসন্নতা

সে নিছক জল আর জল
কতকাল ভালো লাগে এমন অতল
হঠাৎ নতুন করে একা একা বোধ হলো আজ
আঁকলাম কাঠের জাহাজ।...

চারদিকে জল শুধু জল
দিগ্‌ভ্রান্ত হচ্ছেই কেবল,
আকাশেও অন্ধকার, তারাদের দোকানপসার
জমেনি তেমন করে, মেঘের ছাউনিমাত্র সার।
কাঠের জাহাজ ডুবে যাবে
ডুবোজাহাজের স্মৃতি তোমাকে কাঁদাবে?
অন্ধকারে হয়ে ছিল পর
কালকে তুমিও হবে পরিত্যক্ত ভাঙা বাতিঘর। ('নির্জন')

এই মেয়েই লিখেছে 'একটি অসম পরকীয়া'র কবিতা, বলেছে,

জিনস্ পরা ছেড়ে দিতে পারি
তুমি যদি বলো; অন্য নারী
হয়ে যাব অতি অনায়াসে।...
আমার সমস্ত পুরুষালি
মুদ্রাদোষ ওড়াব হাওয়ায়।
জিনস্ পরা ছেলে দেওয়া যায়
সহজেই, নদী হতে পেলে...
সাঁতার জানো তো তুমি, ছেলে? ( 'তুমি কি সাঁতার জানো')

নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করেছে,

আজ ভিতরে বাহিরে বৃষ্টি
তবু চেয়ে দ্যাখো, কত কষ্টে
আমি জোগাড় করেছি শুকনো জ্বালানি শেষটায়
—আগুন দেবে না শরীরে শরীর ঘষটে?
( 'ভিতরে বাহিরে')

বিশ শতকের শেষ পঞ্চাশ বছর। কবিতাভুবনে বাঙালিনির এই অভিযাত্রা নিশ্চিতভাবে এক বহমান অভিজ্ঞতার পরিণাম। সেখানে সব মেয়েরাই 'কথামানবী'। মল্লিকা সেনগুপ্তের ভাষায় সে বলে দেয়,

''হ্যাঁ, আমি কথামানবী। ঋগ্বেদ থেকে একুশ শতক পর্যন্ত আমার বিচরণকাল। ইতিহাসের ছাই এবং ভস্মের মধ্যে নারী নামক যে আগুন চাপা পড়ে আছে, আমি তারই ভাষ্যকার, আমি আগুনের আত্মকথন। আমি কান্না পড়ি, আগুন লিখি, নিগ্রহ দেখি, অঙ্গার খাই, লাঞ্ছিত হই, আগুন লিখি। এ আগুন বেদনার, প্রতিবাদের, আত্মমর্যাদার, ভালোবাসারও।...আগুনের কথাকারকে মানুষ সহজে মনে নিতে পারে না। আমাকেও পারে না।...''

এইসব কথামানবীরাই 'দ্রৌপদী জন্ম', 'গঙ্গাজন্ম', 'রিজিয়াজন্ম', 'মেঘজন্ম', 'শাহবানুজন্ম', 'খনাজন্ম' পার হয়ে নতুন নামে, নতুন পরিচয়ে ইতিহাস রচনা করতে থাকে— যার শেষ পর্যন্ত কোনো দশক বা শতক বিভাজন হয় না। কেননা, নারীর যুগযুগান্তের অপমান ছেনে জ্বলে ওঠা এই কবিতাভুবনে মেয়েরা সকলেই একা ও একক। আগুন আর অশ্রুর সংবেদী সমীকরণে সে রচনা করে চলেছে সহস্রের ইতিবৃত্ত; ''যার শুরু আছে কিন্তু শেষ কোথায় সে নিজেও জানে না''।


**এবং প্রান্তিকের বই-**

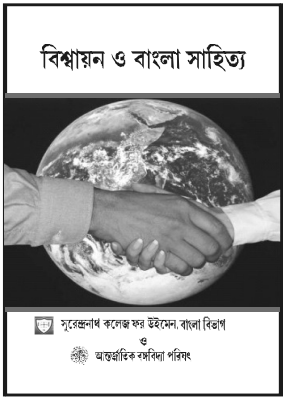


**বিশ্বায়ন ও বাংলা সাহিত্য**

**সম্পাদক**

সনৎকুমার নস্কর

**মূল্য : ১৮০ টাকা**

বিশ্বায়ন ব্যাপারটা কী তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। কেননা বিশ্বায়ন হল সেই ধরনের এক আর্থ-সামাজিক - রাজনৈতিক - সাংস্কৃতিক অবস্থা, যার তুলনা চলতে পারে কেবল লতাজটিল বৃহদরণ্যের সঙ্গে। বিশ্বায়ন বর্ণচোরা সরীসৃপের মতো, ক্ষণে ক্ষণে রঙ পালটায়, ধরাই যায় না তার আসল স্বরূপটা কী। একই সঙ্গে, এর শুরুর ইতিহাসটাও অজানা। কেউ কেউ বলেন এর জন্ম হয়েছে দু'-আড়াই দশক আগে, আবার কারুর মতে বিশ্বায়নের আবির্ভাব ঘটেছে প্রাগৈতিহাসিক কালেই। বিশ্বায়নকে কেউ ভেবেছে আশীর্বাদ, আবার অনেকে তাদের জীবনে একে অভিশাপ হিসেবেও বিবেচনা করেছে। বিশ্বায়নের মতো বিতর্কিত বিষয় বোধহয় এই মুহূর্তে আর একটাও নেই। বিশ্বায়ন আজ তাই আমাদের, বর্তমান বিশ্বের বাসিন্দাদের, বিশেষ আগ্রহের বস্তু।

# পুনর্নির্মাণে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

**ড. সনৎকুমার নস্কর***

বিষয়-উৎসের প্রকৃতি-ভেদে সাহিত্যিক সৃষ্টি মূলত দ্বিবিধ মৌলিক সৃষ্টি ও অনুসৃজন। বিশ্বের তাবৎ সাহিত্যকে উৎসের ভিত্তিতে বিভাজন করলে দেখা যাবে যে, মৌলিক সৃষ্টির পাশাপাশি সাহিত্যিক অনুসৃজনের পরিমাণ নেহাত কম নয়। অনেক সেরা রচনারই উৎস ঋণ থেকে পাওয়া। কাহিনি নির্মাণে মৌলিকতার স্থান বিশিষ্ট হলেও অনুসৃষ্টি মাত্রেই অক্ষমতার স্বাক্ষর বহন করে না। অবশ্য দেখা দরকার, সেই অনুসৃজনে স্রষ্টা পুরোনো ভাবনার মধ্যে কতখানি নতুন চিন্তাকে সঞ্চারিত করে দিতে সক্ষম হচ্ছেন।

'অনুসৃজন' শব্দটির পূর্বপদটি রচনাকর্মের উৎস-প্রকৃতি নির্দেশক। আসলে এ সমাসবদ্ধ শব্দটির উত্তরপদই গুরুত্বে প্রধান। বলা বোধহয় অনাবশ্যক যে, নির্ভেজাল অনুকারী রচনা কোনো দেশে কোনো কালে প্রকৃত সৃষ্টির গৌরব বহন করে না। 'অনুকরণ' আর্টের স্বধর্ম হতে পারে বটে, কিন্তু নিছক অনুকরণে সাহিত্যের প্রাণ বাঁচে না। স্রষ্টার বাহাদুরি সেখানেই যেখানে তা উৎসকে অতিক্রম করে যায়।

কোনো বিশেষ রচনা কিংবা কাহিনির অনুসৃজন নিয়ে গভীরে প্রবেশ করার আগে প্রাথমিক একটি প্রশ্ন ওঠে : মৌলিক সৃষ্টিরই যেখানে প্রধান গৌরব, সেখানে অনুসৃজন বা পুনঃসৃষ্টির প্রয়োজন কোন্‌খানে? প্রশ্নটির একাধিক উত্তর হতে পারে। তবে সবচেয়ে সহজ যুক্তির জবাব হল, মূল সৃষ্টির মধ্যে যদি অসংখ্য অর্থ-সম্ভাবনা কিংবা চিন্তার অবকাশ থেকে থাকে তখন সেই নিহিত তাৎপর্য বা অব্যক্ত ব্যঞ্জনাকে লক্ষ্য করে নতুন কোনো নির্মাণের দিকে এগিয়ে যান উত্তরকালের স্রষ্টারা। কাহিনি, চরিত্র, ভাবাদর্শ কিংবা অন্য কিছু হতে পারে তাঁদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। বিশেষত পুরোনো প্রাচীন গাথা-গল্প-কাহিনি-কিংবদন্তিতে এমন অনেক প্রসঙ্গ রয়ে গেছে যাদের ভিন্নতর অর্থ-ব্যঞ্জনা আধুনিক মননশীলতায় ঋদ্ধ স্রষ্টা-মানুষের পক্ষে দেওয়া সম্ভব। এভাবেই গড়ে ওঠে পুরোনো আখ্যানের ভিন্ন পাঠ।

গাণিতিক পরিসংখ্যানে, দেখা যাচ্ছে, নানান দেশের নানান ভাষার সাহিত্যিকরা অনুসৃজনের ক্ষেত্রে উৎস হিসেবে বেশির ভাগ সময়ে ব্যবহার করেছেন প্রাচীন পুরাণ গুলিকে। কেননা পুরাণ হল পুরাকথার এক সমৃদ্ধ ভাণ্ডার। ফেলে-আসা সময়ের জীবন, তার রূপ-রস, মূল্যবোধ, চরিত্রাদর্শ পুরাণের মধ্যে যতটা মেলে তেমন আর কোথাও মেলে না। পশ্চিমে এই পুরাণই কথিত হয় 'মিথ' নামে — যদিও সূক্ষ্ম তাৎপর্যে এ দুইয়ের মধ্যে কিছু বৈসাদৃশ্য আছে। এখন, এই প্রাচীন মিথ বা পুরাণকে ভাঙা এবং তাকে আবার নতুন বিশ্বাসে গড়া — এ নিয়ে বিনির্মাণ-নির্মাণের আলাদা তত্ত্ব আছে। এ বিষয়ে একালের অন্যতম মিথতাত্ত্বিক রঁলা বার্ত তাঁর 'Mythologies' গ্রন্থে লিখেছেন : 'In myth we find again the tri-dimentional pattern ... the signifier, the signified and the sign.'

*অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

তাঁর মতে, Signifier হল ফর্ম, signified হল মিনিং এবং sign হল সিগনিফিকেশন। প্রতিটি পুরাকাহিনির মূলে থাকে কোনো-না কোনো অন্তর্লীন প্রেক্ষিত (Context), যা মূল গল্পটি (text) গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এই স্তরটির সঙ্গে সকলের প্রত্যক্ষ পরিচয়। একালের একজন স্রষ্টাও ঐতিহ্যের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার থেকে নানাসূত্রে গল্পটিকে প্রাথমিকভাবে জানেন। পরে পুনঃসৃষ্টির প্রাক্কালে জানা কাহিনিগুলি নতুন অভিঘাত জাগিয়ে তোলে তাঁর মনে। তিনি তখন পুরোনো বিষয়কে রূপ দেন তাঁর নিজস্ব ভাবনার রঙে রাঙিয়ে। এটাই হল মিথের বহির্বিন্যাস (texture)। লেখকের ব্যক্তিত্বভেদে ভাবনার বর্ণও স্বভাবতই ভিন্নতা পরিগ্রহ করে। ফলে এক গল্প একাধিক জনের হাতে আলাদা আলাদা ব্যঞ্জনার ধারক হয়ে ওঠে। এইজন্য মহাভারতের একটি বিশেষ প্রসঙ্গকে ঘিরে রবীন্দ্রনাথ 'কর্ণকুন্তী সংবাদ', বুদ্ধদেব বসু 'প্রথম পার্থ' এবং সমরেশ বসু 'পৃথা' লিখলেও তাই তাঁদের রসাবেদনে পার্থক্য থেকে যায়।

বর্তমান আলোচনার অভিনিবেশ যেহেতু শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নিয়ে, তাই মূল আলোচনায় প্রবেশের আগে ওই রচনাটি সম্পর্কে দু'চার কথা বলা প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লেখক বড়ু চণ্ডীদাস আবির্ভূত হয়েছিলেন পঞ্চদশ শতকের সূচনাভাগে, যখন এদেশে তুর্কিবিজয় সম্পন্ন হয়েছে। হিন্দু ধর্ম ও সমাজ তখন বিপর্যস্ত। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হননি, কিন্তু জয়দেবের কাব্যরচনার মাধ্যমে কৃষ্ণকেন্দ্রিক সংস্কৃতির বিস্তার ঘটেছে। কৃষ্ণ দীর্ঘদিন ধরেই পুরাণ-পুরুষ হিসেবে বন্দিত ও দেবতারূপে অর্চিত। কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাস কৃষ্ণের এমন এক রক্তমাংসময় শরীরী উপস্থাপনা এখানে ঘটালেন, যা তাঁর ঐশী মহিমাকে চূর্ণ করেছে। এ কাব্যের অবলম্বন যদিও ভাগবতীয় কৃষ্ণ কিন্তু কবি কোথাও সেই পুরাণ-প্রতিমাকে উপস্থাপিত করেননি। তাই ভক্তিরস নয়, তাঁর রচনায় প্রধান হয়ে উঠেছে জীবনরস। কৃষ্ণের চরিত্ররূপায়ণে বড়ু চণ্ডীদাস প্রাচীন উৎসের তুলনায় স্বকপোল কল্পনার সাহায্য নিয়েছেন বেশি। পঞ্চদশ শতকের এই কবি তাঁর কৃষ্ণকে স্থাপন করেছেন সমকালীন বঙ্গদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে। এই কৃষ্ণ যেন গোপসমাজেরই একজন। ইনি 'নান্দের নন্দন', মাথায় ঘোড়াচুল-ওয়ালা এক 'গরু রাখোয়াল', স্বভাবে কামলোলুপ ও কৌশলী। ভোগাকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হলে এই কৃষ্ণ প্রণয়িনীকে হীন অপমান করতে পিছপা হন না, প্রয়োজনে হননেচ্ছাও প্রকাশ করেন। এ কৃষ্ণ কখনই বৈষ্ণবকুলের আরাধ্য দেবতা হতে পারেন না। পুরাণ-পুরুষ কৃষ্ণের খোলসে কবি আসলে ঢেকে রেখেছেন নারীদেহ-লোলুপ এক কামী গ্রাম্য যুবককে, যে ছলনা প্রতারণা বলপ্রয়োগে দেহমিলনে অনিচ্ছুক এক বিবাহিত নারীর সঙ্গে অবৈধ দেহসম্বন্ধ গড়ে তুলে একসময় 'গততৃষ্ণ' হয়ে নির্দ্বিধায় পরিত্যাগ করে চলে যায়। অর্বাচীন পুরাণ-বর্ণিত রাধাও যেন এ কাব্যে পনেরো শতকের নারীতে পরিণত হয়েছে, যার মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তন ঘটেছে স্বামী-সংস্কারে আবদ্ধা কুলবধূ থেকে পরপুরুষের প্রেমাভিলাষিণী স্বাধীনভর্তৃকা প্রেমিকাতে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের এই কাহিনি বাঙালি পাঠককে নানাভাবেই তৃপ্তি দিয়ে এসেছে। বিশ শতকের গোড়ায় এই গ্রন্থের একটিমাত্র পুথির (তাও খণ্ডিত) আবিষ্কার বিভিন্ন দিক থেকে কৌতূহল জাগ্রত করেছে। আধুনিক কালের কথাসাহিত্যিকরা এর কাহিনি ভেঙে গড়ে তুলেছেন বিচিত্র স্বাদের উপন্যাস। কৃষ্ণকাহিনির প্রধান আশ্রয় ভাগবত পুরাণ এবং রাধাকৃষ্ণের প্রণয়কথার এক সমৃদ্ধ ভাণ্ডার বাংলা ও ব্রজবুলিতে লেখা বৈষ্ণব পদাবলি।

স্বভাবতই এই পুরাণ ও পদাবলি হয়েছে কৃষ্ণকেন্দ্রিক আধুনিক উপন্যাস লেখকদের অন্যতম অবলম্বন। কোথাও কাহিনি, কোথাও চরিত্র, কোথাও বিশেষ ভাব বা পদপঙ্‌ক্তি উঠে এসেছে উপন্যাসগুলির গঠন-কাঠামোয়। আজ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুথি প্রকাশের শতবর্ষে দাঁড়িয়ে এই গ্রন্থের অনুসৃজনের ইতিবৃত্তে চোখ রাখাটা এই কারণে আবশ্যিক যে, এমন একটি রসালো উপখ্যান কীভাবে তার অজস্র সম্ভাবনা নিয়ে বাঙালি লেখকদের সৃষ্টিলোকে ধরা দিয়েছে।

সম্প্রতি প্রয়াত ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের একজন শক্তিশালী ও জনপ্রিয় কথাশিল্পী। নানা স্বাদের উপন্যাস রচনায় তিনি ছিলেন দক্ষ। কৃষ্ণকেন্দ্রিক বিভিন্ন পুরাণ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, জয়দেবের গীতগোবিন্দ ও বৈষ্ণব মহাজনদের পদসমূহকে ভিত্তি করে ১৯৭৬ সালে প্রকাশ করেছিলেন তাঁর অসামান্য উপন্যাস 'রাধাকৃষ্ণ'। মোট এগারোটি পরিচ্ছেদে কৃষ্ণের দীর্ঘব্যাপ্ত জীবনের বিশেষ একটি সময়পর্বকে ধরার চেষ্টা করেছেন ঔপন্যাসিক। এই কালপর্বটিকে চিহ্নিত করা যায় কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা হিসেবে। ভাগবত মতে, কৃষ্ণ আদতে পালনকর্তা বিষ্ণু, যিনি ভূভার হরণের জন্য দ্বাপরে আবির্ভূত হয়েছিলেন কংসের কারাগারে। কংস হলেন ভোজ বংশের রাজা উগ্রসেনের পুত্র — যিনি ক্ষমতালিপ্সু ও অত্যাচারী। পিতাকে বন্দি করে কংস মথুরার রাজসিংহাসন দখল করেন। এরপর ভগিনী দৈবকীর সঙ্গে বিয়ে দেন বৃষ্ণিবংশীয় বসুদেবের। কৃষ্ণ এই বসুদেবের পুত্র। বিবাহের পর দৈবকী ও বসুদেবকে নিজের রথে আনবার সময় যে ভয়ংকর দৈববাণী হয়, তার দ্বারা ভীত হয়ে কংস ভগিনী ও ভগিনীপতিকে কারারুদ্ধ করেন ও দৈবকীর সন্তানদেরকে একে একে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন। কিন্তু নিয়তি কেন বাধ্যতে। দৈবকীর অষ্টম সন্তান রূপে জন্ম নিল কৃষ্ণ এবং দৈবানুকূল্যে বসুদেব তাকে রেখে এলেন নন্দগোপের ঘরে। কংসেরও তা অজানা রইল না, কিন্তু তিনি শুধু জানতে পারেননি তাঁর ভবিষ্যৎ হন্তারকটি কে। তাই কংস গোকুলে বারবার অভিযানে পাঠিয়েছেন তাঁর দুর্ধর্ষ অনুচরদের, সৈন্য পাঠিয়েছেন গোপেদের ঘর থেকে সদ্যোজাতদের নিষ্ঠুরভাবে ছিনিয়ে আনতে। সুনীল তাঁর উপন্যাস শুরু করেছেন ঠিক এই জায়গা থেকেই।

'রাধাকৃষ্ণ' উপন্যাসের পরিচ্ছেদভিত্তিক ঘটনাধারার ওপর এবার দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। প্রথম পরিচ্ছেদেই রয়েছে কংস-প্রেরিত সৈন্যদের অশ্বের ক্ষুরধ্বনিতে মা যশোমতীর হঠাৎ জেগে ওঠা, স্বামী নন্দকে সচকিত করা এবং কৃষ্ণকে নিয়ে অন্যত্র পালিয়ে যেতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করা। নন্দ হতচকিত, দ্বিধাগ্রস্ত। সমূহ বিপদ বুঝে মুহূর্তে প্রস্তুত হয়ে নেন তিনি। শিশু কৃষ্ণকে নিয়ে প্রায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যেদিকে পারেন ছুটে পালান। ছুটতে ছুটতে এক গভীর অরণ্যে পৌঁছান। একটু স্বস্তি আসে তাঁর। ফেরার পথে শুরু হয় ঝড়বৃষ্টি। কৃষ্ণকে বৃষ্টির ছাঁট থেকে বাঁচিয়ে পথ চলতে থাকেন। ফেরার সময় পথে দেখা হয় রাধার সঙ্গে। রাধা ব্রজধামের রাজা বৃষভানুর কন্যা। তার জননী ভলন্দরের রাজকন্যা কলাবতী। ছোট্ট কৃষ্ণকে দেখে মুগ্ধ হয় রাধা। নন্দের কাছ থেকে কৃষ্ণকে নিজের কোলে নিতে চায়। নন্দ কৃষ্ণকে দেন। তখন রাধা কৃষ্ণের মুখ নিরীক্ষণ করে প্রবল অনুরাগে চুম্বন করে। শিশু কৃষ্ণের হাতে ধরা শিখিপাখা মুকুটের মতো বাঁকিয়ে পরিয়ে দেয়। নন্দর ভালো লেগে যায় এই বনটি। তিনি পরে এখানেই বাসস্থান গড়ে তুলবেন ঠিক করেন। রাধার কাছে জানতে

পারেন এ বনের নাম বৃন্দাবন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দেখা যায়, নন্দ এসেছেন রাজা বৃষভানুর কাছে। বৃষভানু তাঁর পূর্ব পরিচিত বন্ধুসদৃশ। তাঁর আগমনের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। বৃষভানু-নন্দিনী রাধার সম্বন্ধ করতে এসেছেন তিনি গোকুলের আয়ানের সঙ্গে, যে সম্পর্কে তাঁর শ্যালকও বটে। নন্দ একদা বৃষভানু ও কলাবতীর বিয়েতেও ঘটকালি করেছিলেন। কিন্তু পাত্রের কথা শুনে বৃষভানু গম্ভীর হয়ে যান, কলাবতী মুখ ফিরিয়ে নেন। নন্দ বাড়িতে এসে এই সম্বন্ধের কথা জানান স্ত্রী যশোমতীকে। আয়ানও খবরটা জানতে পারে। কালীসাধক আয়ান ভগিনীপতির প্রতি রুষ্ট হয়। কিন্তু নন্দ তাঁর রাজনৈতিক কূটকৌশলে আয়ানকে রাজি করান। বলেন : 'রাজা কংসের বিষনজর আছে আমাদের ওপরে। এখন আবার রাজা বৃষভানুকেও চটানো ঠিক হবে না। বরং ব্রজের রাজার সঙ্গে আমাদের একটা কুটুম্বিতা হলে রাজা কংসও আর আমাদের ওপর অত্যাচার করতে চাইবে না সহসা। এসব দিকও তো ভাবতে হয়, গোষ্ঠীস্বার্থের জন্য তুমি যদি...'। সুতরাং আয়ান আর বিবাহে না করতে পারে না।

বৈষ্ণব পদাবলির গোষ্ঠলীলার পদ নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে এ উপন্যাসের তৃতীয় পরিচ্ছেদ। ঔপন্যাসিক পুরাণের সঙ্গেও সামান্য সংযোগ রেখেছেন এখানে। বসুদেবের অন্য পত্নী রোহিণী। তাঁর গর্ভের সন্তান বলরাম। সেই বলরামকে নিয়ে রোহিণী একদিন এলেন নন্দের বাড়িতে। দ্বাদশ বর্ষীয় কানাইয়ের সঙ্গে বলাইয়ের হৃদ্য সম্পর্ক গড়ে উঠল। ঔপন্যাসিক বলাইকে সামান্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তুলেছেন। সে ধীরস্থির, বলশালী ও তোত্‌লা। রোহিণী কৃষ্ণজন্ম রহস্যের কথা যশোমতীকে বলতে গিয়েও বলেন না। রাখাল বালকদের ক্রীড়া-কৌতুকে বাকি অংশ পরিপূর্ণ। সবাই মিলে কৃষ্ণকে রাজা বানায়। কৃষ্ণও তার সক্রিয়তায়, নৈপুণ্যে সকলের মধ্যমণি হয়ে ওঠে। সে সবার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু, তাকে তুষ্ট করতে সবাই উদগ্রীব।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কৃষ্ণজীবনের অনেক কাহিনি বর্জন করেছেন, যেগুলি মূলত অলৌকিকতা সম্পৃক্ত। যেমন পূতনাবধ, শকটভঙ্গ, যমলার্জুন ভঙ্গ, গোবর্ধন ধারণ ইত্যাদি। কিন্তু কৃষ্ণের নেতৃত্বে ইন্দ্রপূজা পণ্ড হওয়ার ঘটনা বিবৃত করেছেন চতুর্থ পরিচ্ছেদে। কারণ এটি কেবল তাঁর বালচাপল্যের দৃষ্টান্ত নয়, এর মধ্য দিয়ে যুক্তিবাদী কৃষ্ণকে উপস্থাপন করাই ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য। নন্দের সঙ্গে কৃষ্ণের কথোপকথন তারই নির্দশন বহন করছে। গোপেরা সুবৃষ্টির জন্য প্রতিবৎসর ইন্দ্রপূজার আয়োজন করলেও কৃষ্ণ ও তার সাথীরা এবার তা পণ্ড করে দিল। এতে রুষ্ট হল আয়ান। সবাই বিপদের আশঙ্কা করতে লাগল। কিন্তু প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে কয়েকদিন পরেই বর্ষণ শুরু হল। এই পরিচ্ছেদেই রয়েছে কালীয়দমনের ঘটনা, যা ভাগবত-বর্ণিত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও প্রসঙ্গটি আছে। তবে তিনটি রচনায় পৃথক তিনটি কারণ প্রদর্শিত হয়েছে। ভাগবতে আছে যে, কালীয়নাগের বিষে কালীদহের জল বিষাক্ত হয়ে গেলে বৃন্দাবনে তা অব্যবহার্য হয়ে পড়ে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে, কালীদহের জলে রাধা সহ অন্যান্য গোপিনীদের সঙ্গে জলকেলি করার জন্য কৃষ্ণ নাগকে হত্যা করে জল বিষমুক্ত করতে চেয়েছিল। কিন্তু 'রাধাকৃষ্ণ' উপন্যাসে সুনীল কালীয়দমনের অন্য কারণ জানিয়েছেন। সেটি হল, সুবলের প্রিয় ধেনু শ্যামলী চরতে চরতে দহের কাছাকাছি গিয়ে পড়লে কালীয়নাগ তাকে গ্রাস করে। কৃষ্ণ তখন প্রতিশোধ

নিতে দহের জলে ঝাঁপ দেয় এবং এক প্রাণান্তকর যুদ্ধের পর কালীয়কে পরাস্ত করে দহ ছেড়ে উঠে আসে। আর জল থেকে উঠেই সে দেখতে পায় অসামান্যা সুন্দর যৌবনবতী রাধাকে। তার দিকে চেয়ে থাকে নির্নিমেষ। তার রূপ দেখে পাগল হয় কৃষ্ণ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ থেকে নবম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত কাহিনি পুরোটাই প্রেমমূলক। রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের প্রণয় কীভাবে ধীরে ধীরে বর্ধিত হয়েছে, সুনীল যেন তাঁর আনুপুঙ্খিক বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এখানে। এই প্রেমলীলায় সখীদের ভূমিকার কথা গীতগোবিন্দ ও পদাবলির সূত্রে আমরা জানি। কিন্তু সুনীল দেখিয়েছেন একজন কৃষ্ণসখাও এর সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। সে সুবল। পঞ্চম পরিচ্ছেদের কাহিনিতে উদাসীন কৃষ্ণকে দেখতে পাবে পাঠক, যে ধেনুচারণ ও সখাসঙ্গ থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছে নিভৃতে। তার সন্ধানী সতৃষ্ণ দৃষ্টি কেবল এখন রাধাকেই অনুসরণ করে। পথে-ঘাটে দেখা হয় রাধার সঙ্গে, কিন্তু রাধা তার দিকে ফিরেও তাকায় না। এই অবজ্ঞায়, অবহেলায় বুক ভেঙে যায় কৃষ্ণের। কখনো কখনো আত্মহননের ইচ্ছা জাগে। কৃষ্ণের এই বিমনা ভাব সুবলকে ভাবায়। অনেক কষ্টে সুবল জানতে পারে রাধার প্রতি কৃষ্ণের চিত্তদৌর্বল্যের কথা। রাধাকে পেতে সে সুবলের সাহায্যার্থী হয়। দই-দুধ বেচতে যাওয়া গোপিনীদের তারা পিছন থেকে অনুসরণ করে। রাধার সখীরা এতে রুষ্ট হয়। এ ঘটনায় গোঁয়ারের মতো কৃষ্ণ কখনো কখনো মাথা গরম করে ফেলে। সুবল কৃষ্ণকে পরিস্থিতি বোঝানোর চেষ্টা করে। বলে, রমণীর মন কোমল নয়, কঠিন বস্তু।

ঔপন্যাসিক ষষ্ঠ পরিচ্ছেদটি গড়ে তুলেছেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের কাহিনির আদলে। রাধাকে নিজ করতলগত করার জন্য কৃষ্ণ দানীর ছদ্মবেশ নেয়। যমুনার নদীঘাটের মুখে হৃষীকেশ নাম ধরে বসে থাকে। ঔপন্যাসিক তার মুখে হিন্দি ভাষার সামান্য প্রয়োগ ঘটিয়েছেন ছদ্মবেশটি নিখুঁত ও বাস্তবসম্মত করার উদ্দেশ্যে। পসারিণী গোপিনীদের সঙ্গে শুরু হয় তার বচসা। তারা পেরিয়ে যায়। শেষে রাধার কাছে কৃষ্ণ মালপত্র পার করানোর শুল্ক দাবি করে। এই কর রাধার ভুবনভোলানো রূপ। রাধা দাবি শুনেই বুঝতে পারে সেটা অন্যায্য অসঙ্গত। তাই সে ঝগড়াতে প্রবৃত্ত হয়। এখানে লক্ষণীয় যে, রাধা সম্পর্কে কৃষ্ণের মাতুলানী হলেও এ প্রসঙ্গে তার কোনো উল্লেখ নেই, কিংবা রাধা বিতণ্ডায় সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করেনি— যা প্রায়শই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দেখা গেছে। কৃষ্ণ কিন্তু নাছোড়বান্দা। সে তার দানের দাবিতে অটল থাকে। তখন ক্রুদ্ধ রাধা দইদুধের ভাঁড় উল্টে দিয়ে রুষ্ট হয়ে চলে যায়। কৃষ্ণ আপাতত হতাশ হলেও হাল ছাড়ে না। এই পরিচ্ছেদেই ঔপন্যাসিক মাঝি কৃষ্ণকে হাজির করেছেন, যে যমুনার বুকে একটি ছোটো জরাজীর্ণ নৌকা নিয়ে গোপনারীদের প্রতীক্ষায় বসে থাকে। গোপিনীরা ঘাটে এলে নদী পারাপার নিয়ে দরকষাকষি ও তর্ক চলে। অবশেষে কৌশল করে কৃষ্ণ কেবল রাধাকে নৌকায় তুলে যমুনার মাঝে নিয়ে আসে। এরপর চলে দুইয়ের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক। এ প্রসঙ্গে কৃষ্ণের উক্তিগুলিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে, তার মধ্যে দেহবাদিতা প্রবল। সে নানাভাবে রাধাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে তার রূপই তাকে পাগল করেছে, সুতরাং শরীর না পেলে তার চিত্তদাহ নির্বাপিত হবে না। রাধার মধ্যে কাজ করেছে সতীত্বের সংস্কার। সে প্রথমে আত্মসমর্পণ করতে রাজি হয়নি। কৃষ্ণ তখন কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে। নৌকো ভারবহুল হচ্ছে বলে সঙ্গের সমস্ত জিনিসপত্র ফেলে দিতে বাধ্য করেছে। পরে রাধা তার পরিহিত অলঙ্কারও বিসর্জন দিয়েছে। সবশেষে

কৃষ্ণ নৌকোটিকে প্রবলভাবে দুলিয়ে দিতে রাধা ত্যাগ করেছে লোকলজ্জা। সে সবলে আকর্ষণ করেছে কৃষ্ণকে। আর তখন কৃষ্ণ নৌকো উলটে দিয়ে ভাসতে থাকে যমুনায়, তখন তার বুকের ওপর রাধা। লেখক সেই জলকেলির বর্ণনা করেন এভাবে : 'মরকতমণি দিয়ে গড়া তরণীর মতন কানু ভাসতে লাগলো জলে। তার বুকের ওপর রাধা যেন এক অজানা দেশের শ্বেতহংসী।'

কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার এই জলবিহার রাধার মধ্যে জাগ্রত করল এক নতুন চেতনা। সে বিবাহিতা বটে, কিন্তু এতদিন সমর্থ পুরুষের স্বাদ পায়নি। কৃষ্ণের সবল সঙ্গম তার ভেতরের ঘুমন্ত নারীত্বকে যেন জাগিয়ে দিল। মনে দুর্জয় সাহস নিয়ে সিক্তবসনে ঘরে ফিরল রাধা। তখন সবে সন্ধ্যে নেমেছে। মহামায়ার পূজা নিরত আয়ান তাকে দেখেও দেখল না। দ্বারের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল ননদিনী কুটিলা। কৌতূহল আর আশঙ্কা নিয়ে। তার সন্ধানী চোখ সিক্তা রাধার সর্বাঙ্গ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। নানা প্রশ্নে সে উদ্বেল করে তুলল রাধাকে। সত্য চাপা দিতে রাধা মিথ্যে গল্পের আশ্রয় নিল। গল্পের ঢঙটি রূপকের। সুতরাং পুরোপুরি মিথ্যে সে বলেনি। ননদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে ঘরে দুয়ার এঁটে কাঁদতে বসল সে। এবার অনেক কান্না কাঁদতে হবে তাকে — দুঃখের কান্না, সুখের কান্না।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে 'রাধাকৃষ্ণ' উপন্যাসের ঘটনাকে হুবহু মেলানো যায় না। অবশ্য যাওয়ার কথাও নয়। আর সেইজন্য জন্মখণ্ড থেকে যে প্রধান পার্শ্বচরিত্রটি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রয়েছে সেই বড়ায়িকে এ উপন্যাসে প্রায় পাওয়াই যায় না। অভিভাবিকা-সম সেই বৃদ্ধাকে ঔপন্যাসিক এনেছেন এই সপ্তম পরিচ্ছেদে যখন রাধা কৃষ্ণের প্রেমে প্রায় উদাসিনী হল। এই সময়ের রাধার মানসিক অবস্থাটা সুনীল বর্ণনা করেছেন চণ্ডীদাসের পূর্বরাগের সেই অতি বিখ্যাত পদটিকে আশ্রয় করে। লিখেছেন : 'কেউ তার অন্তরের ব্যথা বোঝে না। কেউ তাকে ডাকলেও তার কানে আসে না। তার আহারে রুচি নেই। সাজসজ্জায় মন নেই। একটা গেরুয়া-গেরুয়া শাড়িতে তাকে যোগিনীর মতন দেখায়। কখনো সে বেণীবন্ধন খুলে নিজের চুলের দিকে তাকিয়ে থাকে, কখনো তার চোখ চলে যায় আকাশের মেঘের পানে, আর অমনি দীর্ঘশ্বাস পড়ে। তাদের পোষা ভবন-শিখী দুটি যখন খেলা করে, তখন রাধার দৃষ্টি স্থির হয়ে থাকে শুধু তাদের কণ্ঠের ওপর।' রাধার এই চিত্তবৈকল্যের দিনে তাকে নানা কথা শুধোতে, সান্ত্বনা দিতে আসে বড়ায়ি। মানুষটি বড়ো স্নেহপ্রবণা। বিয়ের পর থেকেই রাধা তার কাছে অনেক সুখ-দুঃখের কথা বলে। বড়ায়ি সব বুঝতে পারে। চাতকিনী রাধার তৃষ্ণার বারি যে কানু ছোঁড়া তা তার জানতে বাকি থাকে না। একদিন দল বেঁধে আসে রাধার সখীরা — বৃন্দা, ললিতা। তারাও রাধার ভাবান্তর দেখে কিছু অনুমান করে, আভাসে বুঝতে পারে কার প্রেমে পড়েছে আয়ান ঘরণী। বৃন্দা খবর দেয়, কৃষ্ণও কম প্রেম-যাতনা ভোগ করছে না। সেও যেন পাগল হয়ে গেছে। ধেনু চরাতে চায় না, মাথায় আর চুড়ো বাঁধে না, যত্রতত্র গড়াগড়ি খায়, একনাগাড়ে বাঁশি বাজাতে বাজাতে প্রহর পার করে দেয়। রাধা আর চাপতে পারে না গোপন কথা। বলে, 'আমি মনে-প্রাণে চাই, ওর সঙ্গে যেন আর আমার দেখা না হয়! যদি দেখা হয়, তবুও যেন প্রণয় অনেক দূরে থাকে।' মুখে বলে বটে, কিন্তু প্রণয়-সর্পের দংশনে জ্বলতে থাকে রাধার দেহ। অসহ্য সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে সখীদের অনুরোধ করে, 'সখী, আমাকে এমন কোনো ওষুধ দিতে

পারিস যাতে আমার যৌবন জীর্ণ হয়ে যায়?' সখীরা একথা শুনে উঠে পড়ে। আসার পথে কৃষ্ণ তাদের পথ আগলে রাধার সংবাদ নেয়। বৃন্দা মুখ ঝামটে বলে ওঠে, 'সে তো মরতে বসেছে কালাচাঁদ, তুমিও মরো!' পরিচ্ছেদটি লেখক সমাপ্ত করেছেন এক অপূর্ব দৃশ্য রচনায়। ক্লান্ত রাধা ঘুমিয়ে পড়েছে বিছানায়। এলোচুল। ওষ্ঠে পাণ্ডুলেখা। ঘুমন্ত অবস্থাতেও তার কপালে ভাঁজ। সেই বলিরেখা যেন ব্যথিত হৃদয়ের চিহ্ন বহন করছে। তার বরতনুতে এসে পড়েছে ক্ষীণ চাঁদের আলো। গভীর রাত্রিতে পুজো সমাপ্ত করে আয়ান এসে দেখল ঘুমন্ত রাধাকে। পরম মমতায় ডান হাত দিয়ে স্পর্শ করল রাধার ললাট। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এ ঘর ছেড়ে চলে গেল অন্য ঘরে নিজের শয্যায়।

উপন্যাসের অষ্টম পরিচ্ছেদ রচিত হয়েছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বংশীখণ্ডকে কিছুটা আশ্রয় করে, বাকিটা লেখকের নিজস্ব কল্পনা। সূচনা 'কে গো বাঁশি বাএ বড়ায়ি কালিনী নঈকূলে' এই অতিচর্চিত পদটির ভাব-ভাষা দিয়ে। কৃষ্ণপ্রেমে আকুল রাধার অন্তর্বেদনা, আর্তি ও মিলনেচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে। সাংসারিক সমস্ত কাজকর্মেই তার ভুল হচ্ছে। আসলে তার মন মনেতে নেই। চুরি করে নিয়ে গেছে কালাচাঁদ। অনেক দূর থেকে ভেসে আসে কানুর বাঁশির স্বর। মনে জ্বালা ধরায়। আবার বাঁশি থামলেও মন কেমন আনচান করে। রাধা আজ একটি সংকটে পড়ল! নিশুতি রাতে বাঁশি বাজল কদমতলায়। বিনিদ্র রাধা চুপি চুপি শয্যা ছেড়ে উঠল। নিঃশব্দ হতে পায়ের নূপুর ও কটিভূষণ খুলে ফেলল। 'যা থাকে কপালে' এমনি একটা বেপরোয়া ভাব নিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ল। বাঁশির শব্দই তার চলার পথের নিশানা। অবশেষে সে মিলিত হল কৃষ্ণের সঙ্গে। প্রেমের মৃদুমধুর গুঞ্জরণে সারারাত্রি কাটল। দুজনেই বুঝল তারা একে অন্যের কাছে অপরিহার্য, এ সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। ক্রমে ক্রমে রাধা কুলকলঙ্ক, লজ্জা-ভয় সব কিছু ত্যাগ করল। এমনি অভিসার চলল দিনের পর দিন। তাদের প্রেম ক্রমাগত বেড়েই চলল। ননদিনী কুটিলা কিছু সন্দেহ করেছিল রাধার হাবভাবে, চাল-চলনে। একদিন রাত্রিতে রাধা অভিসারে বেরল, কুটিলা এসে দেখল শূন্য ঘর। সে দাদাকে ডেকে নিয়ে চলল বনের মাঝে। আয়ান স্বপ্নচালিতের মতো সংকেত কুঞ্জের দিকে এগোল। শেষের দিকে পা যেন তার আর ওঠে না। অনতিদূর থেকে সে দেখল রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা। রাধা হাঁটু গেড়ে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে। দৃশ্য দেখে যেন চমক লাগল। নীরবে নিঃশব্দে আরো দ্রুত গতিতে পালিয়ে এল সে। তারপর 'সোজা গিয়ে ঢুকলো তার পুজোর ঘরে। কালীমূর্তির সামনে জোড়াসনে বসলো চোখ বুজে। তবু তার বন্ধ চোখ দিয়েও টপ্‌টপ্ করে গড়িয়ে পড়তে লাগলো জল। সারা রাত ধরে।'

নবম পরিচ্ছেদে কৃষ্ণকে আবার ধেনুচারণরত দেখা যায়। তাকে গোষ্ঠে দেখে রাখাল বালকেরা আনন্দোল্লসিত হয়ে ওঠে। ধেনু চরাতে চরাতে কৃষ্ণ তার মোহন বাঁশিতে দারুণ ফুঁ দিল। বাঁশির রব যেন পাগলের বুকফাটা আর্তনাদ। বাঁশির শব্দে সবাই আসে, কিন্তু রাধা অনুপস্থিত। রাধাকে না দেখে কৃষ্ণ যেন উন্মত্ত হয়ে ওঠে, ক্রুদ্ধ সিংহের মতো গর্জন করতে থাকে। সুবল গোকুলে গিয়ে খবর নিয়ে আসে রাধা এখন আয়ানগৃহে নেই। ভয়ংকর অসুস্থ হয়ে সে গেছে ব্রজে, বাপের বাড়িতে। অবশেষে সুবলের পরামর্শে ঠিক হয় কৃষ্ণসহ রাখাল বালকেরা সবাই যাবে সেখানে। তবে নাটুয়ার সাজে, অভিনয় ক্রীড়া প্রদর্শন করতে। পরিকল্পনা মাফিক কাজ হয়। বৃষভানুর অঙ্গনে শুরু হয় অভিনয় — বিষয় বিষ্ণুর দশাবতার।

অভিনয় বেশ ভালই চলছিল। সবাই বেশ কৌতুক উপভোগ করছিল। নৃসিংহমূর্তি দেখে অনেক দর্শক ভয় পেতে থাকে। তখন সুবল কৃষ্ণপালার অভিনয় শুরু করল। দৃশ্য রচনার পর কানু আড়বাঁশিতে ফুঁ দিতেই যবনিকার আড়ালে থাকা মহিলা দর্শকমণ্ডলীতে একটা বিপর্যয় ঘটে গেল। জননীর কোলে মাথা ঢলে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে রাধা। তাকে শুশ্রূষা করার জন্য রাজবৈদ্য ডাকা হল। কিন্তু বৈদ্যের চেষ্টা নিষ্ফল। তখন সুবল কৌশল করে নিভৃতে দেখা করল রাধার সঙ্গে। সুবল বুঝল কৃষ্ণের কারণেই রাধার আজ এই অবস্থা। একই সঙ্গে সে জানাল রাধাবিহনে কৃষ্ণ এখন কোন অবস্থায় আছে। এ যে প্রগাঢ় প্রেমের নিদর্শন, যা আজ উভয়পক্ষে অভিমানের আকার নিয়েছে, তা বুঝতে সুবলের বিন্দুমাত্র সময় লাগল না। সুবল দুজনের দূরত্ব ঘোচাতে উদ্যোগী হয়ে রাধাকে বলে এল — 'তুমি তোমার গলার মালা থেকে একটি ফুল ছিঁড়ে দাও কানুর জন্য! আজ থেকে ঠিক দু'দিন বাদে পূর্ণিমা, সেই পূর্ণিমার রাতে তুমি যমুনার ধারে তমালের নীচে এসো। সে আসবে। তুমি সঙ্কেতের জন্য একটা ছোট দীপ জ্বেলে রেখো —।'

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের শেষটা পাওয়া যায়নি। কিন্তু রাধাবিরহের যতটুকু মিলেছে তা থেকে জানা যায়, কৃষ্ণ রাধার সঙ্গে প্রেমপর্ব সমাপ্ত করে আরো বৃহত্তর মঙ্গলসাধনের উদ্দেশ্যে বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরার পথে পাড়ি দিয়েছিল। অত্যাচারী মাতুল কংসকে হত্যা করে ধর্মের শাসন প্রতিষ্ঠা করতেই তার এ হেন পদক্ষেপ। সুনীল তাঁর উপন্যাসে এ প্রসঙ্গ বর্জন করেননি। এই ব্যাপারটি তিনি এনেছেন তাঁর উপন্যাসের দশম ও একাদশ পরিচ্ছেদে। সান্দীপনি মুনি কৃষ্ণকে জানিয়ে দিয়েছেন তার প্রকৃত পরিচয়, আদ্যোপান্ত জন্মবৃত্তান্ত। ব্রজের পথে যাওয়ার সময় এই পাগলাটে মুনিকে দেখেছিল রাখাল বালকেরা। তার উন্মাদতুল্য আচরণে কেউ কাছে যেতে সাহস পায়নি। কিন্তু ব্রজ থেকে ফেরার পথে কৃষ্ণ অভিশপ্ত হবার ভয়কে হেলায় তুচ্ছ করে পিপাসার্ত মানুষটির জন্য পানীয় নিয়ে পৌঁছেছিল। সান্দীপনি কৃষ্ণকে একা পেয়ে সব গোপন কথা উজাড় করে দিলেন। উস্কে দিলেন অত্যাচারী কংসের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য। বললেন — 'তুমি এখানে সামান্য নারীর রূপের মোহে ভুলে আছো! কিন্তু পৃথিবীতে তোমার আরও অনেক বড় কাজ আছে। আর কালবিলম্ব না করে তুমি মথুরায় চলো।' কৃষ্ণ নন্দগৃহে ফিরে দেখল তার জন্য রথ নিয়ে এসে হাজির হয়েছে কংসপ্রেরিত দূত অক্রূর। নন্দও যশোমতী কোনোমতে যেতে দেবেন না তাঁদের স্নেহপুত্তলিকে। কিন্তু কর্তব্য যে নিষ্ঠুর। কৃষ্ণ ও বলরাম উঠে পড়ল রথে। সুবল ছুটতে ছুটতে এল। বলল, 'কানু, তুই তো শ্রীমতী রাধিকার জন্য কিছু বলে গেলি না?' এ প্রশ্নের জবাব দিল কৃষ্ণ, যা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়ায়িকে বলা উক্তির সঙ্গে অনেকাংশে মেলে : 'রাধাকে বলিস, আমার কাজ শেষ করে আমি ঠিক ফিরে আসবো। আমি রাধার কাছে ফিরে আসবো। দেখা হবে সেই যমুনার তীরে, তমাল গাছের তলায়, পূর্ণিমা রাত্রে...।'

না, আর ফিরে আসেনি কৃষ্ণ। তার কথাও রাখেনি। মথুরাতে গিয়ে রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে পড়ে, তার আর ফেরা হয়নি। যাদবদের লুপ্তগৌরব ফেরানোর মস্ত দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছে সে। মথুরার রাজা হয়েছে। কংসের শ্বশুর জরাসন্ধ জামাতার মৃত্যুতে ভয়ংকর ক্রোধোদ্দীপ্ত হয়ে মথুরা আক্রমণের তোড়জোড় শুরু করেছেন। সুতরাং তাঁর হাত থেকে মথুরাকে রক্ষা করা কম কথা নয়। মাঝে একবার বৃন্দা ও সুবল গিয়েছিল কানুর কাছে রাধার দূত হয়ে,

তার কষ্টের কথা নিবেদন করতে। কৃষ্ণ সে কথায় তেমন কান দেয়নি। বৃন্দাবনে তার ফেরার ক্ষেত্রে প্রথম ও শেষ বাধা তার রাজপদ। এখানকার গুরুদায়িত্ব সে দিয়ে যাবে কাকে। তাছাড়া রাজা হয়ে আজ গোঠে গোচারণ মানায় না, বাঁশি বাজানো সাজে না। সেখানকার পালক পিতামাতার জন্য তার প্রাণ কাঁদলেও সে বড়ো অসহায়। আর রাধা? সুবলের এ প্রশ্নে কৃষ্ণের নির্দ্বিধ উত্তর : 'সুবল, তোরা রাধাকে বলিস, আমি মন-পবন গগনে রেখেছি। এখন দশমী দুয়ারে কবাট। আমি মূল কমলে মধুপান করেছি, আমার ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে, তাই জ্ঞানবাণে মদনবাণ ছিন্ন না করে পারিনি। আমি অহর্নিশ যোগধ্যান করি, আমার দেহে আর বিকার নেই। তবু তোরা বলিস, সেই সুন্দরের প্রতিমাকে আমি কখনো ভুলবো না।' একথা শুনে বৃন্দা-সুবল হতাশ হয়। বৃন্দাবনে ফিরে এসে রাধাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে। রাধা যেন শুনেও শোনে না। সে এখন ভয়ানক উদাসীন। চোখে তার আজ আর আশ্রু বয় না। তবু সে কৃষ্ণের কথা মনে করে প্রতি পূর্ণিমার রাতে সাজতে বসে। চুপি চুপি চলে যায় কালিন্দীর তীরে। হাতে আড়াল করে রাখা প্রজ্জ্বলন্ত দীপ। তার প্রিয়তম কথা দিয়েছে আবার ফিরে আসার, আর সে কারণেই তার অনন্ত প্রতীক্ষা।

এ এক অসাধারণ পুনর্নির্মাণ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রধান দুই চরিত্রের অমার্জিত গ্রামীণ স্থূলত্বকে বর্জন করে নাগরিক রুচির সঙ্গে মিলিয়ে এ যেন এক মিষ্টি প্রেমের উপন্যাস। মূল কাব্যে কৃষ্ণ রাধাকে করায়ত্ত করার জন্য নিজের দেবত্বের কথা বারবার ঘোষণা করেছিল, উপন্যাসে তার ছিটেফোঁটাও নেই। রাধার শরীর অধিকারের কালে কাব্যে যে বিতণ্ডা ইতর শব্দাশ্রয়ী হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল, ঔপন্যাসিক দুইয়ের কথা কাটাকাটির অংশ রাখলেও সেই গ্রাম্যতা ছেঁটে বাদ দিয়েছেন। বৃন্দাবনলীলায় কৃষ্ণের প্রধানতম ভূমিকা ছিল রাধামোহন হয়ে ওঠা। একটি অনিচ্ছুকা নারীর সঙ্গে শরীর সংযোগে তার মধ্যে কামনার বহ্নি জ্বেলে দেওয়ার কাজে কৃষ্ণের পদক্ষেপগুলি এখানে রক্তমাংসের বাস্তব মানুষের উপযোগী করে দেখানো হয়েছে। বাদ পড়েছে হার ও বাণখণ্ডের কাহিনি। কেননা মূল শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেই ওই খণ্ড দুটি রাধাকৃষ্ণের সম্পর্কের এমন এক স্থানে যোজিত, যা ঠিক বাস্তবোচিত নয়। বাদ গেছে বস্ত্রহরণ খণ্ডের ঘটনাও। সুনীল তাঁর নায়ককে রূপমুগ্ধ প্রেমিক করে তুলেছেন, অভব্য অমার্জিত কামুক করে তোলেননি। বড়ু চণ্ডীদাস ছিলেন আসলে পনেরো শতকের গ্রামীণ সংস্কৃতি-লালিত কবি। তখন আদিরসের স্থূলতা পাঠকের, শ্রোতার যথেষ্ট অনুমোদন পেত। কিন্তু মধ্যযুগ ছেড়ে আধুনিক কালে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় রুচি ইউরোপীয় বিদ্যার সংস্পর্শে এসে বেশি শুচিবায়ুগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। সুনীলের উপন্যাসে চরিত্রচিত্রণে তারই অনিবার্য প্রতিফলন ঘটেছে। তবে উপন্যাসটির স্থানে স্থানে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে অনুসরণ করার চিহ্ন বেশ স্পষ্ট, যা নবনির্মাণের পাশাপাশি অনুসৃজনের তত্ত্বকেও প্রতিষ্ঠা দেয়।

এবার কৃষ্ণকথাকেন্দ্রিক দ্বিতীয় উপন্যাস অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'কৃষ্ণ'। ১৯৮৩ সালে প্রথম প্রকাশ পায় আনন্দ পাবলিশার্স থেকে কিশোর সাহিত্যের তক্‌মা এঁটে। এই বই রচনার পিছনে প্রণোদনা যুগিয়েছে লেখকের বাল্য-কৈশোরের রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত পাঠ এবং ভগিনী নিবেদিতার একটি বিশেষ গ্রন্থের ('ক্র্যাডল টেলস্ অব হিন্দুইজম্') নিবিষ্ট অধ্যয়ন। তবে কাহিনি নির্মাণে শঙ্করীপ্রসাদ কেবল তাঁর অধীত গ্রন্থগুলির ওপর নির্ভর করেননি সেইসঙ্গে আশ্রয় করেছেন তাঁর নিজস্ব কল্পনার ওপর। ফলে উপাখ্যানে

নতুন দু'একটা চরিত্রও এসেছে, এসেছে পরিবেশের সঙ্গে মিশিয়ে কিছু মনোবিশ্লেষণও। বৈষ্ণবপদের তিনি রসিক পাঠক। উপন্যাসে বাদ পড়েনি তাও। সখ্য আর বাৎসল্য রসের বৈষ্ণবগীতি কোথাও কোথাও এই রচনার আবহ নির্মাণে দুর্দান্ত ভূমিকা নিয়েছে।

এ উপন্যাসের আলোচনায় প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার, মধুর রসাশ্রয়ী কৃষ্ণের তুলনায় লেখক এখানে তুলে ধরেছেন ঐশ্বর্যভাবাত্মক কৃষ্ণকে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মূলাশ্রয় থেকে এর উপজীব্য অনেকটাই স্বতন্ত্র। সংস্কৃত ভাগবতপুরাণই এর প্রধান অবলম্বন। সুতরাং ভাগবতে যেহেতু রাধা অনুপস্থিত, তাই 'কৃষ্ণ' উপন্যাস সম্পূর্ণত রাধাহীন। গোপীদের কথা দু'একবার এসেছে বটে, কিন্তু সে উল্লেখ মনে তত বেশি দাগ কাটে না। উপন্যাসটি বাইশটি পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। সূচনার কাহিনি কাঠামোটি এইরকম : হেমন্তের এক প্রাতে মথুরানগরী হঠাৎ সেজে উঠল। সুদৃশ্য বাদ্যমঞ্চে বাদকরা মধুর প্রভাতী সুর বাজাচ্ছে। মথুরার লোকজন বিস্মিত। রাজা কংসের এমন সুবুদ্ধি হল কবে থেকে! তিনি যে এমন সুরসিক সে তো কখনো জানা ছিল না। অচিরেই প্রকাশ পেল একটি সংবাদ। কংস তাঁর নিকট-সম্পর্কীয় ভগিনী দেবকীর সঙ্গে বৃষ্ণিবংশীয় বসুদেবের বিয়ে দিয়েছেন। সেই বিবাহের অভ্যর্থনার জন্য আজ এই রাজকীয় আয়োজন। বিবাহের পর রাজা কংস নিজের রথেই চড়িয়ে নিলেন আদরের ভগিনী ও ভগিনীপতিকে। তারপর সোজা রথ ছোটালেন নিজের রাজপুরীর দিকে। আসার পথেই শুনলেন আকাশবাণী, যার ভয়ঙ্করতা নিষ্ঠুর করে তুলল কংসকে। তিনি দেবকী ও বসুদেবকে বন্দি করে হাত-পা শিকলে বেঁধে ফেলে রাখলেন অন্ধকার কারাগৃহে। দেবকী-বসুদেবের পরপর অনেকগুলি সন্তান হল। কংস নির্দয়ভাবে তাদের হত্যা করলেন। কৃষ্ণ এলেন অষ্টম গর্ভে। কংস অবশ্য চাইছিলেন না দেবকীদের বাঁচিয়ে রাখতে। সেখানে যুক্তি দিলেন অমাত্য অক্রূর। বললেন, 'তাঁদের সঙ্গে তো আপনার শত্রুতা নয় — শত্রুতা তাঁদের অষ্টম সন্তানের সঙ্গে। সেই বিপদজনক সন্তানকে নিজের হাতে সংহার করার পরে ওঁদের মুক্ত করে দিলে সবাই ধন্য ধন্য করবে।' কংস মেনে নিলেন এ পরামর্শ। অক্রূর বন্ধু বসুদেবের সঙ্গে কারাগারে দেখা করতে গেলেন। এ উপন্যাসের চতুর্থ পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে কৃষ্ণের জন্ম। পুরোপুরি ভাগবত অনুসারী। দৈবীমায়ায় চরাচর আচ্ছন্ন। জেগে আছেন কেবল বসুদেব। বিধির বিধানকে সফল করার জন্যই যেন তিনি সমস্ত দুর্যোগ উপেক্ষা করে গেলেন গোকুলে নন্দালয়ে। সন্তান পরিবর্তন করে ফিরে এলেন নিঃশব্দে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের জন্মখণ্ডে কৃষ্ণজন্মের যে কারণ প্রদর্শিত হয়েছে, তা উপন্যাসে নেই। তবে গর্ভপাতের ফলে সপ্তম গর্ভে বলরামের জন্মপ্রসঙ্গ দুটি স্থানেই আছে। ওদিকে নন্দপত্নী যশোদার গর্ভে জন্ম নিয়েছেন দেবী মহামায়া। বসুদেব তাকে নিয়ে এসে শুইয়ে দিলেন দেবকীর কোলের কাছে। পরদিন কংস খবর পেয়ে কারাগারে গিয়ে সবলে ছিনিয়ে নিলেন সেই কন্যাকে। তারপর আছাড় মেরে হত্যা করবার কালে দেবী শূন্যে উঠে গিয়ে দৈববাণী করলেন, 'রে দুর্মতি! আমাকে বধ করে কী ফল! তোকে যে মারবে সে রয়েছে অন্যত্র। অব্যাহতি নেই তোর।' কংস আতঙ্কিত হলেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আখ্যানের সঙ্গে 'কৃষ্ণ' উপন্যাসের উপজীব্যের যদি একটি তুলনাত্মক বিচার করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি স্বল্পায়তন বিশিষ্ট জন্মখণ্ডেই কৃষ্ণজীবনের প্রথম পর্বের অনেক ঘটনাকে অতিসংক্ষেপে কেবল উল্লেখমাত্র করে গিয়েছেন।

আর উপন্যাসে ঘটেছে তার পল্লবিত বিস্তার। আসলে বড়ু চণ্ডীদাসের লক্ষ্য ছিল, রাধাকৃষ্ণের প্রণয়সম্পর্কের ওপর গাঢ়ভাবে আলোকপাত করা, যার আয়োজন শুরু হয়ে যায় তাম্বূলখণ্ড থেকেই। কিন্তু শঙ্করীপ্রসাদ তাঁর উপন্যাসে এ দিকটিকেই আগাগোড়া বর্জন করতে চেয়েছেন; পরিবর্তে তুলে ধরেছেন শিশু থেকে যুবাতে পরিণত হওয়া কৃষ্ণের বীরত্ব ও শক্তিমত্তা। কৃষ্ণ যে ঐশীসত্তা দুটি রচনাতেই তা আছে, তবে তার উপস্থাপনার ঢঙ ভিন্ন ভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি কৃষ্ণের দেবত্ব কৃষ্ণের মুখের উক্তিতে বারবার পরিস্ফুট করেছেন, যদিও তার সমগ্র আচরণটি রক্তমাংসের একজন জৈবিক মানুষের। অন্যদিকে শঙ্করীপ্রসাদের কৃষ্ণ একবারও নিজের মুখে দেবত্ব জাহির করেনি, তার যা কিছু অলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে কংস-প্রেরিত নানারূপধারী অসুরদের দলনে। যেহেতু কৃষ্ণের ঐশ্বর্যময় রূপটি ঔপন্যাসিকের প্রতিপাদ্য ছিল, তাই নবম পরিচ্ছেদ থেকে অন্তিম দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত প্রায় সব অংশেই কৃষ্ণের এই অসুরদলন রূপটি প্রধান হয়ে উঠেছে। কংসের নির্দেশে প্রথমে আসে পুতনা স্তনে বিষ মাখিয়ে। কৃষ্ণ তার স্তনপান করতে গিয়ে এত জোরে তা আকর্ষণ করে যে পুতনার মৃত্যু ঘটে। কংসের পরিকল্পনা বিফল হল। এরপর প্রেরিত হল বৎসাসুর, যে বাছুরের রূপ ধরে ধেনুদলের মধ্যে আত্মগোপন করে ছিল সুযোগ মতো কৃষ্ণকে আক্রমণ করে নিহত করবে বলে। বলরাম কৌশল মতো বৎসাসুরকে হত্যা করল। এরপর এল বকাসুর। বকের রূপ ধরে কৃষ্ণকে গিলতে এল। কৃষ্ণ তার দুই ঠোঁট প্রচণ্ড জোরে ফাঁক করে দিয়ে নিহত করল। পরের পালা মেষদানব মেধ্রাসুরের। কৃষ্ণের কাছে আসতেই কৃষ্ণ তার ঘাড়ে চড়ে বসল। পরে গাছের গায়ে আছড়ে তার ভবলীলা সাঙ্গ করে দিল। মরার সময় তার শরীর থেকে ফিনকি দিয়ে যে রক্তধারা ছুটেছিল, ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন, তার স্মারক অনুষ্ঠান হিসেবে পরবর্তীকালে পালিত হয় হোলি উৎসব। এবার পুতনা ও বকাসুরের ভাই অঘাসুর বধের পালা। অঘাসুর বিরাট সর্পের রূপ ধরে এমনভাবে মুখব্যাদান করে ছিল রাখাল বালকেরা আদৌ কিছু বুঝতে পারেনি। কিন্তু যখন তার দুটি বড়ো চোয়াল বুজে আসতে লাগল তখন সবাই ভয় পেলে কৃষ্ণকে বাঁচাবার জন্য ডাকতে লাগল। কৃষ্ণ তখন দ্রুত ছুটে সেই মুখ গহ্বরে প্রবেশ করল। এরপর নিজের শরীরকে স্ফীত থেকে স্ফীততর করে অঘাসুরের প্রাণ নাশ করল। গর্দভরূপী ধেনুকাসুর, অশ্বরূপী কেশী ও বৃষরূপী অরিষ্টাসুরকে হত্যা করার প্রসঙ্গও এসেছে উপন্যাসে। এগুলি সবই কৃষ্ণের তারুণ্য ও যৌবনকালের ঘটনা। বাল্যে তিনি বিনাশ করেছিলেন শকটাসুর ও যমলার্জুনকে। উপন্যাসের সপ্তদশ পরিচ্ছেদে ইন্দ্রযজ্ঞের প্রসঙ্গ বিবৃত। গোপরা সুকৃষির জন্য বর্ষণের দেবতা ইন্দ্রকে তুষ্ট করতে পূজা করে থাকে। কৃষ্ণ যুক্তি দিয়ে সেই পূজার বিরোধিতা করলেন। তাঁর মতে, দেবতারা কল্পিত ধারণা মাত্র। সুতরাং মিথ্যা। সত্য হল প্রকৃতি ও তার শক্তি। সুতরাং পূজা যদি করতেই হয়, তাহলে প্রকৃতির আরাধনা করা উচিত। এতে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটালেন। তখন গোপকুল কৃষ্ণের পরামর্শ মেনে গোবর্ধন পর্বতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হল। সব কিছু জলমগ্ন হচ্ছে দেখে কৃষ্ণ তাঁর অসীম বীরত্বে গোবর্ধনকে একটি তালুর ওপর সংস্থাপন করলেন। এভাবে সাতদিন কাটল। ইন্দ্র তখন পরাস্ত হয়ে কৃষ্ণের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। গোপরা রক্ষা পেল।

'কৃষ্ণ' উপন্যাসের অষ্টাদশ পরিচ্ছেদের বিষয়টি ভাগবত অনুসারী। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের

জন্মখণ্ডেও এ প্রসঙ্গ আছে। বিষয়টি হল, কংসের পুরীতে নারদের আগমন ও কৃষ্ণ সম্পর্কে কংসকে সাবধান করে দেওয়া। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নারদের উপস্থাপনটি কৌতুককর। বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতিতে ইনি কোন্দল-পরায়ণ ঋষি। ঢেঁকিবাহন এই মুনিকে নিয়ে কবি যেন মজা করেছেন, তাঁর বেশবাস, চালচলনেও লাগিয়েছেন কৌতুকের স্পর্শ। নারদের চুলদাড়ি পাকা, দেখতে বেঁটে মর্কটতুল্য। ব্যাঙের মতো থপ্‌থপিয়ে চলে। তাঁর মুখমণ্ডল বিকৃত। অঙ্গভঙ্গি হাসির উদ্রেক করে। উপন্যাসের নারদ এমন নন। ঋষিতুল্য গাম্ভীর্য আছে তাঁর। ঢেঁকিতে চড়ে ঘুরে বেড়ালেও দিনরাত হরি গুণগান করেন, বীণা বাজান। ইনি কোন্দলের স্রষ্টা বটে, তবে তাঁর বিবাদের উদ্দেশ্য ধর্মকে জয়ী করা। সেই উদ্দেশেই তিনি এসেছেন কংসের আলয়ে। বসুদেবের অষ্টম সন্তানই যে কৃষ্ণ নারদ কংসকে স্পষ্টভাবে একথা জানালেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে কংস দেবকী ও বসুদেবকে হত্যা করতে চাইলে কৌশলে নিরস্ত করলেন। নারদ তো চান মথুরায় কৃষ্ণের উপস্থিতি। তাই পরামর্শ দেবার ঢঙে বললেন, 'অসুর পাঠিয়ে তাকে মারা যাবে না, তা তো দেখেছ। তাকে এখানে কৌশলে নিয়ে এসে কার্যোদ্ধার করতে হবে। তাই বলি কী, যতদিন-না কৃষ্ণকে এখানে এনে শেষ করতে পারছ, ততদিন বসুদেব ও দেবকীকে বেঁধে রাখো, যাতে তারা পালিয়ে কৃষ্ণের কাছে হাজির হতে না পারে।' শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কেবল কংসকে সচেতন করার চেষ্টা আছে, কিন্তু নারদ কর্তৃক এমন পরামর্শ দানের ব্যাপার লক্ষ করা যায় না।

উপন্যাসের ঊনবিংশ থেকে দ্বাত্রিংশ পর্যন্ত চারটি পরিচ্ছেদের কাহিনি বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে নেই। এখানে আছে অমাত্যদের সঙ্গে ভীত কংসের মন্ত্রণা, নারদের পরামর্শ অনুযায়ী কৃষ্ণ ও বলরামকে ধনুযজ্ঞ উপলক্ষ্যে মল্লক্রীড়ায় আহ্বান, তদনুযায়ী কংস কর্তৃক অক্রূরকে রথসহ বৃন্দাবনে প্রেরণ। অক্রূর নন্দের কাছে প্রকাশ করে দিলেন কৃষ্ণের জন্মরহস্য, কীভাবে কংসের কারাগার থেকে নন্দগৃহে পৌঁছাল সদ্যোজাত কৃষ্ণ। কেবল নন্দ নয়, অক্রূর কৃষ্ণকেও জানালেন তাঁর প্রকৃত পরিচয়। সব শুনে কৃষ্ণ ব্যথিত হলেন। তিনি মনস্থ করলেন দুরাচারী কংসকে যেকোনো উপায়েই নিধন করবেন তিনি। অক্রূরের সঙ্গে কৃষ্ণ ও বলরাম মথুরাপুরীতে প্রবেশ করলেন। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন তাঁদের নীতি। তদনুযায়ী কংসের দাম্ভিক ও কুবচনে অভ্যস্ত রজককে হত্যা করলেন কৃষ্ণ। আবার পুষ্পসত্রে গিয়ে পেলেন সুদামার মতো বন্ধুকে। ধনুভঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করলেন নিজেদের বীরত্ব। অন্ধকার পথে দুই ভাইয়ের সঙ্গে শত্রুায়ুধের পরিচয় ঘটল, যে তার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর। কৃষ্ণকে মারবার জন্য কংসের পূর্ব পরিকল্পনা ছকে রাখা ছিল। মদমত্ত কুবলয়াপীড় নামক হস্তী দ্বারা পদপিষ্ট করে কৃষ্ণকে হত্যা করা। কিন্তু বাস্তবে ঘটল তার বিপরীত। কৃষ্ণের চাতুর্য, শক্তিমত্তা, ক্ষিপ্রগতি শেষপর্যন্ত কুবলয়াপীড়কে পরাস্ত করল। এরপর কংস প্রেরণ করলেন চানুর ও মুষ্টিককে। চানুর কৃষ্ণের দ্বারা নিহত হল। অন্তিমে অত্যাচারী কংসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন কৃষ্ণ। কংসের ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে গেল। শৃঙ্খলাবদ্ধ দেবকী ও বসুদেবকে কৃষ্ণ মুক্ত করলেন, মুক্তি পেলেন এতদিনের বন্দি উগ্রসেনও। মাতামহ উগ্রসেনকে সিংহাসনে বসিয়ে তবেই দায়িত্বমুক্ত হলেন কৃষ্ণ।

এ উপন্যাস মূলত বীর কৃষ্ণের কাহিনিকেই উপস্থাপন করেছে। তাঁর জীবনে কোথাও যে রাধা কিংবা সখীদের অস্তিত্ব ছিল, তা একবারের জন্য মনেও হয় না। কিন্তু এমনটা

হওয়ার কারণ কী? শঙ্করীপ্রসাদ ভাগবতকে অনুসরণ করলেও সেখানে তো গোপিনীরা ছিল, তাদের সঙ্গে যে কৃষ্ণের হৃদয়-সম্বন্ধ নির্মিত হয়েছিল তেমন আখ্যানেরও অভাব নেই। কিন্তু ঔপন্যাসিক পুরোপুরি তা বর্জন করেছেন। কিশোর-পাঠ্য উপন্যাস বলেই কি? বিপরীত পক্ষে এ উপন্যাসে সংস্থাপিত হয়েছে কৃষ্ণের জীবনের সেইসব ঘটনাবলি যা তাঁর বীরত্বের, সাহসিকতার প্রকাশক। অর্থাৎ কৃষ্ণকে এখানে হাজির করা হয়েছে একটি অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে, যিনি অন্যায় ও অধর্মের প্রতিবাদী, যিনি অমিত শক্তিতে বিনষ্ট করেন অশুভ ও অমঙ্গলকে। নরম মনের কিশোরদের পক্ষে এক আদর্শ বটে। সুতরাং দেখা গেল, একই কৃষ্ণকাহিনি রচয়িতাদের উদ্দেশ্যভেদে কেমন রূপ নিতে পারে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'রাধাকৃষ্ণ' যখন লিখছেন, ততদিনে পশ্চিমবাংলায় নকশাল আন্দোলন শেষ। উত্তাল সত্তরের সময়পর্ব উজিয়ে তাঁর ওই উপন্যাস তৎকালীন বাঙালি পাঠককে কি নতুন কোনো বার্তা দিতে চেয়েছিল যে, পেশিশক্তি নয় প্রেমের শক্তির মধ্যেই লুকিয়ে আছে আমাদের অস্তিত্বের সার্থকতা? সুনীল চিরাচরিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গল্পটিকে কেমন ভাবে পড়তে চেয়েছিলেন, তা তাঁর উপন্যাসের কাহিনি-বিন্যাসের সূত্রে বেশ বোঝা যায়। দেবত্ব, অলৌকিকত্ব, গ্রাম্যতা, স্থূলত্ব ইত্যাদি বর্জন করলে রাধা-কৃষ্ণের হৃদয়াকর্ষণের উপাখ্যানটি যে রূপ নিতে পারে 'রাধাকৃষ্ণ'-এ সেটাই দেখিয়েছেন সুনীল। একজন আধুনিক নাগরিক পাঠকের রসাস্বাদের ভঙ্গিটি এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেজন্য 'কৃষ্ণ'-র চেয়ে 'রাধাকৃষ্ণ' প্রাপ্তবয়স্ক বোদ্ধা পাঠককে অনেক বেশি কাছে টানে।

আধুনিক কালে বাংলা পুরাণকেন্দ্রিক উপন্যাস রচনায় একটি বিশিষ্ট নাম দীপক চন্দ্র। ঔপন্যাসিকের দক্ষ কলম নিয়ে দীপক পাঠক-সমক্ষে হাজির হন বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, বিবিধ পুরাণ থেকে উপাখ্যান বেছে নিয়ে প্রায় ত্রিশটির মতো পৌরাণিক উপন্যাস লিখেছেন তিনি, যার অর্ধেক রচনায় রয়েছে কৃষ্ণের উপস্থিতি। কারণ কৃষ্ণ শুধু ভাগবতের উপজীব্য নন, মহাভারত কাহিনিরও বিশিষ্ট চরিত্র। আমাদের আলোচিতব্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে এমন দুটি উপন্যাস এখানে উল্লেখ্য। এর একটি হল ১৯৯৩-এ প্রকাশিত 'মন-বৃন্দাবন' ও অন্যটি ১৯৯৫-এ মুদ্রিত 'যদি রাধা না হত'। এই দুটি উপন্যাসেই ঘটেছে কৃষ্ণকথার আধুনিক পুনর্নির্মাণ। এ দুইয়ের পারস্পরিক তুলনামূলক পর্যালোচনা করতে বসলে প্রথমেই একটা কথা মনে জেগে উঠবে যে, 'মন-বৃন্দাবন'-এর কেন্দ্রভূমিতে যদি থেকে থাকেন কৃষ্ণ, তাহলে পরের উপন্যাস মূলত রাধাকে ঘিরে। তবে দুইজনকেই রাখা হয়েছে প্রৌঢ়ত্বের সীমানায়, যে বয়সে দাঁড়িয়ে দুইজন তাঁদের ফেলে আসা জীবনের সবকিছুর চুলচেরা বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করছেন। ভাগবতে রাধা নেই রয়েছে গোপিনীরা, যাদের সঙ্গে কৃষ্ণের মধুর প্রেমলীলা সম্পন্ন হয়েছিল। কর্তব্যের অনুরোধে বৃন্দাবন ছেড়ে কৃষ্ণকে একদিন চলে আসতে হয়েছিল। প্রথমে মথুরা, পরে সেখান থেকে বিশেষ কারণে দ্বারকায়। 'মন-বৃন্দাবন' উপন্যাসের কৃষ্ণ দ্বারকাবাসী কৃষ্ণ। জীবনের অনেকটা পথ পেরিয়ে আসার পর যিনি আত্মবিশ্লেষণে বসেছেন। প্রায় প্রতিটি রাত বিনিদ্র কেটেছে তাঁর। ঘুমোতে গেলে অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন তাঁর ঘুম চুরি করে নেয়। তাঁর জীবনের প্রান্ত ছুঁয়ে যাওয়া নানান চরিত্র ঘুমের মধ্যে এসে হাজির হয়। তাদের দু'চোখে হাজার হাজার প্রশ্ন, চোখের চাহনিতে কত তিরস্কার, অনুযোগ, অভিযোগ। কুরুক্ষেত্রের

রণাঙ্গণে প্রাণহীন পড়ে আছে গান্ধারীর ঊনশত পুত্র। স্বেচ্ছা-অন্ধত্ব বরণ করা গান্ধারী এলেন রক্তাক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে, শবের পুরীতে। খুলে ফেললেন চোখের বাঁধন, নিজ সন্তানদের মৃত মুখ দেখবেন বলে। দেখলেন। অন্তর হাহাকার করে উঠল তাঁর। গেলেন কৃষ্ণের কাছে। আগেই বুঝেছিলেন, কৃষ্ণই এ নাটের গুরু। রূঢ় কণ্ঠে তিরস্কার করলেন তিনি কৃষ্ণকে। সেই ভর্ৎসনা আজও যদুপতির কানে বাজে ঃ 'কৃষ্ণ, বুড়ো বয়সের সন্তানহীনতার যন্ত্রণা, শোক নিয়ে বেঁচে থাকা বড় কষ্ট। এই শোকের কোনো সান্ত্বনা নেই। তুমি বড় নিষ্ঠুর। তোমার প্রাণে একটু দয়া মায়া মমতা থাকলে আমার একটি সন্তানকে অন্তত বাঁচাতে পারতে। তোমার দেয়া শাস্তি যতকাল মনে থাকবে ততকাল তোমার কোন ক্ষমা নেই।' এর উত্তরে কী বলবেন কৃষ্ণ? কী বলার আছে তাঁর? কৃষ্ণের মনে ভাবান্তর হয়। চলে আসেন বর্তমানে। দ্বারকার বর্তমান পরিস্থিতি তাঁর অন্তরকে ব্যথিত করে। এখানে রাজকার্য করার সেই পরিবেশ নেই। দ্বারকার প্রতিটি মানুষ যেন আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর। নিজেকে নিয়ে সদাব্যস্ত। কৃষ্ণ ভেবে পান না এই আত্মমগ্নতার অভিশাপ কোথা থেকে এল যাদবদের মধ্যে। তাই এখানে নেই সেবার মন, আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা, কাজ করার ইচ্ছে, নেতৃত্বের প্রতি আস্থা ও আনুগত্য, ত্যাগ স্বীকারের মনোবল। দ্বারকার মানুষের এই নৈতিক অধঃপতন দেখতে কষ্ট হয় তাঁর। মাঝে মাঝে মনে হয়, এ সবই গান্ধারীর অভিশাপের ফল। আবার পরক্ষণেই মনে হয়, না, ইতিহাসের ধারাটাই এই — নদীর এক কূল ভাঙে, অন্য কূল গড়ে।

মধ্যরাত্রির নৈঃশব্দ্য আজ কৃষ্ণকে ঘিরে ধরেছে। বিরহকাতর একটি পাখি ওই গভীর রাত্রিতে বাঁশির মতো মিঠে সুরে শিস দিয়ে তার সঙ্গিনীকে ডাকছিল। আর সেই বাঁশির সুর জাগিয়ে দিচ্ছিল কৃষ্ণের মনে পুরোনো দিনের স্মৃতি, বৃন্দাবনে যাপিত জীবনের বিক্ষিপ্ত ঘটনা-কণা। অন্ধকারের মধ্যে তিনি যেন দেখতে পেলেন রাধার ভুবন-আলো-করা রূপ। একটা শিহরণ বয়ে গেল কৃষ্ণের শরীরের ভেতর। তিনি অস্ফুটে বলে উঠলেন, 'রাধা! আমার বৃন্দাবনের রাধা! আমার জীবন, আমার প্রেম, আমার ইহকাল। তুমি ছাড়া কৃষ্ণের কি আছে আর? তোমা ছাড়া হয়ে আছি বলেই আমার চারদিকে এত অন্ধকার...। ওগো সখি, হৃদয়ে আমার দীপখানি জ্বাল।' এ মিনতির উত্তরে রাধা যেন বলেন : 'এই অতৃপ্তিরও একটা মূল্য আছে। শূন্যতার যন্ত্রণা আছে বলেই পূর্ণতার আনন্দ টের পাই।' একথা মেনে নিতে পারেন না কৃষ্ণ। তাঁর বারে বারেই মনে হয় দ্বারকার জীবন, আর তাঁর আগের জীবন মস্ত বড়ো দুই ভাগ। দ্বারকায় প্রকৃত জীবন নেই, রয়েছে অনন্ত সুখ আর বিলাসিতা; আর বৃন্দাবনে প্রেম ও আনন্দ। এভাবেই শুরু হয় উপন্যাসটি, শেষ হয় বৃন্দাবনে হোলির উৎসবে। মোট দশটি পরিচ্ছেদ এর এবং প্রতিটিতেই কৃষ্ণ ক্ষণে ক্ষণে যাত্রা করেছেন বর্তমান থেকে অতীতে, অতীত থেকে বর্তমানে।

এ উপন্যাসে কৃষ্ণকথার উপস্থাপনায় দীপক চন্দ্র বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে অভিনবত্ব সঞ্চারের চেষ্টা করেছেন। তার ফলে কাহিনি-কথনটি কোথাও কোথাও যুক্তিসিদ্ধ ও আধুনিক হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। কৃষ্ণের বাল্যলীলায় পুতনা রাক্ষসী বধ একটি বিশিষ্ট ঘটনা। কংস প্রায় নিশ্চিত হয়েই পুতনাকে নন্দগৃহে পাঠান শিশু কৃষ্ণকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বড়ু চণ্ডীদাস মাত্র একটি বাক্যেই সেরেছেন ব্যাপারটি : 'তনপান

ছলে কাহ্ন তাক সংহারিল।' উপন্যাসে স্বভাবতই সে প্রসঙ্গ বিস্তার পেয়েছে। পুতনা নন্দগৃহে প্রবেশ করেছে সন্তানহারা এক শোকাকুলা জননীর ছদ্মবেশ ধরে। সকালের কর্মব্যস্ততার সুযোগটিকে পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগায় সে। তার চোখের কোণে কালি, কেঁদে কেঁদে ফুলিয়ে ফেলা চোখ, আলুথালু চুল, ঢিলেঢালা বেশবাস দেখে যশোদারও মনে করুণা হয়। যশোদার সঙ্গে ইনিয়ে বিনিয়ে অনেক গল্প করে। তারপর এক ফাঁকে সে যশোদাকে বলে বসে, 'সাতরাজার ধন মানিক পেয়ে বুক যে আমার টন্‌টন্‌ করছে দিদি। যদি অনুমতি কর, বাছাকে একটু বুকের দুই খাওয়াই।' পুতনা আগে থাকতেই প্রস্তুত হয়ে এসেছিল তার স্তনে প্রখর বিষ মাখিয়ে। কিন্তু সে যতবার গোপালের মুখ তার বুকের কাছে নিয়ে গেল, ততবারই কৃষ্ণ মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে তার স্তনবৃন্তে শিশুর দেয়ালা করতে লাগল। 'তবু পুতনা বিষ-মাখানো স্তনটি জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টা করল। খেলায় বাধা পেয়ে শিশু গেল ক্ষেপে। রাগে পুতনার ঝুঁকে পড়া মুখ খামচে ধরল। গোপালের বিষমাখা হাত পুতনার মুখবিবরে আচমকা ঢুকে গেল। বিষক্রিয়ার তীব্র যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে গেল পুতনা!' বোঝাই যায়, এ বর্ণনা প্রচলিত কাহিনি-অনুসারী নয়, বরং অনেক বেশি বাস্তবসম্মত।

কৃষ্ণ গোপবালক। তিনি যে গোচারণে যেতেন ভাগবতে তার সামান্য উল্লেখ আছে। পদাবলিতে কৃষ্ণের গোষ্ঠলীলার পদ যথেষ্ট পরিমাণে মিলেছে। তবে অন্যান্য গোপবালকের মতো গোপালক কৃষ্ণ গোচারণে লগুড় ব্যবহার করতেন না। তাঁর হাতের মোহন বাঁশিটি সেই কাজ করত। বেণু বাজিয়ে কৃষ্ণ গোরুদের আহ্বান ও সঞ্চালন করতেন। পাঁচনির বদলে বাঁশি গ্রহণের কারণটি ঔপন্যাসিক যেভাবে উপস্থাপিত করেছেন তাতে পুনর্নির্মাণের অভিনবত্বটুকু বেশ ধরা পড়েছে। গোষ্ঠে যাওয়ার প্রথম দিনে কৃষ্ণের হাতে গোপকুলের প্রথা অনুযায়ী পাঁচনি তুলে দিলেন রোহিণী। কৃষ্ণ ক্ষুব্ধ হয়ে সেটি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। এ নিয়ে তিনি যশোদা ও বলরামের কাছে তিরস্কৃত হলেন। অভিমানী কৃষ্ণ তখন নন্দের কাছে অভিযোগ জানিয়ে বললেন, 'মা বড় অবুঝ। ভুল বুঝে নিজে কষ্ট পায়, আমাদেরও কষ্ট দেয়। আচ্ছা বাবা, তুমি বল, মায়ের সঙ্গে ধবলী, কালী, রূপসী, লালীর পার্থক্য কোথায়? ছোটবেলার মার বুকের দুধ খেতাম, বড় হয়ে ওদের দুধ খাচ্ছি। ওরাও যে আমার মা হয়ে গেছে। পাঁচনি তুলে কেন প্রাণে ওদের মারব? ওদের প্রহার করা মানে নিজের মাকে প্রহার করা। আমি পাঁচনি হাতে করে প্রথা রক্ষা করতে পারব না। প্রথার চেয়ে আমার আদর্শ বড়। পাঁচনি ফেলে আমি বাঁশি নেব। আমার বাঁশি ওদের দলছুট হতে দেবে না, ঠিক ঘরে ফিরে আসবে।'

এ উপন্যাসের একটি পরিচ্ছেদে কৃষ্ণকে গোপরমণীদের রক্ষাকর্তা হিসেবে দেখানো হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণ নিজেই দুর্বৃত্ত, যিনি রাধার দেহের ওপর নিজের অধিকার ফলাতে চান, নানাভাবে পীড়ন করেন গোপযুবতীদের। কিন্তু 'মন বৃন্দাবন'-এর কৃষ্ণ তার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনিই বরং দুর্বৃত্তদের হাত থেকে রাধা, বিশাখা, ললিতা, চন্দ্রাবলী এমনকি মাসী কুটিলাকে রক্ষা করেন। এতে সবাই মুগ্ধ বিস্ময়ে ও কৃতজ্ঞ চোখে কৃষ্ণের দিকে চেয়ে থাকে। তাদের কাছে কৃষ্ণের এই আকস্মিক আবির্ভাবটাই বিস্ময়ের, একই সঙ্গে স্বস্তিরও। কিন্তু কুটিলার বাঁকা মন। সে কৃষ্ণের বীরত্বে আদৌ বিগলিত নয়; বরং তীব্র ভর্ৎসনা বাক্য বেরিয়ে আসে তার মুখ দিয়ে : 'ছিঃ ছিঃ! লাজলজ্জা কিছু নেই গো। এক নৌকো লোকের মাঝে ধিঙ্গি ছেলেমেয়ের এমন বেলেল্লাপনা দেখে গা জ্বলে যায়। একটু সরম নেই গা! দিন

দিন কী যে হচ্ছে? কেলে ছোঁড়াটা অষ্টপ্রহর মেয়ে মানুষের পেছনে ঘুর ঘুর করছে।' একথার প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণ যে কথা বলেন, সে একেবারে আধুনিক সমাজচেতনার মর্মকথা। আগের যুগে সমাজ ছিল পুরুষ-শাসিত, নারীরা ছিল কেবল দাসী। সমাজের জীর্ণ কারাগারে বসে তারা কেবল নিজেদের দুর্ভাগ্য নিয়ে বিলাপ করেছে। কিন্তু এখন দিন বদলেছে। সামাজিক প্রগতিকে তার চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে দিতে গেলে চাই নারী-পুরুষের যৌথ প্রয়াস। কুটিলাকে সম্বোধন করে কৃষ্ণ এখানে যে-কথা বলেন তা যেন একালের সমাজতন্ত্রী সাম্যবাদী কোনো নেতার ভাষণ। এখানে পুরাণের কংস আর আধুনিক সময়ের অত্যাচারী প্রশাসক এক আসনে এসে দাঁড়ান। নারীবাদী চিন্তার অভিপ্রকাশ যেন দূরদর্শী কৃষ্ণের গলায় : 'মাসি গো, গোটা দেশটা আজ কংসের কারগার। সেই কারাগার ভাঙা পুরুষের একার কর্ম নয়। দেবতারাও পারেনি একা অসুর দমন করতে। নারীকে ডেকে নিল যখন অসুর নিধন হল তখন। কংসের রাজ্যে অসুরের ছড়াছড়ি। নারীশক্তির বোধন না হলে মথুরায় অসুর দমন হবে কেমন করে?.... মাসি গো, দেশটা শুধু পুরুষের নয়, নারীরও। এ কথাটা বোঝাতেই চণ্ডীর গল্প বানাল পুরাণকারেরা। নইলে তোমার সংস্কার ভাঙবে না, বিশ্বাস গড়ে উঠবে না। সংসারটা সুন্দর হয় স্বামী স্ত্রীর যুগল শ্রমে ও প্রেমে। তেমনি দেশটাও স্বর্গ হয়ে যায় নারী-পুরুষের মিলিত কর্মোদ্যোগে।' আধুনিক সমাজভাবনার প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণচরিত্রের এই নবনির্মাণ সত্য সত্যই পুরাণ-কাহিনির যথার্থ অনুসৃজন বলে গণ্য হতে পারে।

দীপক চন্দ্র আর একটি অভিনব কথা শুনিয়েছেন তাঁর এই উপন্যাসে। এখানে যদিও সরাসরি ও বিস্তৃত ভাবে কৃষ্ণকর্তৃক কালীয়দমনের ঘটনা বর্ণিত হয়নি, কিন্তু বিষধর, কালান্তক কালীয়নাগকে অন্য দৃষ্টিকোণে উপস্থিত করায় ঔপন্যাসিকের ভাবনার অভিনবত্ব ধরা পড়েছে। ভাগবত কিংবা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সর্বত্রই কালীয়নাগকে একটি বিষধর সাপ হিসেবে দেখানো হয়েছে, যে বাস করে কালীদহের জলে। দহের জল এতই বিষাক্ত যে মানুষ, গরু, পশু, পাখি যে তা পান করে সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বলা হয়েছে যে, কৃষ্ণ সখীসহ রাধাকে নিয়ে জলকেলি করবেন বলে কালীদহের জল বিষমুক্ত করার জন্য কালীয়কে দমন করেছিলেন। দীপক চন্দ্রের উপন্যাসের বয়ান কিন্তু তা বলছে না। কালীয় নাকি কৃষ্ণের বিরুদ্ধে কংসের ষড়যন্ত্রের এক অঙ্গ। পুতনা, তৃণাবর্ত, যমলার্জুন, অঘাসুর, বকাসুর, ধেনুকাসুর প্রমুখকে পাঠিয়েও যখন কংস সফল হলেন না, তখন তিনি আশ্রয় নিলেন কালীয়ের। উপন্যাসে দীপক লিখছেন ঃ 'নিজের প্রত্যয়ে দৃঢ় হওয়ার জন্যে কৃষ্ণকে গুপ্তহত্যার পথ পরিহার করল কংস। গোপন হত্যার ছকটাকে একটু বদলাল। বিশ্বস্ত রসায়ন-বিজ্ঞানী কালীয়নাগকে প্রচুর অর্থ এবং রূপময়ী রমণী উপঢৌকন দিয়ে এক অদ্ভুত উপায়ে কৃষ্ণের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার চক্রান্ত করল। গোকুল, বৃন্দাবনের পশুপাখী নিরীহ মানুষদের উপর আঘাত হেনে কৃষ্ণ সম্পর্কে লোকের অলৌকিক বিশ্বাসগুলো ভেঙে খান্ খান্ করবে পরিকল্পনা করল। কৃষ্ণ কালীয়নাগের বিষাক্ত গ্যাস উৎপাদনের কৌশলটাকে ধরে ফেলল। ধরা পড়ে কৃষ্ণের পদানত হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করল।' মনে হয়, ঔপন্যাসিকের এ জাতীয় কল্পনার পিছনে রয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত, যেখানে প্রবল শক্তিমান হিটলার বিষাক্ত গ্যাসচেম্বার বানিয়ে তাতে শত্রুপক্ষের সৈন্যকে, নিরপরাধ ইহুদিদেরকে, নৃশংসভাবে হত্যা করেছিলেন। এছাড়া এখানে সত্যজিৎ রায়ের 'হীরক রাজার দেশে'র অত্যাচারী রাজা

ও তাঁর পোষিত প্রযুক্তিবিদ্ বিজ্ঞানীর প্রভাব থাকাও অসম্ভব নয়।

এই উপন্যাসটিতে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের অনুষঙ্গটি বিভিন্ন অধ্যায়ে টুকরো টুকরো ভাবে আনা হয়েছে, তবে সবই প্রৌঢ় কৃষ্ণের স্মৃতি রোমন্থনের আকারে। প্রেমিক কৃষ্ণ এখানে গোপিনীদের চোখে নওল কিশোর। তার রূপ দেখে সবাই বিভোর। কৃষ্ণকে দেখতে না পেলে রাধার মন বড়ো উতলা হয়। এ নিয়ে সখীদের হাসাহাসি, চোখ টেপাটিপি। রাধা জানেন না কৃষ্ণের মধ্যে কী এমন আছে যা তাঁকে পাগল করে তোলে। কৃষ্ণের বংশীধ্বনি তিনি কোনোমতে এড়াতে পারেন না। কৃষ্ণের দিক থেকেও রাধার প্রতি টান সর্বাধিক। উপন্যাসে এই তুল্যানুরাগ আবেগ-স্পন্দিত ভাষায় প্রকাশ করেছেন কথাকার। প্রয়োজনে বাংলা ও ব্রজবুলিতে লেখা পদও আবহ নির্মাণে ব্যবহার করেছেন। সবচেয়ে বড়ো কথা, রবীন্দ্রনাথের লেখা একাধিক গানের চরণও ব্যবহৃত হয়েছে এই অনুষঙ্গে। মধ্যযুগের বিষয় নিয়ে রচিত উপন্যাসে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যবহার এক অর্থে রবীন্দ্রসৃষ্টির চিরন্তনত্বই প্রমান করে। দু'একটি দৃষ্টান্ত :

১. সখী ভালোবাসা কারে কয়।
সে কি কেবলই যাতনাময়?
২. আনন্দধারা বহিছে ভুবনে
দিনরজনী কত অমৃতরস উথলি যায় অনন্ত গগনে।
৩. প্রতিদিন যদি কাঁদিবি কেবল
একদিন নয় হাসিবি তোরা।
একদিন নয় বিষাদ ভুলিয়া
সকলে মিলিয়া গাইব মোরা।
৪. ভালোবেসে যদি সুখ নাহি
তবে কেন মিছে ভালোবাসা।

এইসব গানের ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে গোপিনীদের সঙ্গে কৃষ্ণের প্রণয় সম্পর্ক মধুর থেকে আরো মধুরতর হয়ে ওঠে। ব্রজভূমিতে যে জীবননাট্যের সূচনা হয়েছিল দ্বারকাতে ঘটল তার পরিসমাপ্তি। কৃষ্ণের শেষ জীবন রাজনীতির কুটিল আবর্তে পঙ্কিল হয়ে গেছে। যাদবদের ভোগস্পৃহা, অন্তর্দ্বন্দ্ব, আত্মকেন্দ্রিকতা যদুবংশকে খাদের কিনারে নিয়ে এসেছে। তিনি বংশের পরিণতির কথা ভেবে শিহরিত। তাঁর যাবতীয় কৃতকর্ম আত্মগ্লানি ডেকে এনেছে। দিনের পর দিন তাঁর নিদ্রাহীন রাত্রিযাপন শরীর-মনকে উত্তপ্ত করে রেখেছে। মনের সেই বিষাদখিন্নতা থেকে মুক্তি মেলে কেবল বৃন্দাবনের রঙ্গপ্রিয় গোপিনীদের কথা ভাবলে। এইটুকু তাঁর জীবনে স্বপ্নলোক। এই মাধুর্যটুকুই আজ বাঁচিয়ে রেখেছে তাকে। সেইজন্য উপন্যাসে বারবার কৃষ্ণের মন বর্তমান দ্বারকা থেকে ছুটে গেছে অতীতের বৃন্দাবনের যমুনাতীরে। তাঁর প্রৌঢ় মনের মধ্যে তিনি নির্মাণ করতে চেয়েছেন সেই মধুবন, মিলনকুঞ্জ, প্রেম-আশ্লেষে ভরা বৃন্দাবন। বস্তুত কৃষ্ণের কল্পনালোকই হয়ে ওঠে এ উপন্যাসের উপজীব্য। তাই এর ভাষা এতো আবেগময়, এতো কাব্যিক।

কৃষ্ণের মতো শ্রীমতী রাধাকে কেন্দ্রে রেখে দীপক চন্দ্রের আর এক পুনর্নির্মাণ 'যদি রাধা না হত'। এ উপন্যাস প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯৫-এ। লেখক ভূমিকার বদলে

লিখেছিলেন 'দৃষ্টিকোণ', যার কৌণিক আলোকসম্পাতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এ কল্প-কাহিনির অভিমুখ। এর আগে তিনি কৃষ্ণকে বর্ণময় উপস্থাপনে হাজির করেছিলেন 'শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম', 'মন-বৃন্দাবন' কিংবা 'ইন্দ্রপ্রস্থে শ্রীকৃষ্ণ'-এর মতো উপন্যাসে। সেখানে রাধার উপস্থিতি প্রায় নেই বললেই চলে। কেননা 'মন-বৃন্দাবন' ব্যতীত বাকি দুটির কাহিনি-উৎস ছিল মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ কিংবা শ্রীমদ্ভাগবত। এগুলি মোটামুটি রাধাবর্জিত। বরং পুরাণগুলির মধ্যে রাধার প্রসঙ্গ ব্যাপক পরিমাণে আছে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে। আর আছে প্রাকৃতপৈঙ্গলে, গীতগোবিন্দে এবং বাংলা ও ব্রজবুলিতে লেখা বৈষ্ণব পদাবলিতে। এগুলিতে তিনি শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণপ্রেয়সী হিসেবে পরিচিত। এই পরিচিতিতেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে রাধা কথিত হলেন পুরুষোত্তম কৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তি হিসেবে। গড়ে উঠল রাধাতত্ত্ব। অর্বাচীন পুরাণে রাধাকে নিয়ে অনেক গল্পও ফাঁদা হল। কোথাও তিনি ব্রজের রাজা বৃষভানুর কন্যা, তাঁর জননী ভলন্দরের কন্যা কলাবতী। আবার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকারের মতে, রাধার পিতা সাগর গোপ, জন্মেছেন পদুমা বা পদ্মিনীর গর্ভে। এই লোকায়ত রাধা সম্পর্কে কৃষ্ণের মাতুলানী, যার বিবাহ হয়েছে আইহন বা আয়ান ঘোষের সঙ্গে। আয়ান নপুংসক। এমনকি আয়ানের নপুংসকতার দৈবী-কারণও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আয়ান পূর্বজন্মে ছিলেন একজন মুনি। তিনি সুদীর্ঘকাল গভীর তপস্যায় নিয়োজিত থেকে ভগবান বিষ্ণুকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করেন। বিষ্ণু প্রসন্ন হয়ে বর দিতে চাইলে মুনি বললেন, তিনি তাঁর পত্নী দেবী লক্ষ্মীকেই স্ত্রীরূপে পেতে চান। এই কথা শুনে স্তম্ভিত বিষ্ণু প্রতিশ্রুত বর প্রদান করে বললেন, তথাস্তু। পরজন্মে তুমি আমার পত্নী লক্ষ্মীকে পত্নীরূপে লাভ করবে। তবে তোমার জন্ম হবে এক নপুংসক রূপে। এই নির্মম অভিশাপই ছিল হতভাগ্য আইহনের অখণ্ডনীয় বিধিলিপি। অন্যদিকে রাধা যে কলঙ্কিনী রূপেই সর্বজন পরিচিতা, তার পিছনেও ছিল একটি অভিশাপ। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে আছে, গোলোকধামে রাধা কৃষ্ণের প্রিয়া। কিন্তু কৃষ্ণ কিছুকাল বিরজা নামে অন্য এক দেবীর সঙ্গে বিহার করায় রাধা কৃষ্ণকে অভিশাপ দেন, তুমি গোলোক ত্যাগ করে বৈকুণ্ঠে গিয়ে অবস্থান করো। তখন কৃষ্ণের ভক্ত অনুচর শ্রীদাম রাধাকে ভৎর্সনা করেন। তাতে রাধা ক্রুদ্ধ হয়ে শ্রীদামকে অভিশাপ দেন, তুমি পৃথিবীতে অসুর হয়ে জন্মাবে। তখন শ্রীদামও রাধাকে পাল্টা অভিশাপ দেন, তুমি পৃথিবীতে মানবী হয়ে জন্মাবে ও তোমার কলঙ্কিনী নাম হবে। এই পুরাণে এটাও জানানো হয়েছে যে, কৃষ্ণের তুলনায় রাধা বয়সে যথেষ্ট বড়ো। একদিন গোচারণে গিয়ে নন্দ ঝড়বৃষ্টির কবলে পড়লেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শিশু কৃষ্ণ। গরুগুলিকে যথাযথভাবে সঞ্চালিত করার জন্য কাছাকাছি রাধাকে দেখতে পেয়ে কৃষ্ণকে দেখভাল করার জন্য তার হাতে তুলে দিলেন। রাধা তাকে নিয়ে নির্জন যমুনার তীরে গেলেন এবং সেখানে কৃষ্ণ মনোহর মূর্তি ধরলেন। সেই দুর্লভ মুহূর্তে প্রজাপতি ব্রহ্মা এসে কৃষ্ণ ও রাধার বিবাহ দিলেন। দীপক চন্দ্র আক্ষেপ করেছেন, 'রাধার পূর্ণাঙ্গ জীবন-বৃত্তান্ত নিয়ে কার্যত কোন বই নেই' বলে। রাধা ও কৃষ্ণকে ঘিরে একটা অশালীন ধারণা গড়ে উঠেছে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে ভিত্তি করে। পদাবলি সাহিত্যও নাকি পিছিয়ে নেই। সেখানে আছে দুইয়ের প্রণয়ে দাহ, জ্বালা, যন্ত্রণা, দুঃখ, উৎকর্ণ উৎকণ্ঠা, ভয়, নিন্দা। দুজন রক্তমাংসের মানব-মানবীর মধ্যে যে দৈহিক

চাওয়া-পাওয়া, যেন তারই বাস্তবঘন রূপ আঁকা হয়েছে মহাজনদের পদে। তাই সে সম্বন্ধ আত্মদানের সংকীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করতে পারেনি। ঔপন্যাসিকের মতে, এই সংকীর্ণতা রাধা-কৃষ্ণের প্রেমে ভক্তির নামে কদর্য দেহবদ্ধ প্রেমের এক নির্লজ্জ রুচিবিকার আমদানি করেছে।

এই উপন্যাস রাধা-কৃষ্ণের চিরায়ত প্রেমকাহিনিকে আধুনিক পৃথিবীর উপযুক্ত করে পেশ করা হয়েছে। দীপক লিখেছেন : 'বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে পৃথিবী এবং জীবনবোধ বদলে যাচ্ছে দ্রুত। সেই পরিবর্তিত জীবনবোধের সঙ্গে অন্বিত করে রাধা-কৃষ্ণের কালজয়ী প্রেমের বংশীধ্বনি করেছি। বংশীধ্বনি কৃষ্ণপ্রেমের সজীব প্রতীক। বাঁশীর সুরে রাধা তাই আকুল হয়। ভেদজ্ঞান লুপ্ত হয়। সংসার বন্ধন তার তুচ্ছ হয়ে যায়। রাধার নিদ্রিত সত্তার ঘুম ভাঙে। আত্মার ভেতর, সমস্ত অনুভূতি ও উপলব্ধির ভেতর খোঁজে সে তার কৃষ্ণকে। এই অন্বেষণের সূত্র ধরে বর্তমান থেকে অতীতে, অতীত থেকে বর্তমানের ভেতর নিরন্তর পরিভ্রমণ করেছে সে। আর সেই সূত্রেই তার আত্ম-অন্বেষণ সম্পূর্ণ হয়েছে।'

'মন-বৃন্দাবন'-এর কৃষ্ণের মতো 'যদি রাধা না হত' উপন্যাসের নায়িকা রাধা চল্লিশ-উত্তীর্ণ বয়সে এসে তার কিশোরী জীবনকে দেখছে। সেই স্মৃতি রোমন্থনে মিশে যাচ্ছে কৃষ্ণের সঙ্গে তার প্রণয়ের সুখানুভূতি। বংশীবাদনরত কৃষ্ণ তার মনে অপূর্ব মোহ জাগায়। আয়ান-ঘরণীর কানে এসে আছড়ে পড়ে বাঁশির মোহন সুর। তার বুকের ভেতর বাজতে থাকে জলপ্রপাতের শব্দ। মুগ্ধতা নামে রাধার দু'চোখ জুড়ে। কৃষ্ণ কাছে আসে। শোনায় প্রণয়গুঞ্জন। রাধা শান্ত গলায় বলে, আমি তো চাই তোমাকে। কথাটা বলেই থমকায় রাধা। সে তো অন্যের বিবাহিতা স্ত্রী। স্বামী ছাড়া আর কি কেউ তার আপনজন হতে পারে! কৃষ্ণ তার হাতটা চেপে ধরে নিজের মুঠোর মধ্যে। সেই স্পর্শে রাধা যেন যুগান্তরের ঘুম থেকে জেগে ওঠে। কৃষ্ণ দুহাতে রাধাকে বুকে টেনে নেয়, চুম্বনে উদ্যত হয়। রাধার শরীরে যেন নিবিড় সুখের উল্লাস বয়ে চলে। 'বিস্রস্ত আঁচল বেশবাস ঠিক করে নিতে নিতে রাধার মনে হল তার কাছে গোটা পৃথিবীর অর্থটা বদলে গেছে। কৃষ্ণের ভালবাসায় মন কানায় কানায় ভরে গেছে। মনে আর একটুও পাপবোধ নেই। অনুশোচনাও নয়। আর এসব হবেই বা কেন? ভালোবাসায় তো কোন পাপ নেই। ভালবাসাই ঈশ্বর।'

এমনিভাবেই শুরু হয় 'যদি রাধা না হত'। রাধার মধ্যে ক্ষীণ অপরাধবোধ লুপ্ত হয়ে জাগতে থাকে প্রেমের মহিমার কথা। শোবার ঘরে তার স্বামী আয়ান ঘুমুচ্ছে অঘোরে, নিশ্চিন্তে। কী গভীর প্রশান্তি মাখানো তার মুখ। স্ত্রীকে পরিপূর্ণ বিশ্বাস করে সে। কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার সব সম্পর্কই তার জানা। তবু রাগ নেই, ঘৃণা নেই। সেই আয়ানের আজ বয়স হয়েছে। মাথা জুড়ে কাঁচা-পাকা ঢেউখেলানো কোঁকড়া চুল। সুদর্শন। যৌবনের শ্রী দেহ থেকে হারিয়ে যায়নি। চল্লিশোত্তর রাধা চাঁদের আলোয় স্বামীর মুখ দেখছিল। সেদিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে অতীতে ফিরে গেল। তার বিয়ে নিয়ে মা কীর্তিদা চিন্তিত। বাবা বৃষভানু গা করেন না। কীর্তিদা বয়স্কা মেয়েকে পার করতে পারলেই বাঁচেন। তাঁর সই যশোদা একটা ভালো সৎপাত্রের সন্ধান দিয়েছেন। সে আয়ান। নাম শুনেই বৃষভানু কুপিত হন। নিজের সুন্দরী মেয়েকে এমন ব্যক্তিত্বহীন পুরুষের হাতে তুলে নিতে তিনি নারাজ। শেষ অব্দি রাধার সঙ্গে বিয়ে হল বটে আয়ানের, কিন্তু স্বামী তার রইল দূরে দূরে।

বিয়ের রাতেই স্বপ্নভঙ্গ হল রাধার। নিদারুণ মর্মযন্ত্রণায় তার সব কিছু এলোমেলো হয়ে গেল।

এমনই রক্তমাংসের মানবী রাধাকে আমরা পাই গোটা উপন্যাস জুড়ে। রাধার বিবাহিত জীবনকে কেন্দ্র করে ঔপন্যাসিক একটার পর একটা কল্পিত ঘটনার জাল বুনে গিয়েছেন। নপুংসক আইহনের মধ্যে অবরুদ্ধ যে জীবন-বাসনা তারও প্রকাশ ঘটিয়েছেন। আয়ান রাধাকে জানিয়েছে, তার সঙ্গে রাধার বিয়ের কথাবার্তা চালাচালির সময় থেকে কেমন একটা অনুরাগ আর ভালোবাসা জন্মেছিল হৃদয়ে। কল্পনায় কত প্রেম মান অভিমান করেছে সে রাধার সঙ্গে। শুভদৃষ্টির মুহূর্ত থেকে সে সবকিছু দিয়ে ফেলেছিল রাধাকে। ফুলশয্যার রাতে জানলার গরাদ ধরে দাঁড়িয়েছিল আয়ান। আশাভঙ্গের বেদনায় সে রাধাকে বলেছিল — 'আমার প্রথম যৌবন থেকে একটা মেয়েকে স্বপ্ন দেখে আসছি, কল্পনা করে আসছি, বুকের ভেতরটা তার সুগন্ধে ভরপুর। এই পেতে চাওয়া, এই মিলনবাসনা হঠাৎ একদিনের নয়। তোমাকে স্ত্রীরূপে পাওয়ার পরেই আমার সেই দুকূল ছাপানো ভালবাসার পুকুর যদি প্লাবিত হয়, তাহলে অপরাধ কোথায়? ভালোবাসা মানেই শরীর। যাকে ভালবাসি তাকে যদি শরীর দিয়ে বুঝতে না পারলাম কিসের ভালবাসা? ... কোনো দিন শুনেছ, ধূপধুনো দিয়ে ফুল দিয়ে পুজো করার জন্যে কেউ বিয়ে করেছে?' এসব কথা শুনেও বারো বছরের রাধার হৃদয়-কোরক প্রস্ফুটিত হয়নি, তার শরীরের ঘুম ভাঙেনি। বদলে আয়ানের ঘুম ভাঙল রাধার গুনগুন গান শুনে। ঘুম থেকে যেন জেগে উঠল এক অন্য আয়ান, যে গতরাত্রির নয়। তারপর ধীরে ধীরে রাধাকে বলল, 'তোমার আশ্চর্য সুন্দর সংযম, স্থৈর্য, নীরবতার বাণী আমার মনের আবরণ খুলে চিনিয়ে দিল আমাকে। তুমি আমার সত্তার ঘুম ভাঙিয়েছ। আমাকে চিনিয়েছ কে আমি?' এরপর রাধাকে সে এক স্বপ্ন-বিবরণ বলে, যেখানে তার পূর্বের ঋষিজন্ম, বিষ্ণুর বর ও অভিশাপপ্রাপ্তি দুই-ই আছে।

বস্তুত এ উপন্যাসে রাধার পাশাপাশি আয়ান একটি সুসম্পূর্ণ চরিত্র হয়ে উঠেছে। তার আবেগ, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সংকোচ, আর্তি, ভালোবাসা, স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা সব যেন ভয়ঙ্কর মূর্ত। সে জানে কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার সম্পর্ক। কিন্তু মনে এ নিয়ে কোনো ক্ষোভ, ক্রোধ কিংবা ঈর্ষা নেই। সে রাধা কৃষ্ণের মিলন পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে চায়নি। রাধাকে সে সত্যই ভালোবাসে, দেহহীন সেই ভালোবাসা। সেই ভালোবাসার তত্ত্বকথা শুনিয়েছে সে রাধাকে; বলেছে, 'শরীর যখন শরীরের উপর দখল নেয় তখন আর প্রেম থাকে না।' সে হয় হিংস্র পাশবিকতা। পৌরুষের আদিমতম কদর্য ঔদ্ধত্যকে প্রেম বলে না।....প্রেম পুজোর ফুল। আর সে ফুলের কীট হল কাম। কীট ফুলের শোভা নষ্ট করে, কাম প্রেমের মহিমা এবং গৌরব স্বার্থে মলিন করে।' এসব কথা শুনে রাধা অভিভূত হয়। সে অনুভব করে মেঘের মধ্য দিয়ে উড়ে যাওয়ার অনাবিল আনন্দ। আয়ানকে শরীর দিয়ে গ্রহণ করতে না পারলেও তার মনোজ প্রেমে সে তৃপ্ত, আনন্দিত।

আয়ানের মতো আরো দুটি অপ্রধান চরিত্র ঔপন্যাসিকের কলমে দারুণ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এরা আয়ানের ভগিনী কুটিলা ও ভগিনীপতি শতানন্দ। কুটিলা-প্রসঙ্গ পদাবলি সঞ্জাত। সে রাধার কুখ্যাত ননদিনী বলেই সকলের চেনা, যে প্রতিমুহূর্তে রাধার ব্যভিচারিতার সাক্ষ্য সংগ্রহে উন্মুখ। কিন্তু উপন্যাসে আদৌ কুটিলার এই কূটস্বভাবকে তুলে ধরা হয়নি। কুটিলা যেন এখানে তার স্বামী কর্তৃক প্রবঞ্চিতা এক নারী। স্বামী থাকতেও তাকে বিধবার

মতো নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে হয়। তা দেখে রাধার মনে খুব কষ্ট। কুটিলা এসে মাঝে মাঝে তার মন্দভাগ্যের কথা বলে রাধাকে, সে বোধহয় সান্ত্বনা খোঁজে ভ্রাতৃবধূর। কিন্তু তার মন্দভাগ্যের পিছনে কুটিলার নিজেরও দায় কম নেই মনে হয়। শতানন্দের সঙ্গে দাম্পত্যজীবনে কুটিলা যে আচরণ করেছে তাতে শতানন্দ ক্ষুণ্ণ, ব্যথিত। এই শতানন্দ লেখকের একেবারে নিজস্ব সৃষ্টি। তাকে কোথাও পাই না। বায়বীয় উৎস থাকা সত্ত্বেও শতানন্দ যেভাবে এখানে উপস্থাপিত, তাতে ঔপন্যাসিককে ভূয়সী প্রশংসা করতেই হয়। শতানন্দ এখানে এক দরিদ্র ঘরের সন্তান। মেধাবী। বিদ্যার্জনের জন্য সে ঠাঁই পেয়েছিল কুটিলাদের বাড়িতে। শতানন্দ রূপবান। কুটিলার গায়ের রঙ ফর্সা না হলেও দেখতে খাসা। একই বাড়িতে থাকবার সুবাদে দু'জনের ভিতর একটা হৃদয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আয়ানের মা জটিলা শতানন্দের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন মনস্থ করেন। নির্দিষ্ট সময়ে দু'জনের বিয়েও হয়ে যায়। শতানন্দ ঘরজামাই হয়ে থাকতে শুরু করে কুটিলাদের বাড়িতে। তাদের দশ বছরের দাম্পত্য, তবুও কুটিলা সন্তানহীনা। হয়তো সে কারণেই নিত্য অশান্তি লেগে ছিল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। শতানন্দ কুটিলাকে সহ্য করতে পারছিল না। কুটিলা ঘরে ঢুকলেই শতানন্দ বাইরে বেরিয়ে যেত। জটিলার সঙ্গেও সে কথা বলত না। বলত শুধু 'বৌঠান' রাধার সঙ্গে। সে রাধার কাছে নিজের মনের দুঃখ-যন্ত্রণার কথা উজাড় করে দিয়েছিল। তা থেকে উপন্যাসের পাঠক জানতে পারে, কুটিলাকে শতানন্দের কোনো দিনই ভালো লাগেনি। কিন্তু যে পরিবারের আশ্রিত সে, তাদের প্রতি একটা কৃতজ্ঞতা ছিল। সে বলে, 'অন্নের ঋণ শোধ দিতে ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে করেছি তাকে।' একথা শুনে রাধা যখন বলে যে, জীবন তো একটাই, সেই জীবনকে নয়-ছয় করা উচিত নয়, তাহলে সে যদি অবুঝ হয় কুটিলার জীবনটাই কানা হয়ে যাবে; তখন শতানন্দ কুটিলার আর একটি আচরণের প্রসঙ্গ তুলল। সে বড়ো দেমাকি। শতানন্দ যে তাদের সংসারে আশ্রিত, তাদের কৃপা অনুগ্রহ পেয়ে বড়ো হয়েছে, কথায় কথায় সে-খোঁটা দিতে পিছপা হয় না। দাম্পত্যে ফাটল ধরেছে এ পথ ধরেই। তাই বিশ্বাসের জায়গায় সন্দেহ, প্রীতির জায়গায় শত্রুতা। তার সবচেয়ে দুর্বল স্থানে কুটিলা যেভাবে চাবুক মারে তাতে শতানন্দ ব্যথিত। শতানন্দ তাই আর ঘরে থাকতে চায় না। এই সংসারে যে তাকে সবচেয়ে বোঝে সেই রাধাকে নিয়ে অন্যত্র পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হয় তার। তার প্রতি দরদী রাধাকে এক দুর্বল মুহূর্তে সে বলে, 'বৌঠান, এই মিথ্যে জীবনের বাঁধন ছিঁড়ে চল আমরা পালিয়ে যাই অন্য জীবনের আলোকিত প্রান্তরের দিকে। পারবে? সাহস হবে কি পালানোর! বৌঠান, তুমি না গেলেও আমি পালাব।' সত্যিই, শতানন্দ সংসার ছেড়ে চলে যায় একদিন। পাগলের মতো পথে পথে ঘোরে। মদের নেশায় ভুলতে চায় জীবনের যতো অপ্রাপ্তি, গ্লানি। আর স্বামী চলে যাওয়ার পর কুটিলা ক্রমশ বদলায়। সে এতদিনে বুঝতে পারে স্বামীর মর্ম। সেও আসে রাধার কাছে, স্বামীহীন রুক্ষ জীবনের বেদনা উগরে দিতে। সে দোষ দেখে শতানন্দেরই, যে পথে পথে ঘুরে অন্য নারীসঙ্গ করে প্রায় উন্মত্তের মতো জীবন কাটাচ্ছে। মথুরার পথে একদিন তার চোখে পড়েছিল অপ্রকৃতিস্থ শতানন্দকে, যে পানশালা থেকে বেরিয়ে আসছে। তাকে দেখে আরো বেশি করে মাতলামি করতে শুরু করে, এমনকি একটি সুন্দরী বারবনিতার কোমর জড়িতে হাসতে হাসতে কুটিলার সামনে থেকে চলে যায়। কুটিলার অন্তর দগ্ধ হতে থাকে। ননদিনীর এই বিপর্যস্ত

অবস্থা রাধাকেও পীড়িত করে। কুটিলা তার ক্ষোভ দুঃখ যন্ত্রণা উগরে দেয় রাধার কাছে। বলে, 'বৌঠান, এক নারীতে চিরজীবন আসক্ত থাকা বোধহয় পুরুষের ধর্ম নয়। পুরুষ যা খুশী করে বেড়াতে পারে, আর আমরা নারী বলেই কি যত দোষ?' এ প্রশ্ন বোধহয় শুধু একা কুটিলার নয়, ঔপন্যাসিক এ স্বরের মধ্যে ধ্বনিত করে তুলেছেন পুরুষতন্ত্রের দাপটে কোণঠাসা সমস্ত মেয়েদের অভিযোগকে। এভাবেই 'যদি রাধা না হত' হয়ে ওঠে পুরাণকথার ছদ্মবেশে আধুনিক জীবনের আখ্যান। পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে নারীর প্রতিবাদ, কিংবা নারীর অবজ্ঞা-অবহেলার বিরুদ্ধে পুরুষের প্রত্যাখ্যান এ উপন্যাসের একটা বড়ো অংশ জুড়ে থাকে। দীপক চন্দ্র এইখানেই সত্যসত্যই পুরাণের নবনির্মাতা।

আর একটি প্রসঙ্গের উত্থাপন করে এ আলোচনায় ছেদ টানব। রাধার সঙ্গে আয়ানের সম্পর্কে আয়ানের প্রেমচেতনাকে আমরা দেখেছি। ঔপন্যাসিক এই নপুংসক মানুষটির মধ্যে তার আরো একটি দিক উজ্জ্বল করে তুলেছেন। সেটি তার দেশচেতনা। এ উপন্যাসে আয়ান সচেতন এক নাগরিক। কংসের শাসনে-ত্রাসনে গোটা রাজ্যের মানুষ ত্রস্ত, বিপন্ন। সে তার অনুচরদের পাঠিয়ে বৃন্দাবনের ঘরে ঘরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নেমেছে নন্দের ছেলে কৃষ্ণ। কৃষ্ণ অতি অল্পবয়সী, কিন্তু কী তার শক্তি, তেজ, বিক্রম। আয়ান তা দেখে অভিভূত হয়ে যায়। সে মনে করে কংসের অত্যাচার থেকে যদি কেউ দেশকে মুক্ত করতে পারে তো সে এই কৃষ্ণ। আয়ানের মা জটিলা জেনেছেন এই কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর পুত্রবধূ রাধার সম্পর্কের কথা। তা নিয়ে পুত্রকে যখন বলেন, আয়ান সে-কথার প্রতিবাদ করে বলে, 'না, মা। কৃষ্ণ বৃন্দাবনের আশীর্বাদ। তার নামে অপবাদ দিও না। সব দোষ কংসের। কংস দেশটাকে রসাতলে নিয়ে যাচ্ছে। তার সর্বদা ভয় দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তানকে।' একই সঙ্গে আয়ান জটিলাকে জানায়, কংস বালক কৃষ্ণকে কব্জায় আনতে পারছে না বলে রাজা অক্ষম ক্রোধে সাধারণ মানুষের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলছে। কৃষ্ণের যারা শক্তি সেই বৃন্দাবন ও মথুরার তরুণ-তরুণীদের উশৃঙ্খল অসামাজিক জীবনের দিকে ঠেলে দিতে যত্রতত্র পানশালা তৈরি করেছে। এদের প্রলুব্ধ করতে অভাব নেই দেহপসারিণী নারীদের। এভাবেই কংস চাইছে দেশের যুবসমাজের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে। দেশের এই আকালে কৃষ্ণ এসেছে রক্ষাকর্তা, মুক্তিদাতা হিসেবে। আয়ান এর সঙ্গে জুড়ে দেয় শাস্ত্র থেকে পাওয়া একটা ধর্মতাত্ত্বিক কারণও। সে তার মাকে বলে, 'লক্ষ্মীছাড়া হয়ে কমলাপতি আর কতকাল একা স্বর্গলোকে থাকবে? বিরহ সইতে পারেন না শ্রীহরি। তিনি যে সদা আনন্দময়।.... বিশ্ব পৃথিবী জুড়ে এই সুর। সকলে মিলতে চায়, কেউ একা থাকতে চায় না। একা থাকার বড়ো কষ্ট। বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ লক্ষ্মীবিরহ সইতে না পেরে এই মর্তের মাটিতে নেমে এসেছেন। বৃন্দাবনের মাটিতে পড়েছে তাঁর পায়ের ধূলো।' এ কোন্ আয়ান? একে কি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাওয়া যায়? বৈষ্ণব পদাবলিতে? এ ঔপন্যাসিকের একেবারে নিজস্ব নির্মাণ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ছিল ভূভার হরণের জন্য বৈকুণ্ঠপতির মর্ত্যে আগমনের কথা, আর তাঁর সঙ্গদেবার জন্য লক্ষ্মীর রাধারূপে অবতীর্ণ হওয়ার কথা। সেখানে বয়সে কৃষ্ণই জ্যেষ্ঠ, রাধা কনিষ্ঠা। কিন্তু এ উপন্যাসে যেন রাধার জন্ম আগে, বিরহ-দুঃখ দূর করতে পরে শ্রীভগবানের আগমন। কৃষ্ণকথার এক সার্থক পুনর্নির্মাণ হিসেবে এ উপন্যাস অবশ্যই বিবেচিত হতে পারে।

২০১৬। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুথি প্রকাশের শতবর্ষ। সেই উপলক্ষ্যে একটু ফিরে দেখা। বড়ু চণ্ডীদাসের এ এমন একটি বই, যা প্রকাশের পর থেকেই বিতর্কের শিরোনামে। এর গ্রন্থনাম নিয়ে বিতর্ক, কবির অভিপ্রায় নিয়ে বিতর্ক, বিতর্ক কৃষ্ণের মতো পুরাণ-পুরুষের চারিত্রিক অবনমন ঘটানো নিয়েও। বইয়ের প্রথম ও শেষ পাওয়া যায়নি, এ নিয়েও গল্পখোর পাঠকের অতৃপ্তি থেকে যায়। কাহিনি কি শেষ হয়েছিল মিলনে, না বিচ্ছেদে? সে নিয়ে অনেক প্রশ্ন। প্রশ্ন, রাধাবিরহ কি বড়ুর নিজেরই লেখা, না কি পরবর্তী কালের সংযোজন? আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের একাধিক শাখা গড়ে উঠেছে। এমনকি কৃষ্ণকথা নিয়ে ভাগবতের অনুবাদও হয়েছে একগুচ্ছ। কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণের প্রণয়কথা নিয়ে যে লোকায়ত ধারার জন্ম দিলেন, সে পথে দ্বিতীয় কোনো পথিককে খুঁজে পাওয়া গেল না। বিশ শতকে বিদ্যায়তনিক বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের চর্চা শুরু হল আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের হাতে। তিনি তাঁর সাহিত্যের ইতিহাসে বড়ুকে উপেক্ষিতই রাখলেন। ১৯১৬-র পর তাঁর জীবিতাবস্থাতেই আরো তিনটি সংস্করণ হয় 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' - এর, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আলোচনা একটাতেও ঠাঁই পেল না। তাঁর একটাই বক্তব্য, চণ্ডীদাস বহু নন, এক ও অভিন্ন। ভক্তিভাবে বিগলিত হয়ে যিনি সুমধুর সুললিত পদ লিখেছিলেন, তাঁরই রক্ততরল যৌবনের কীর্তি আদিরসে ভরা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। এই গ্রন্থের পুনর্নির্মাণে যে তিনজন ঔপন্যাসিককে পাওয়া গেল, তাঁরা তিনজনই বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কলম ধরেছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একজন সফল সাহিত্যিক। তাঁর কলম কবিতায়, উপন্যাসে, গল্পে সমান সচল। লেখায় মেধার ছাপ স্পষ্ট। তাঁর উপন্যাসটিই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যথার্থ পুনর্নির্মাণ। কাব্যের অনেক খণ্ডের কাহিনি, পদপঙ্‌ক্তি সরাসরি উপন্যাসে জায়গা করে নিয়েছে। অন্যদিকে শঙ্করীপ্রসাদ বসু স্বনামখ্যাত একজন অধ্যাপক। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিশেষজ্ঞ। তাঁর 'কৃষ্ণ' উপন্যাস বিশেষ ধরনের পাঠকের জন্য লেখা। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের জন্মখণ্ডে ও কালীয়দমনখণ্ডে পরিবেশিত বিষয়সমূহ তাঁর লেখায় উঠে এসেছে। তিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের তুলনায় বোধহয় বেশি আশ্রয় করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণবিজয়, যেখানে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যমূর্তিটি অধিকতর পরিস্ফুট। আর দীপক চন্দ্র একজন পরিশ্রমী লেখক। আগের দু'জনের মতো জনপ্রিয় না হলেও বাংলা পৌরাণিক উপন্যাসের ধারায় তিনি একটি বিশিষ্ট নাম। তাঁর দুটি উপন্যাসেই রাধাকৃষ্ণের প্রেমপ্রসঙ্গ বড়ো জায়গা জুড়েছে। তবে তিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পাশাপাশি বৈষ্ণব পদ ও রবীন্দ্র-কবিতার আশ্রয় নিয়েছেন। অনেকাংশে গল্পও গড়ে তুলেছেন নিজের চাহিদা ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী। এতে নবনির্মিতির চমৎকার অবকাশ সৃষ্টি হয়েছে। গত একশো বছরে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনি ও চরিত্রের এই 'লিগ্যাসি' আজকের পাঠকের কাছে নতুন আবেদন সৃষ্টি করে। অদূর ভবিষ্যতই বলবে একবিংশে ধেয়ে আসা এই ঐতিহ্য আরো কতটা পথ হাঁটবে সৃষ্টিশীল লেখনীর হাত ধরে।

# বনফুলের 'তাজমহল' : শৈলীগত পাঠ

ড. বিভাবসু দত্ত*

কিছু কিছু জিনিসের প্রতি এক অমোঘ্য আকর্ষণ অনুভব করি আমরা আর সেই জিনিসটিকেই ঘিরে কল্পনা আর বাস্তব জড়িয়ে সৃষ্টি হয় এক মায়াবি জগৎ। তাজমহল আমাদের কাছে এরকমই একটি আকর্ষণের বস্তু নিশ্চিতভাবেই। আমাদের আকর্ষণের কেন্দ্রভূমিতে আছে যে তাজমহল সেই তাজমহলের অন্তর্নিহিত বার্তা, প্রেমের চিরন্তনতা, তাকে নিয়েই বনফুল রচনা করেছেন এই আশ্চর্যসুন্দর ছোটগল্পটি। এই গল্পে তাজমহল 'বস্তুর' বন্ধন কাটিয়ে চিরন্তন প্রেমের প্রতীক হয়ে গেছে। 'তাজমহল' গল্পে বনফুল এক নতুন মাত্রা যোজনা করেছেন — ব্যক্তি সাজাহানের প্রেমকে গল্পকার সমস্ত মানুষের চিরন্তন প্রেমে পৌঁছে দিয়েছেন যেখানে ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নীচু কোনো ভেদ নেই। তর্কবিজ্ঞানের ভাষায় এই প্রেম বিশেষ থেকে পৌঁছে যায় সামান্যে।

পনেরোটি অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত 'তাজমহল' গল্পটি স্পষ্টত দুটি অংশে বিভক্ত। গল্পকার দুটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন এই গল্পটিকে। চিহ্নহীন দুটি পরিচ্ছেদের বিভক্ত করেছেন এইগল্পটিকে। চিহ্নহীন দুটি পরিচ্ছেদের মধ্যে সাদা অংশ ব্যবহার করে গল্পটির বিভাজন করা হয়েছে। প্রথম অংশটি গল্পের প্রবেশক। এটিকে আমরা ভূমিকাও বলতে পারি। মূল কাহিনিতে প্রবেশের মূল গল্প। এখানে একটি আবহ সৃষ্টি করেছেন গল্পকার। দ্বিতীয় অংশটি অবশ্য মূল গল্প। 'তাজমহল' গল্পটি সোপানোরোহ পদ্ধতিতে এগিয়েছে। দীর্ঘ সময়প্রবাহের গল্প এটি।' 'তারপর অনেকদিন কেটেছে—' এই বাক্যবন্ধটি দিয়েই সূচনা হয়েছে দ্বিতীয় অংশটির। গল্পকথকের প্রেক্ষণবিন্দুতে নির্মিত হয়েছে এই 'তাজমহল' গল্পটি; এই প্রেক্ষণবিন্দুর কোনো স্থানান্তরণ ঘটেনি এখানে।

অনেকটা সময় বিস্তৃত এই গল্পের সময়কাল। গল্পের বিভিন্ন যায়গায় এই সময়কে উল্লেখ করা হয়েছে : (১) প্রথম যখন আগ্রা গিয়েছিলেন তাজমহল দেখতেই। (অনু : ১)। (২) তারপর অনেকদিন কেটেছে। (অনু : ৬) (৩) সে দিন 'আউট-ডোর সেরে বারান্দায় নামছি, (অনু : ৮)। (৪) এভাবেই চলছিল। (অনু : ৯)। (৫) একদিন মুষলধারে বৃষ্টি নামল। (অনু : ১০)। (৬) পরদিন দেখি গাছতলা খালি। (অনু : ১৩)। (৭) আরো কয়েকদিন পরে — (অনু : ১৪) এভাবেই চিহ্নিত হয়েছে সময়ের বিস্মৃতি।

'তাজমহল' গল্পটিকে সানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাব এই গল্পটি পাঁচটি স্তরে বিভাজিত। প্রথম স্তরে আছে গল্পকথকের তাজমহল দেখার অভিজ্ঞতা। এক থেকে পাঁচ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত তাজমহল দর্শনের অভিজ্ঞতা। গল্পকথকের তাজমহল দর্শনের দুটি বিপ্রতীপ প্রতিক্রিয়ার সমবায়ে গড়ে উঠেছে 'তাজমহল' গল্পের সূচনাটি। গল্পের প্রথমেই উপস্থাপন

*অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়।

করা হয়েছে পরপর দু-দিনের দুটি বিপরীত অভিজ্ঞতার ঘটনা। এই দিন দুটিকে গল্পকথক স্পষ্ট চিহ্নিত করে দেন দুটি বাক্যে :

১. 'প্রথম দর্শনের সে বিস্ময়টা এখনও মনে আছে।'

২. সেই দিন সন্ধ্যার পর দ্বিতীয়বার দর্শন করতে গেলাম তাজমহলকে।'

প্রথম দর্শনে প্রেম — এই যে বহু প্রচলিত কথাটি তাজমহল দর্শনে মিথ্যে হয়ে যায় গল্পকথকের কাছে। 'তাজমহলকে ঘিরে বহুদিনের গড়ে ওঠা মিথ এক নিমেষেই ভেঙে চুরমার হয়ে যায় কথকের ট্রেনের জানালা দিয়ে মুখবাড়িয়ে তাজমহল দেখে — গল্পকথকের স্বপ্নভঙ্গ হয়। কথকের কথায় : ''দূর থেকে দিনের আলোয় তাজমহল দেখে দমে গেলাম। চুনকাম-করা সাধারণ একটা মসজিদের মতো! ঐ তাজমহল? তবু নির্নিমেষে চেয়ে রইলাম। হাজার হোক তাজমহল।" (অনুচ্ছেদ: ৩) গল্পকথকের এই প্রতিক্রিয়ার স্বপ্নবিলাসী পাঠক নিশ্চিতভাবেই ধাক্কা খাবে। প্রথম দর্শনের এই প্রতিক্রিয়ার গল্পের অভিমুখটি চিহ্নিত হয়ে যায় — গল্পটি স্পর্শ করে বাস্তবতার ভূমি।

গল্পকথকের এরই বিপ্রতীপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে দ্বিতীয়বার তাজমহল দর্শনে : ''পূর্ণিমার পরদিন। তখনও চাঁদ ওঠে নি। জ্যোৎস্নার পূর্বাভাস দেখা দিয়েছে পূর্ব দিগন্তে। সেই দিন সন্ধ্যার পর দ্বিতীয়বার দর্শন করতে গেলাম তাজমহলকে। অনুভূতিটা স্পষ্ট মনে আছে এখনও। .... চাঁদ উঠল; জ্যোৎস্নার স্বচ্ছ ওড়নায় অঙ্গ ঢেকে রাজ - রাজেশ্বরী শাজাহান মহিষী মমতাজের স্বপ্নই অভ্যর্থনা করলে যেন আমাকে এসে স্বয়ং। মুগ্ধ দৃষ্টিতে নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলাম।" (অনু: ৫) সময়ের স্থানান্তরণে তাজমহল দেখার প্রতিক্রিয়াটিরও স্থানান্তরণ ঘটে গেছে। গল্পকথকের এই অভিজ্ঞতাটি পূর্বের অভিজ্ঞতার একেবারে বিপরীত।

গল্পের প্রথমস্তরেই আছে গল্পকথকের ইতিহাস-চর্চা। তাজমহল প্রথম দেখে যে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে সেই স্বপ্নভঙ্গের অবশ্যম্ভাবী ফল গল্পকথকের নষ্টালজিয়া। তৃতীয় অনুচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে মুঘল ইতিহাস — অতীতের ছবির বাণিরূপ দিয়েছেন গল্পকথক : ''শাজাহানের তাজমহল। অবসন্ন অপরাহ্নে বন্দী শা-জাহান আগ্রা দুর্গের অলিন্দে বসে এই তাজমহলের দিকেই চেয়ে থাকতেন। মমতাজের বড় সাধের তাজমহল। ... আলমগীর নির্মম ছিলেন না। পিতার ইচ্ছা অপূর্ণ রাখেন নি তিনি....মহাসমারোহে মিছিল চলেছে....সম্রাট শা-জাহান চলেছেন প্রিয়া সন্নিধানে। .... আর বিচ্ছেদ সইল না।...শবাধার ধীরে ধীরে নামছে ভূগর্ভে...ঐ তাজমহলেই মমতাজের ঠিকপাশে শেষ-শয্যা প্রস্তুত হয়েছে তাঁর। আর একটা কবরও ছিল....হয়তো এখনও আছে....ঐ তাজমহলের পাশে। দারা সেকোর....'" (অনুচ্ছেদ : ৩) অতীত ইতিহাসটি পাঠকের সামনে মূর্ত হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় স্তরে আছে তাজমহলকে ঘিরে গড়ে ওঠা ব্যবসার বিবরণ, গল্পকারের কথায় : ''কোন্ কনট্রাক্টার তাজমহল থেকে কত উপার্জন করে, কোন্ হোটেলঅলা তাজমহলের দৌলতে রাজা বনে গেল, ফেরিওয়ালাগুলো বাজে পাথরের ছোট ছোট তাজমহল আর গড়গড়ার মতো সিগারেট পাইপ বিক্রি করে কত পয়সা পেটে রোজ, নিরীহ আগন্তুকদের ঠকিয়ে টাঙাগুলো কী ভীষণ ভীষণ ভাড়া নেয় — এ সব খবরও পুরানো হয়ে গেছে। (অনুচ্ছেদ : ৭)।

এই সঙ্গেই কথকের আগ্রার দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার হওয়ার সুবাদে প্রতিদিনই তাজমহলের পাশ দিয়ে যাতায়াত করার ফলে তাজমহলের প্রতি আকর্ষণ নষ্ট হয়ে গেছে। গোটা সপ্তম অনুচ্ছেদ জুড়েই আছে তাজমহলকেন্দ্রিক ব্যবসা এবং প্রাত্যহিক দেখার তাজমহলের প্রতি আকর্ষণহীতা।

এই গল্পের তৃতীয়স্তরে আছে গল্পকথকের চিকিৎসক জীবনের কাহিনি। বৃদ্ধ মুসলমানের সঙ্গে আলাপ। তিনি স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে এসেছেন। দুরারোগ্য 'ক্যাংক্রাম অরিম' রোগে আক্রান্ত এই মহিলাটি — রোগের অনুপুঙ্খ বিররণ — হাসপাতালের বারান্দায় শুরু হয় স্ত্রীলোকটির চিকিৎসা : ''কাছে যেতেই দুর্গন্ধ পেলাম একটা। হাসপাতালের ভিতরে গিয়ে বোরখা খুলতেই (আপত্তি করেছিল সে ঢের) ব্যাপারটা বোঝা গেল। ক্যাংক্রাম অরিম! মুখের আধখানা পচে গেছে। ডানদিকের গালটা নেই। দাঁতগুলো বীভৎসভাবে বেরিয়ে পড়েছে। দুর্গন্ধে কাছে দাঁড়ানো যায় না। দূর থেকে পিঠে করে বয়ে এনে এ রোগীর চিকিৎসা চলে না। আমার ইনডোরেও জায়গা নেই তখন। অগত্যা হাসপাতালের বারান্দাতেই থাকতে বললাম।'' (অনু: ৯)।

গল্পের চতুর্থস্তরে দেখা যায় বৃদ্ধটি সকলের আপত্তিতে হাসপাতালের বারান্দা ছেড়ে স্ত্রীকে হাসপাতালের সামনের গাছতলায় রেখেছে এবং সেখানেই মহিলাটির চিকিৎসা করেন গল্পকথক।

দশম অনুচ্ছেদে আছে এক বৃষ্টির দিনের ঘটনা : ''একদিন মুষলধারে বৃষ্টি নামল। আমি 'কল' থেকে ফিরছি, হঠাৎ চোখে পড়ল বুড়ো দাঁড়িয়ে ভিজছে। একটা চাদরের দুটো খুঁট গাছের ডালে বেঁধেছে আর দুটো খুঁট নিজে দুহাতে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। চাদরের তলায় রয়েছে বেগম সাহেব।...বেগম সাহেব দেখলাম আপাদমস্তক ভিজে গেছে। কাঁপছে ঠকঠক করে। আধখানা মুখে বীভৎস হাসি। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।''

একাদশ, দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ — এই তিনটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদে প্রকাশিত হয়েছে বেগমের অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর কথা। পরের দিন দেখা যায় গাছতলা ফাঁকা। গল্পকারের উপস্থাপন : ''বললাম — হাসপাতালের বারান্দাতেই নিয়ে চলো আপাতত। বৃদ্ধ হঠাৎ প্রশ্ন করলে — এর বাঁচবার কি কোনো আশা আছে হুজুর? সত্যিকথাই বলতে হল — না। বুড়ো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি চলে এলাম। পরদিন দেখি গাছতলা খালি। কেউ নেই।''

চতুর্দশ ও পঞ্চদশ — এই দুই অনুচ্ছেদের সমবায়ে গড়ে উঠেছে গল্পের পঞ্চম তথা অন্তিম স্তরটি। এখানে দেখা গেছে — বৃদ্ধটি স্ত্রীর জন্য ইঁট দিয়ে কবর গাঁথছেন। আরো আশ্চর্য হওয়ার মতো বিষয় বৃদ্ধটির নাম ফকির শা-জাহান। মুঘল আমলে প্রিয়তমার স্মৃতির স্মৃতিরক্ষা করতে বৃদ্ধটি উদ্যোগী হয়ে ইঁট গাঁথতে শুরু করেছে।

গল্পকারের বর্ণনায় : ''আরও কয়েকদিন পরে — সেদিনও কল থেকে ফিরছি — একটা মাঠের ভিতর দিয়ে আসতে আসতে বুড়োকে দেখতে পেলাম। কি যেন করছে বসে বসে। ঝাঁ-ঝাঁ করছে দুপুরের রোদ। কি করছে বুড়ো ওখানে? মাঠের মাঝখানে মুমূর্ষু বেগমকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছে নাকি? এগিয়ে গেলাম। কতকগুলো ভাঙা ইট আর কাদা নিয়ে বুড়ো কি যেন গাঁথছে।

''কি হচ্ছে এখানে মিয়া সাহেব —''

বৃদ্ধ সম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে সেলাম করলে আমাকে।

''বেগমের কবর গাঁথছি হুজুর।''

''কবর?''

''হাঁ হুজুর।''

চুপ করে বসে রইলাম। খানিকক্ষণ অস্বস্তিকর নীরবতার পর জিজ্ঞাসা করলাম — ''তুমি থাক কোথায়?''

''আগ্রায় আশে পাশে ভিক্ষে করে বেড়াই গরিব - পরবর।''

''দেখিনি তো কখনও তোমাকে। কী নাম তোমার?''

''ফকির শা-জাহান।''

এডগার অ্যালান পোর মতো বনফুলের 'তাজমহল' গল্পে এক চমকিত উপসংহার। এ মুঘল সম্রাট শা-জাহান নয়, এর কোনো বিপুল ঐশ্বর্য নেই যে তাজমহলের মতো বিশাল কোনো স্মৃতিসৌধ তৈরি করতে পারে, কিন্তু বৃদ্ধের হৃদয়ে আছে শাশ্বত প্রেম-এখানেই মিল মুঘল সম্রাট শাজাহানের সঙ্গে। চিরন্তন প্রেমের স্মারক হিসেবে ভাঙা ইঁট আর কাদা দিয়ে তৈরি করেছে তার স্বপ্নের স্মৃতিসৌধটি।

বনফুলের 'তাজমহল' গল্পটির প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত আছে নিরাসক্তি আর নিরপেক্ষতা। সূচনার নির্লিপ্ততা গল্পের পরিণতি পর্যন্ত বজায় আছে। 'তাজমহল' গল্পটি গল্পকথকের বয়ানে উত্তমপুরুষে লেখা। বিবৃতি বাক্য এবং সংলাপ — উভয় অংশই ঝরঝরে চলিত গদ্যে লেখা। প্রত্যক্ষ উক্তিগুলি কথ্যবাংলায় লেখা। যদিও বৃদ্ধটি উর্দুভাষী তবুও গল্পের সংলাপের কোথাও উর্দুভাষা ব্যবহার করা হয়নি — ব্যবহার করা হয়েছে বাংলা ভাষা। বৃদ্ধলোকটি 'চোস্ত উর্দুভাষায়' গল্পকথকের কাছে তার স্ত্রীর অসুস্থতার কথা বলেছে। এখানে লক্ষণীয় প্রত্যক্ষ উক্তির সংলাপের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে পরোক্ষ উক্তি : ''নিজের বেগমকে পিঠে ক'রে বয়ে এনেছে সে আমাকে দেখাবে ব'লে। নিতান্ত গরিব সে। আমাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে 'ফি' দিয়ে দেখাবার সামর্থ তার নেই। আমি যদি মেহেরবানি ক'রে—'।

এই গল্পে সংলাপ যোজনার ক্ষেত্রে দেখি কখনো কখনো সরাসরি শুধুমাত্র উক্তিটিই ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন : (১) 'কি হচ্ছে এখানে মিয়া সাহেব — '' (অনু : ১৪), (২) বেগমের কবর গাথছি হুজুর।'' (অনু : ১৪), (৩) ''কবর?'' (অনু : ১৪), (৪) ''হাঁ হুজুরু।'' (অনু : ১৪), (৫) ''আগ্রায় আশেপাশে ভিক্ষে করে বেড়াই গরিব - পরবর।'' (অনু : ১৪), (৬) ''দেখি নি তো কখনও তোমাকে। কী নাম তোমার?'' (অনু : ১৪), (৭) ''ফকির শা-জাহান।'' (অনু : ১৪)

কখনো কখনো প্রত্যক্ষ উক্তির আগে 'বলা', 'প্রশ্ন করা', জিজ্ঞাসা করা' ইত্যাদি ক্রিয়াপদগুলি ব্যবহার করা হয়েছে; কখনো আবার উক্তির সত্যতা উল্লেখ করা হয়েছে :

(১) একজন সহযাত্রী বলে উঠলেন — ঐ যে তাজমহল দেখা যাচ্ছে। (অনু : ১), (২) বললাম — হাসপাতালের বারান্দাতেই নিয়ে চলো আপাতত। (অনু : ১১), (৩) বৃদ্ধ হঠাৎ প্রশ্ন করলে — এর বাঁচবার কি কোনো আশা আছে হুজুর? (অনু : ১১), (৪)

খানিকক্ষণ অস্বস্তিকর নীরবতার পর জিজ্ঞাসা করলাম — ''তুমি থাক কোথায়? (অনু : ১৪), (৫) সত্যি কথাই বলতে হল — না। (অনু : ১২)

'তাজমহল' গল্পের অন্যন্যোসাধারণ ভাষানক্সাটি আমাদের চোখ এড়ায় না। কখনো কখনো ছোট ছোট বাক্য ব্যবহার করে একটি ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় বেগমের বর্ণনা পাঁচটি ছোট ছোট বাক্যে জীবন্ত করে তোলা হয়েছে :

(১) ক্যাংক্রাম্ অরিম !, (২) মুখের আধখান পচে গেছে।, (৩) ডানদিকের গালটা নেই।, (৪) দাঁতগুলো বীভৎসভাবে বেরিয়ে পড়েছে।, (৫) দুর্গন্ধে কাছে দাড়ানো যায় না। (অনুচ্ছেদ : ৯)।

গল্পের সপ্তম অনুচ্ছেদ পরপর তিনটি ছোটছোট নঞর্থক বাক্য-স্থাপনা করে একটি বিশেষ ছাঁদ সৃষ্টি করা হয়েছে : (১) এতবার যে আর চোখে লাগে না।, (২) চোখে পড়েই না।, (৩) পাশ দিয়ে গেলেও নয়।

'তাজমহল' গল্পের বাক্যগঠনের মধ্যেও প্রাতিস্বিকতার ছাপটি স্পষ্ট। গল্পকথক যে বিভিন্ন সময়ে তাজমহল দেখেছেন তা একটি বাক্যের মধ্যেই প্রকাশ করেছেন কালাধিকরণের কয়েকটি পদ পরপর ব্যবহার করে। বাক্যটি হল : ''অন্ধকারে, জ্যোৎস্নালোকে, সন্ধ্যায়, ঊষায় শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরতে বহুবার বহুরূপে দেখেছি তারপর তাজমহলকে।" (অনু : ৭)

'তাজমহল' গল্পের সূচনাবাক্যটি একটি জটিলবাক্য, কিন্তু এরও একটু বিশেষত্ব আছে। বাক্যটি হল : ''প্রথম যখন আগ্রা গিয়েছিলাম তাজমহল দেখতেই গিয়েছিলাম।" এখানে 'যখন-তখন' পদযুগ্মের প্রথমটি 'যখন' এর উল্লেখ আছে কিন্তু 'তখন' পদটি উহ্য।

আলোচ্য গল্পটিকে প্রাণবন্ত করার জন্য কয়েকটি অধিবাক্যের ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের বাক্যটি হল : 'ঐ যে — ' এই অধিবাক্যটিতে 'তাজমহল' পদটি উহ্য আছে। আবার তৃতীয় অনুচ্ছেদের অধিবাক্যটি হল : ''দারা সেকোর.....।" 'কবর' পদটি এখানে উহ্য আছে কিম্বা অষ্টম অনুচ্ছেদে ''আমি যদি মেহেররানি করে—' এই অধিবাক্যটি পাই। এখানে 'চিকিৎসা করি'—এই পদদুটি উহ্য আছে। গল্পে এই অধিবাক্যগুলির ব্যবহারের ফলে গল্পটি পেয়ে যায় একটি বাঞ্ছিত গতি।

যদিও চেক ভাষাবিজ্ঞানী ইয়ান মুকারোফস্কি কবিতার ভাষার ক্ষেত্রে যে বিচ্যুতি লক্ষ্য করেছেন যাকে তিনি foregrownding বা প্রমুখন আখ্যা দিয়েছেন তাকে আমরা ব্যবহার করতে পারি গদ্যভাষার ক্ষেত্রেও — যেখানে ভাষাটিই সামনে এসে দাঁড়ায়। গদ্যটিই পাঠকের প্রথমেই চোখে পড়ে।' তাজমহল' গল্পে অনেকক্ষেত্রেই বাক্যের প্রচলিত পদক্রমকে মান্য করেন নি গল্পকার, ফলে বাক্যটি সামনে এসে দাঁড়িয়ে এবং এই ধরণের বাক্যপাঠকের চোখে পড়তে বাধ্য। 'তাজমহল' গল্প থেকে এ বিষয়ে দু-একটা দৃষ্টান্ত নেব:

(১) অধিকরণের পদটিকে বাক্যের শেষে ব্যবহার করেছেন গল্পকার। 'জ্যোৎস্নার পূর্বাভাস দেখা দিয়েছে — পূর্বদিগন্তে। (অনু : ৫)।

(২) বাক্যের শেষে ব্যবহার করা হয়েছে কর্মপদটিকে : 'সেই দিন সন্ধ্যার পর দ্বিতীয়বার দর্শন করতে গেলাম তাজমহলকে।' (অনু : ৫)

(৩) কর্তাকে ব্যবহার করা হয়েছে একেবারে বাক্যের শেষে : ''আগ্রার কাছেই এক দাতব্য চিকিৎসালয়ে ডাক্তার হয়ে এসেছি আমি। (অনু : ৭)

বাক্যের শেষে কর্তার ব্যবহার এই গল্পে আরো দেখা যায়, যেমন : ''নির্বিকার ভাবে দাঁড়িয়ে ভিজছে লোকটা।'' (অনু : ১০) এখানে কর্তা 'লোকটা' বাক্যের শেষে ব্যবহৃত হয়েছে।

(৪) বাক্যের বিপর্যস্ত ক্রম 'তাজমহল' গল্পে দুর্লক্ষ নয়। যেমন : ''অন্ধকারে, জ্যোৎস্নালোকে, সন্ধ্যায়, ঊষায় শীত গ্রীষ্মবর্ষা শরতে বহুবার বহুরূপে দেখেছি তারপর তাজমহলকে।'' (অনু : ৭) এই বাক্যে কর্তাটি উহ্য আছে। সময়বাচকপদ 'তারপর)' এবং কর্মপদ 'তাজমহলকে' — বাক্যের প্রথমে আসার কথা ছিল কিন্তু তা না হয়ে বাক্যের শেষে পদদুটির স্থান হয়েছে।

'তাজমহলে' গল্পের অন্য যায়গায় ও বাক্যের শেষে ব্যবহৃত হয়েছে কর্মপদ : ''বৃদ্ধ স-সম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে সেলাম করলে আমাকে।'' (অনু : ১৪)

(৫) অপাদানের পদটি 'বারান্দা থেকে' বাক্যের মাঝে না বসে বাক্যের শেষে বসেছে : সকলের আপত্তি দেখে সরাতে হল বারান্দা থেকে। (অনু : ৯)।

(৬) 'শুভ্র আভাসও ফুটে বেরুতে লাগল অন্ধকার ভেদ করে।' (অনু : ৫)।

'অন্ধকার ভেদ করে' এই শব্দবন্ধটি বাক্যের শেষে চলে গেছে, এটি বাক্যের প্রথমে থাকার কথা ছিল। মান্যচলিতগদ্যে বাক্যটির রূপ দাঁড়ায় এরকম : অন্ধকার ভেদ করে শুভ্র আভাসও ফুটে বেরুতে লাগল।

(৭) 'ঝুড়িটা নামাতেই কিন্তু দেখতে পেলাম ঝুড়ির ভেতর মেওয়া নয়, বোরখাপরা মহিলা বসে আছে একটি।' অনু : ৮) এখানে সংখ্যাবাচক বিশেষণ 'একটি' বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত হওয়ার পরিবর্তে বাক্যের শেষে ব্যবহৃত হয়েছে। চলিত বাংলার পদসংস্থানের স্বাভাবিক নিয়মে হওয়া উচিত ছিল : একটি বোরখাপরা মহিলা বসে আছে।

বাক্যের বিপর্যস্তক্রম 'তাজমহল' গল্পের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার যোগ্য। ছোট একটি মাত্র উদাহরণ দিয়ে প্রসঙ্গটির ইতি টানব : 'কাছে যেতেই দুর্গন্ধ পেলাম একটা।' (অনু : ৯) এখানে 'একটা' পদটি বাক্যের মাঝে বসার কথা; বাক্যের রূপটি হত এইরকম 'কাছে যেতেই একটা দুর্গন্ধ পেলাম।

বনফুলের 'তাজমহল' গল্পটি পড়তে গিয়ে আমাদের মনে পড়তে পারে এন. ই. অঙ্কভিস্ট (N.E. ENKVIST) এর কথা — তিনি যে বলেছিলেন শৈলী হল একধরণের নির্বাচন, সেই নির্বাচনটিই চোখে পড়ে এই গল্পের শৈলীর ক্ষেত্রে। 'তাজমহল' গল্পটির নির্মাণ অত্যন্ত পরিকল্পিত — মিতায়তন এই গল্পটির কোথাও কোনো অতিরিক্ত শব্দ যোজিত হয়নি। শাশ্বত প্রেমের যে বার্তাটি গল্পকার এই গল্পে দিয়েছেন তা সুনিপুণ নির্মাণকৌশলে পৌঁছে যায় সমস্ত সংবেদনশীল পাঠকের কাছে। এই প্রেক্ষণবিন্দু থেকেই বাংলা গল্পবিশ্বে 'তাজমহল' গল্পটি নিশ্চিতভাবেই একটি ক্রোশ-প্রস্তর।

# ভাষার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের উপন্যাস : ১৯৪৭ পরবর্তী পর্যায়

ড. মোনালিসা দাস*

১৯৪৭-এ দেশবিভাগের অব্যবহতি পরেই পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর প্রথম দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয় ভাষার প্রশ্নে, যখন মুহম্মদ আলী জিন্নাহ জোরালো ভাবে ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হবে কেবলমাত্র উর্দু। এই ভাবনার সাথে মিলিত হয়েছিলো বাংলাভাষী কিছু পাকিস্তান আদর্শে উদ্বুদ্ধ সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী। তাঁদের বক্তব্য ছিল বাংলা ভাষার প্রকাশ রীতি সংস্কৃত ঘেঁষা এবং এতে হিন্দুয়ানির ছোঁয়া যুক্ত আছে। তাই তাঁরা সংস্কৃত ও দেশী শব্দ সাহিত্যে ব্যবহারের পরিবর্তে আরবি, ফার্সি, উর্দু শব্দের ব্যাপক ব্যবহারে পূর্ব বাংলায় নতুন রীতির বাংলাভাষা চালু করার পক্ষে অবস্থান নেন। প্রথমে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ঘোষণা করে, উর্দু-বাংলার সংমিশ্রণী ভাষা প্রয়োগের বিধি জারি করা হয়। সরকারের এই একতরফা সিদ্ধান্ত প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ে আগুন জ্বালিয়েছিল। একুশের ভাষা আন্দোলন তারই ফলশ্রুতি। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে পাকিস্তানি স্বৈরশাসন-বিরোধী প্রতিটি আন্দোলনের অনিঃশেষ চেতনা বাংলাদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক জীবনের মতো শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও যুগান্তকারী পরিবর্তন করেছে। স্বাধীনতাযুদ্ধের গণজাগরণ ও বৈপ্লবিক চেতনার স্পর্শে এক অপরিমেয় সম্ভবনায় উজ্জীবিত হয়ে উঠে বাংলাদেশের সাহিত্যচর্চা। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ থেকে শুরু করে শামসুদ্দীন আবুল কালাম, কিংবা শওকত আলী, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস থেকে সেলিনা হোসেন প্রত্যেকেই তাঁদের উপন্যাসে ভাষা প্রয়োগের দিক থেকে অত্যন্ত সচেতন। সেই উজ্জীবনী শক্তি অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়ে আজকের বর্তমান সময়েও বহমান।

উপন্যাস এক্ষেত্রে আধুনিকতম এবং জীবনের সমগ্রতাস্পর্শী শিল্পসৃষ্টি। সামাজিক পরিবর্তনশীলতা, তার কার্যকারণ শৃঙ্খলা এবং তার সংঘাত - সংকটের প্রতিফলন ঘটে উপন্যাসে। বলা ভালো যে, বিশুদ্ধ জীবনকে সামগ্রিকভাবে অঙ্গীভূত করার প্রয়াসে উপন্যাস মহাকাব্যরূপী এক অনন্য শিল্পমাধ্যম। জীবনার্থে অস্তিত্বের সামগ্রিক অভীপ্সা, স্বদেশ - সমকাল এবং সমাজ জীবনের বহুমাত্রিক বাস্তব অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞানের রূপায়ণই উপন্যাসের স্বধর্ম। বাংলাদেশের উপন্যাসে উপস্থাপন ভঙ্গিটি লক্ষণীয়। উপন্যাসের রৈখিক বৃদ্ধি সময়ে তাঁদের অবলম্বন নয়। চরিত্রের আত্মকথন, স্মৃতি পর্যালোচনা, নিজের সঙ্গেই বোঝাপড়া, চেতন থেকে অবচেতনে যাওয়া ভাষার মাধ্যমে উপন্যাসে গড়ে উঠেছে। সেই সঙ্গেই যুক্ত হয়েছে তীব্র তীক্ষ্ণ ঝকঝকে ভাষা আর আঞ্চলিক উপভাষার প্রয়োগ। ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম কিংবা রাজশাহী থেকে বগুড়া ঔপন্যাসিকরা কোথায় না গেছেন আর কতো আঞ্চলিক ভাষাকেই না আশ্রয় করেছেন। জীবনের অশেষ বৈচিত্র্যে বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকদের কলমে ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে। বাংলাদেশের কথাসাহিত্য বিশেষত উপন্যাসের

*বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়।

ভাষা ব্যবহারের দিক থেকে রীতিগত বাঁক পরিবর্তনের বিষয়টি লক্ষণীয়। বিশ শতকের চার ও পাঁচের দশকের কথাশিল্পীরা পূর্বসূরিদের অনুকরণে তৎসম শব্দবহুল সাধুরীতির ব্যবহার করলেও বলা যেতে পারে এই সময় থেকে চলিত রীতির ব্যবহার মোটামুটিভাবে শুরু হয়ে যায়। ছয়ের দশকে চলিত রীতিতে শৈল্পিক গদ্য নির্মাণ শুরু হয়। বাংলাদেশের উপন্যাসে এই গদ্যরীতিই পরবর্তীকালে প্রাধান্য বিস্তার করে। তবে শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো ছকবাঁধা পথে কথাকারগণ নিজেদের আবদ্ধ রাখেন নি। আরবি, উর্দু, হিন্দি, ইংরেজি-র পাশাপাশি তৎসম শব্দ, তদ্ভব শব্দ, উপভাষিক শব্দ, প্রতীকি শব্দ, এমনকি অশিষ্ট বা স্ল্যাং -এর ব্যবহারও করেছেন স্বচ্ছন্দ্যে। চরিত্র ও পরিবেশের রূপ ফুটিয়ে তুলতে উপযুক্ত শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে তাঁরা লোকভাষা, আঞ্চলিক ভাষারও ব্যবহার করেছেন নিঃসঙ্কোচে। তবে দক্ষ, প্রতিশ্রুতিশীল ও সৃষ্টিশীল সাহিত্যিকগণ একটি স্বকীয় ভাষাভঙ্গি নির্মাণে সদা সচেষ্ট ছিলেন।

বাংলাদেশের উপন্যাসে প্রথমদিকে নাজিবর রহমানের 'আনোয়ারা', কাজী আবদুল ওদুদের 'নদীবক্ষে', কাজী ইমাদুল হকের 'আবদুল্লাহ', হুমায়ুন কবিরের 'নদী ও নারী', আবুল ফজলের 'চৌচির', অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম', প্রভৃতি উপন্যাসে ঔপন্যাসিকগণ বিভাগ-পূর্ব বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আদর্শগত জীবনের রূপকল্পকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই সবকটি উপন্যাসই স্বতন্ত্র ভাষারীতির ব্যবহারের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

বিভাগোত্তরকালে পূর্ব পাকিস্তান সময়কাল সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ভাষা নিয়ে বৈচিত্র্যময় ও কার্যকর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন তাঁর উপন্যাসে। তাঁর 'লালসালু' উপন্যাসে কাহিনির বর্ণনায় শিষ্ট চলিত ভাষা ব্যবহার করলেও সংলাপ রচনায় আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছেন। এক্ষেত্রে নোয়াখালি ও ময়মনসিংহের আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছেন। যেমন,

''এক পীর সাহেব আইছেন না হেই গেরামে, তানি নাকি মরা মাইনষেরে জিন্দা কইরা দেন।''[১]

কিংবা

''পানি পড়াডা খাইয়া তানি যখন সাত পাক দিবার পারলেন না, মূর্ছা গেলেন, তখন তাতে সন্দেহের আর কোন কথা নাই। খুদার কালামের সাহায্যে যে কথা জানা যায় তা সূর্যের রোশনাইর মত সাফ। আর বেশি আমি কিছু কমু না। তানারে তালাক দেন।''[২]

শামসুদ্দীন আবুল কালামের 'কাশবনের কন্যা'র ভাষা আঞ্চলিক হলেও সংলাপের ভাষারীতি মিশ্র ধাঁচের। আঞ্চলিক ও সাধুরীতি মিশ্রিত কৃত্রিম উপভাষা। যেমন,

'হ, তুমি বিয়া কইরা খাওয়াবা কী আমারে - কেবল গান শুনাইয়া তো আর প্যাট ভরবে না। কী আছে তোমার? আমি স্বাদ আহ্লাদ করইয়া বাঁচতে চাই - যাউক - এসব কতা আর আলোচনার কোনো কাম নাই।'[৩]

আবু ইসহাকের 'সূর্যদীঘল বাড়ি' উপন্যাসে ভাষা ব্যবহারে অকৃত্রিম অঞ্চল ঘনিষ্ঠতার পরিচয় মেলে। যেমন,

''ফিরাইয়া দ্যাও অখুনি। বেপর্দা আওরাতের চীজ। ছি ছি ছি!''[৪]

কিংবা

''আমার মোখের উপর কইরা দিছে, যে থুথু একবার মাড়িতে ফালাইছি তা মোখ দিয়া চাটতে পারতাম না।''[৫]

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের মুসলমান বিশেষত ময়মনসিংহের এলাকার ভাষায় বাংলা শব্দের সাথে উর্দু শব্দের মিশ্রণ লক্ষণীয়। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের নোয়াখালী জেলার বাকভঙ্গির প্রয়োগে শহীদুল্লাহ কায়সারের উপন্যাসে সংলাপ রচনার পাশাপাশি বর্ণনার ক্ষেত্রেও কখনো কখনো পরিমার্জিত রূপ লক্ষণীয়। তাঁর 'সারেং বৌ' উপন্যাসই অন্যতম উদাহরণ -

''তা এখন ওর কদমেরই বা দরকার কি, টাকারই বা কি ঠেকা? লাং এর তো আর অভাব নেই, টাকারও কমতি নেই।''[৬]

সরদার জয়েনউদ্দীনের 'অনেক সূর্যের আশা' সত্যেন সেনের 'পদচিহ্ন' উপন্যাসে বিশ্বযুদ্ধ, সামাজিক অবক্ষয়, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগ এবং বিভাগোত্তর সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আবেগময় ভাষার স্মৃতিকথণের মোড়কে উপস্থাপিত হয়েছে। চলিত গদ্যরীতিতে লেখা এ উপন্যাসের ভাষাভঙ্গি অনেকটা প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনারূপে উপস্থাপিত হয়েছে। জহির রায়হানের 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাস ভাষা আন্দোলনের মৌল আবেগের সঙ্গে যুক্ত বলে এর গদ্যরীতি দৃঢ় অথচ আবেগময়।

স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনির হত্যালীলার প্রত্যক্ষ দলিল 'রাইফেল রোটি আওরাত' উপন্যাসে কথক সুদীপুত শাহীন ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ায় উপন্যাসে ভাষা হয়ে উঠেছে সাংবাদিকের প্রতিবেদনের মতো। যেমন,

''জগন্নাথ হলের মাঠে আরো অনেকগুলি বস্তিবাসী বিভিন্ন দিক থেকে মৃতদেহ কুড়িয়ে এনে একত্রে জড়ো করছিল। তাদের পিছে পিছে সঙ্গিন উচিয়ে এসেছিল জোয়ানেরা। অতঃপর হুকুম হয়েছিল গর্ত কর। ঝুড়ি কোদাল কোতা থেহে জোয়ানই দিয়েছিল এবং সে জোয়ানদেরকে খুবই কষ্ট করে কয়েক ঘন্টা অনবরত প্রবল গালি ও বুটের লাথি চালাতে হয়েছিল। তবেই না শেষ পর্যন্ত মনমত হয়েছিল গর্তটা। তখনও কাতরাচ্ছে এমন কিছু আহত ব্যক্তিকেও অনেক শবের সঙ্গে সেই গর্তে ফেলে দেওয়ার পর এসেছিল বস্তিবাসীদের পালা। লম্বা গর্তটার পাশে তাদেরকে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে বলে জওয়ানরা চাঁদমারি অভ্যাস করেছিল। একটি একটি করে সবকটি বস্তিবাসী গর্তে গেলে বাকি কাজটুকু করতে হয়েছিল জওয়ানদের। পাশের স্তূপীকৃত মাটি ঠেলে দিয়ে জায়গাটা ভরাট করতে হয়েছিল তাদের।''[৭]

জহিরুল ইসলামের 'অগ্নিসাক্ষী' ১৯৬৮-১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের গণ অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটযুক্ত। লেখক সমকালের ঘটনাকে উপন্যাসে রূপদান করে সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। এই সময় সাধারণ মানুষকে হত্যা, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের হত্যা, নারীদের ধর্ষণ এবং মৌলিক অধিকার হরণের প্রতিবাদের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসেই গণ আন্দোলন পরিণতি লাভ করে। তাই সেই ঘটনা ও সময়কে রূপায়িত করতে জহিরুল ইসলামকে হতে হয়েছে শব্দ ব্যবহারে কুশলী, বাক্যগঠনে দক্ষ এবং প্রকাশভঙ্গিতে প্রত্যয়দীপ্ত ও প্রতিবাদী। অগ্নিসাক্ষীর ভাষা চলিত রীতির পাশাপাশি অশিক্ষিত শ্রেণির কথ্যরীতিও

উঠে এসেছে : ''ছেরিটা রূপসী বলতে হইব''।[৮]

তৎকালীন রাজনীতি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ছিল তা উপন্যাসের ভাষার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে : ''আমার অবস্থার কথা বলছো? তোমাদের থেকে ভালো সেটা আপাতদৃষ্টিতে,

আমরা কি পুঁজিপতি?

নাই বা হল, তোমাদের গাড়ি ছিল, বাড়ি আছে। আমাদের কোনটাই নেই।

কিন্তু কলকারখানা বা ইন্ডাস্ট্রি ওনার আমরা নই

থামো থামো মুনি ভাই, আমি আর শুনতে চাই না।''[৯]

আন্দোলন যেহেতু উপন্যাসের ঘটনা ও পাত্রপাত্রীদের নিয়ন্ত্রণ করেছে তাই মিছিলের ভাষা এই উপন্যাসে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে : ''আমাদের সংগ্রাম চলছে, চলবে।''[১০]

কিংবা, ''শহীদ জব্বার বরকত সালাম — লাল সালাম, লাল সালাম।''[১১]

আহমদ ছফার 'ওঙ্কার' উপন্যাসে চলিত রীতির সাদামাটা স্টাইলের মধ্যেই রয়েছে ভাষার অন্তর্গত সুষমা ও বক্তব্য প্রকাশে দৃঢ়তা : ''গোটা বাংলাদেশের শিরা উপশিরায় এক প্রসব বেদনা ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষের বুকফাটা চিৎকারে ধ্বনিত হচ্ছে আকুতি। ...আমি মেঝের ছোপ ছোপ লাল রক্তের দিকে তাকাই ...মন ফুরেই একটা প্রশ্ন জাগে। কোন রক্ত বেশী লাল। শহীদ আসাদের না বোবা বৌয়ের?''[১২]

কবিতার পংক্তির মতো কখনো ভাষাভঙ্গি : ''চন্দ্রকোটালের জোয়ারের জলের মতো বইছে মানুষ। বাংলাদেশের রাস্তাগুলো নদী হয়ে গেছে। তাদের চোখে আগুন, বুকে জ্বালা, কণ্ঠে আওয়াজ, হাতে লাঠি। রৌদ্রোজ্জ্বল দুপুরে শ্লোগানের ধ্বনি বাংলাদেশের আকাশ মণ্ডলের কোটি কোটি বর্শাফলার মতো ঝিকিমিকি খেলা করে।''[১৩]

মাহমুদুল হকের 'জীবন আমার বোন' ভাষা ব্যবহারে মাত্রিকতায় অনন্য একটি উপন্যাস। ১৯৭১-এর রাজনৈতিক প্রতিচ্ছবি উপন্যাসের ভাষায় লক্ষণীয়:

''প্রতিটি রাজপথই এখন ভয়ানক পদপিষ্ট। মুহুর্মুহু বজ্রনির্ঘোষে উপুর্যপুরি কেঁপে উঠছে সবকিছু, কাছে পিঠে কোথাও কোনো এক ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি শতবর্ষ পরে রুদ্ররোষে উদগারিত হচ্ছে, ভস্মাচ্ছাদনে মুড়ে দিয়েছে চিৎপাত শহরকে; সংহার পিপাসু অগ্নিময় লাভাস্রোতে ধীর অথচ অপ্রতিরোধ্য গতিতে অগ্রসরমান।''[১৪]

কখনো কখনো লেখক একটি শব্দকে নিয়ে দীর্ঘ অনুচ্ছেদে পেতেছেন ভাষার বৈচিত্র্যময় জাল-

''কাল বেলী, ধাওলা বেলী, শুটকী বেলী, ধুমসী বেলী, গান্নাকাটা বেলী, খ্যাংরা গুপোরপিয়ারী বেলী, তাঝকা রাক্ষুসী বেলী, খাঁদা বেলী, টিপকপালী বেলী, বড়িখোপা বেলী।''[১৫]

কথাসাহিত্যিক শওকত আলী ভাষা ব্যবহারে বিষয়ানুগ। তাঁর 'প্রদোষে প্রাকৃতজন' উপন্যাসের ভাষাশৈলী নিয়ে লেখক নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। বাক্যগঠন প্রণালী লক্ষ করলে দেখতে পাওয়া যায় সংস্কৃত ও সমাসবদ্ধ শব্দের বহুলতা:

''আলুলায়িত কেশভার, বিস্রস্তবাস আর ঐ প্রকার অবরুদ্ধ হাহাকার। শ্যামাঙ্গ লীলাকে বক্ষ লগ্ন করে। পৃষ্ঠে হাত রাখে, সীমান্তে চুম্বন করে। যতোবার করে, ততোবার হাহাকার উদ্বেল হয়, রোদন উচ্ছসিত হয়, ক্ষোভ তীব্রতর হয়। ...পুত্তলিকা নির্মাণকালের আনন্দ ঐ সময় তার সমগ্র অস্তিত্বকে আন্দোলিত করতে থাকে।''[১৬]

আবার লেখকের 'মাদারডাঙার কথা' উপন্যাসে উত্তরাঞ্চলের ভাষা ব্যবহার লক্ষণীয়। ভাষা ব্যবহারে স্বাতন্ত্র্য নিয়ে আসায় তাঁর আঞ্চলিক আকর্ষণের চেয়ে নিম্নবর্গের জীবনবোধকেই বেশি করে ইঙ্গিত করে:

''মুই কহিবা পারো না বাব, হুঁশ ছিল না — গাঢ়ার ভিতর হাতখান ঢুকানু ঐ সময় শালার ব্যাটা কামড়ায় ধরিল, আর কী জলন, মনে হইল আগিন নাগে গেইছে হাতখানত — স্যালা চুষে চুষে অক্ত ফ্যালানু, কমরের কসি খুলি দাঁত দে কামড়ায় ধরে তাগা বান্দিনু — ঐসম চিল্লাচিল্লি শুনো — তারপর আর কিছু মোর হুঁশ নাই।"[১৭]

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস স্বতন্ত্র। ইলিয়াস কথাসাহিত্যে আঞ্চলিক ভাষার সার্থক প্রয়োগকার। 'চিলেকোঠার সেপাই' - এ তিনি পুরনো ঢাকার বস্তিবাসী নিম্নবিত্তের ভাষার সংগ্রামী রূপ, বগুড়া জেলার আঞ্চলিক ভাষার সংগ্রামী মানুষের মানসিকতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন:

''আমাগু পুলের উপরের মসজিদ কি আইয়ুব খানের মিলিটারি করচে, না চৌচল্লিশ ধারা দিয়ে মুলল্লিগো আটকাইয়া রাখছে? বাপ দাদা মায় মুরুব্বি চোদ্দ পুরুষ নামাজ পরছে পুলের উপরের মসজিদে, আউজকা তুমি নয়া জায়গা বিচরাও?"[১৮]

সেলিনা হোসেন তাঁর 'গায়ত্রী সন্ধ্যা' উপন্যাসে ঐতিহাসিকের ভূমিকায় স্থান নিয়েছেন। ঐতিহাসিকের মতোই তাঁর গদ্য এখানে আবেগহীন, নির্মোহ এবং প্রকাশের দৃঢ়। সমকালীন ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে সেলিনা হোসেনের ভাষারূপ তথ্যবহুল ও বর্ণনাময়:

''শেখ মুজিবর রহমান তার ছয়দফা কর্মসূচী নিয়ে প্রথম জনসভা করেন চট্টগ্রামের লালদিঘি ময়দানে। দেশ জুড়ে হই চই পড়ে যায়। বলা হতে থাকে এই ছয়দফা বাঙালি জাতির মুক্তিসনদ। পঁচিশে ফেব্রুয়ারি সেই জনসভায় বিপুল জমায়েত হয়।"[১৯]

পরিশেষে আমরা একথা বলতে পারি যে, বাংলাদেশের উপন্যাসের ভাষার মধ্যে বাংলাদেশের রূপ অনেকটাই প্রতিভাত হয়। কাঁচা মাটির গন্ধ ভরা 'বঙ্গের ভাষার যে এত রঙ্গ' বৈচিত্র্য তা বাংলাদেশের কথাসাহিত্যিকেরা তুলে আনেন উপন্যাসের পরিসরে। যাঁদের কথা আমরা এখানে বিশেষভাবে আলোচনা করলাম শুধু তাঁরাই নন, এছাড়াও শওকত ওসমান, আবু জাফর শামসুদ্দীন, হাসান আজিজুল হক, সৈয়দ শামসুল হক, দিলারা হাসেম, বিপ্রদাশ বড়ুয়া, নাসরীন জাহান, প্রমুখ বাংলাদেশের কথাসাহিত্যিকরা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বকীয় জগৎ তৈরিতে নিরন্তর তৎপর।

**তথ্যসূত্র :**

১। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, লাল সালু, ১৯৪৮, কমরেড পাবলিশার্স, ৬২, সুভাষ এভেনিউ, ঢাকা, পৃষ্ঠা ২১।
২। তদেব, পৃষ্ঠা ৬১।
৩। শামসুদ্দিন আবুল কালাম, কাশবনের কন্যা, ১৯৫৫, ওসমানীয়া বুক ডিপো, বাবু বাজার, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৫৬।
৪। আবু ইসহাক, সূর্যদীঘল বাড়ী, ১৯৫৫, ১ সি সার্কেট প্রেস, কলিকাতা ১৭, পৃষ্ঠা ৬৬।
৫। তদেব, পৃষ্ঠা ৩৩।

৬। শহীদুল্লাহ কায়সার, সারেং বৌ, ১৯৬২, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৮৯।
৭। আনোয়ার পাশা, রাইফেল রোটি আউরাত, ১৯৭৩, বর্ণমিছিল, ৭০, মিউনিসিপ্যাল স্ট্রীট, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১২১।
৮। জহিরুল ইসলাম, অগ্নিসাক্ষী, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ৯, বাংলা বাজার, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৫১।
৯। তদেব, পৃষ্ঠা ৭১।
১০। তদেব, পৃষ্ঠা ৯৩।
১১। তদেব, পৃষ্ঠা ৯৩।
১২। আহমদ ছফা, ওঙ্কার, ১৯৯৩, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ৯, বাংলা বাজার, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৫১।
১৩। তদেব, পৃষ্ঠা ৫৮।
১৪। মাহমুদুল হক, জীবন আমার বোন, ১৯৭৩, ইস্টবেঙ্গল পাবলিশার্স, ৩৩/১, পাটুয়াটুলি, ঢাকা, পৃষ্ঠা ২৯।
১৫। তদেব, পৃষ্ঠা ৬৩।
১৬। শওকত আলী, প্রদোষে প্রাকৃতজন, ১৯৪৮, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১৫৮।
১৭। শওকত আলী, মাদারডাঙার কথা, ২০১১, নান্দনিক, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১২৩।
১৮। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, চিলেকোঠার সেপাই, ১৯৮৭, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১৯১।
১৯। সেলিনা হোসেন, গায়ত্রী সন্ধ্যা, ২০০৩, সময় প্রকাশন, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৩২১।

**সহায়ক গ্রন্থ :**

১। আক্রম হোসেন সৈয়দ, প্রসঙ্গ বাংলা কথাসাহিত্য, ১৯৯৭, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
২। আলী ইদ্রিস মুহম্মদ, আমাদের উপন্যাসে বিষয় চেতনা - বিভাগোত্তর কাল, ১৯৮৮, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
৩। খান রফিকউল্লাহ, বাংলাদেশের উপন্যাস - বিষয় ও শিল্পরূপ ১৯৪৭-১৯৮৭, ১৯৯৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
৪। খান রফিকউল্লাহ, শতবর্ষের বাংলা উপন্যাস, ২০০১, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
৫। গীয়াস শামীম, বাংলাদেশের আঞ্চলিক উপন্যাস, ২০০২, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
৬। ঘোষ বিশ্বজিৎ, বাংলাদেশের সাহিত্য, ১৯৯১, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
৭। চৌধুরী নাজমা জেসমিন, বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি, ১৯৯১, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
৮। দাশগুপ্ত রণেশ, উপন্যাসের শিল্পরূপ, ১৯৭৩, কালিকলম প্রকাশনী, ঢাকা।
৯। মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার, বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ১৯৮৭, শরৎ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা।
১০। হক হাসান আজিজুল, কথাসাহিত্যের কথকতা, ১৯৮১, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা।

# আন্তঃসম্পর্কের আলোকে সমাজ ও সাহিত্য

**ড. শিপ্রা সরকার***

সাহিত্য ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক প্রত্যক্ষ এবং শাশ্বত। তাই সাহিত্যিককে তাঁর সমকালীন সমাজ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়। এদিক থেকে বিবেচনা করলে সাহিত্যিকের সৃষ্টিকর্ম তথা সাহিত্যানুশীলন অবশ্যই একটি সামাজিক কর্ম। সমাজ প্রতিবেশ ও সামাজিক - প্রবণতাই মানস-প্রকর্ষের উৎস, সেজন্য তা সাহিত্য-সৃষ্টিরও আদি-ভ্রূণ। একটি বিশেষ কালের বিশেষ সমাজ-প্রতিবেশই অলক্ষ্যে নির্ধারণ করে দেয় ওই বিশেষ কাল ও সমাজ থেকে উদ্ভূত সাহিত্যের মৌল প্রবণতাসমূহ। বস্তুত, সাহিত্যের বিষয় ও আঙ্গিক একান্তভাবেই সমাজ-বিকাশের মৌল বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। সাহিত্যের পাতায় উৎকীর্ণ হয় নির্দিষ্ট কোন কালের বৈশিষ্ট্য, বিশেষ কোন সমাজের বহুমাত্রিক পরিচয়। সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নির্দেশ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সাহিত্য-সমালোচক অরবিন্দ পোদ্দারের নিম্নোক্ত উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য —

ইতিহাসের যে কোন বিন্দুতে সাংস্কৃতিক হাওয়া বদলের পশ্চাতে যেমন কালের আন্তর গরজ সংগোপনে ক্রিয়াশীল থাকে, তেমনি ব্যক্তিক ভাবনা চিন্তা, অনুসন্ধিৎসা, শ্রেয়সের ধ্যান এবং সাহিত্যে আত্মপ্রকাশের ভঙ্গিতেও কালের মর্মবাণী ও অনুশাসনটি আবিষ্কার করা কঠিন নয়। এই একটি সূত্রের মধ্যেই একটি বিশেষ ঐতিহাসিক কালের সঙ্গে আরেকটির এক যুগের মানুষের সঙ্গে আরেক যুগের মানুষের পার্থক্য, মনোভঙ্গিতে ব্যবধান এবং বাচনভঙ্গিগত স্বাতন্ত্র্য আবিষ্কার করা সম্ভব।[১]

সামাজিক মানুষ হিসাবে শিল্পী-সাহিত্যিকরা ব্যক্তিক আন্তর- গরজে সাহিত্য রচনা করেন। একটি বিশেষ সমাজ-কাঠামোর অভ্যন্তরে বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রভাবিত হয় বিশেষ কোন শিল্পীর মানসলোক। সমাজ-সংগঠনের সুস্পষ্ট প্রভাবে বিকশিত হয় সাহিত্যিকের জীবনবোধ। সুতরাং তাঁর রচনায় ঐ বিশেষ সমাজের ছায়াপাত ঘটবে, এটা একান্তই স্বাভাবিক। যে-কোন মহৎ সাহিত্যকর্মে প্রতিফলিত হয় বিশেষ কোন সমাজ-সংগঠনের আর্থ-সামাজিক -রাজনৈতিক পরিচয়। তাই সমাজতাত্ত্বিক অভিনিবেশ সহকারে বিশেষ কোন যুগের সাহিত্যকর্ম পাঠ করলে ঐ যুগের সমাজ-সংগঠনের সামাজিক স্তরবিন্যাস, অর্থনৈতিক অবস্থা, শ্রেণীবৈশিষ্ট্য, ধর্মীয় প্রথা, জীবিকার উৎস, সামাজিক সমস্যা প্রভৃতি বিষয় আবিষ্কার করা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে সাহিত্য-সমালোচক নীলিমা ইব্রাহিমের অভিমত Man is social animal and consequently society is reflected in every branch of literture....So if we go deep into the literary works of an age, we are sure to have the social manners and customs and various problems of that age reflected therein.[2]

---

*অধ্যাপিকা, সমাজবিদ্যা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।

সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে এটি সত্য বলে প্রতীয়মান হয় যে, সাহিত্যসৃষ্টির পশ্চাতে সর্বদা ক্রিয়াশীল থাকে বিশেষ কোন সামাজিক প্রয়োজন। বস্তুত, সমাজবিবর্তনের প্রক্রিয়া এবং মানুষের নিরন্তর শ্রেণীসংগ্রাম সংগঠনের সামাজিক প্রয়োজনই সাহিত্যিককে সৃষ্টিকর্মে উদ্বুদ্ধ করে। সমাজ বিবর্তনের ধারা এবং শ্রেণীসংগ্রামের প্রক্রিয়া শিল্প-সাহিত্যে উপস্থাপিত হয় বলেই, তা আকৃষ্ট করে সমাজবিজ্ঞানীকে। যে-সাহিত্যে সামাজিক শক্তির ক্রিয়াকলাপ এবং সামাজিক স্তরবিন্যাস বস্তুনিষ্ঠভাবে উপস্থাপিত হয়, সেই সাহিত্য পাঠেই সমাজবিজ্ঞানী সমধিক আগ্রহী। সমাজ-সংগঠন সম্পর্কে সচেতন নয় এমন সাহিত্যিকের রচনা সমাজবিজ্ঞানীর কাছে কোন মূল্য বহন করে না। উপমহাদেশের অন্যতম সমাজবিজ্ঞানী এ. কে. নাজমুল করিম তাঁর ''সাহিত্য ও সমাজবিজ্ঞান'' শীর্ষক প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে —

সত্যিকারের সাহিত্য সৃজন করতে হলে সাহিত্যিককে সমাজ-সচেতন হতে হবে। সমাজ-সচেতনভাবে অর্থ এই নয় যে, সাহিত্যিক কেবল সাম্প্রতিক ঘটনাবলীই তাঁর সাহিত্যে পরিবেশন করবেন। যেমন বলা হয়েছে যে, এত বড় মহাসমর, দুর্ভিক্ষ, দেশবিভাগ সংগঠিত হল, কিন্তু অনেক নামজাদা বনেদী সাহিত্যিক তাঁদের কলম এ সব ঘটার আগে যেভাবে চালাতেন সেভাবেই চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের লেখায় তাই সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর কোন ছাপ নাই এবং ছাপ নাই বলেই তাঁদের লেখা বাস্তবতা বর্জিত, তাই তাঁদের লেখা সাহিত্য পদবাচ্য হতে পারে না। কতক ''আধুনিক'' সাহিত্যিক সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে কিছু লিখে কতক মহলের বাহবা পেলেন। আবার আজকাল সাহিত্যিক মহলে রেওয়াজ চলছে, সত্যিকারের সাহিত্যিককে মধ্যবিত্ত সমাজের চিত্র না এঁকে নিম্নশ্রেণীর চিত্র আঁকতে হবে — তা হলেই সাহিত্যিক সমাজ সচেতন হলেন। তা মোটেই নয়। সমাজ সচেতনতার অর্থ সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি। যে সাহিত্য মানুষকে, ঘটনাকে, জীবনজিজ্ঞাসাকে সমাজ বিবর্তন ও সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেখার চেষ্টা করেছে, তাই হল প্রকৃত সাহিত্য।[৩]

আত্মপ্রকাশের বাসনা, সমাজ-সত্তার সঙ্গে সংযোগ কামনা, অভিজ্ঞতার আলোয় কল্পলোক নির্মাণ এবং রূপপ্রিয়তা — এই চতুর্মাত্রিক প্রবণতাই মানুষের সাহিত্য-সাধনার মৌল উৎস।[৪] উপর্যুক্ত চতুর্মাত্রিক প্রবণতার মধ্যে 'সমাজসত্তার সঙ্গে সংযোগ-কামনা' এবং 'অভিজ্ঞতার আলোয় কল্পলোক নির্মাণ'— এই উৎসদ্বয়ের মধ্যে নিহিত রয়েছে সাহিত্য ও সমাজের মধ্যে আন্তর-সম্পর্কের প্রাণ-বীজ। সাহিত্য সমাজবিচ্ছিন্ন বৃন্তলীন কোন কুসুম নয় এবং সাহিত্যিকও নন সমাজ-বহির্ভূত অলৌকিক জগতের কোন কল্পমানুষ। সমাজের সঙ্গে তাঁর বন্ধন শাশ্বত এবং তিনি তাঁর সৃষ্টিকর্মে সামাজিক আন্তঃসম্পর্কের আলোকে সমাজ ও সাহিত্য অভিজ্ঞতার আলোকেই নির্মাণ করেন এক নতুন বাস্তবতা। যে-বাস্তবতা সমাজ অভিজ্ঞতারই শৈল্পিক ব্যঞ্জনা মাত্র।

সংস্কৃতির যেসব শাখা রয়েছে, সাহিত্য তার একটি। সুতরাং সংস্কৃতি সম্পর্কে সমাজ-তাত্ত্বিকদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সাহিত্যের জন্যেও সমান প্রযোজ্য। সংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব ব্যাখ্যা সূত্রে ইংরেজ নৃ-বিজ্ঞানী ই. বি. টাইলর-এর সংজ্ঞা এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য —

Culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, mor-

als, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society.[৫]

সুতরাং সংস্কৃতি-চর্চা তথা সাহিত্য-সাধনা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-কর্ম হিসেবেই সমাজতাত্ত্বিকদের কাছে স্বীকৃত। সমাজই শিল্পীকে সংস্কৃতি চর্চা তথা সাহিত্যসাধনায় প্রণোদিত করে এবং শিল্পী বা সাহিত্যিকের সৃষ্টিকর্মে বৃহত্তর সমাজ-বাস্তবতাই প্রতিফলিত হয়।

সমাজসংগঠন-সৃষ্ট শ্রেণী-কাঠামো ও শ্রেণী-মনস্তত্ত্ব সাহিত্যে রূপ লাভ করে এবং এ সূত্রেই সমাজকাঠামোর সঙ্গে সাহিত্যের গভীরতর সম্পর্ক ধরা পড়ে। বস্তুত, সমাজবিকাশের প্রবহমাণ ধারার আলোকেই সাহিত্যের স্বরূপ সন্ধান করা উচিত। সাহিত্যের আঁধারেই সুপ্তাবস্থায় বিরাজ করে সমাজবিকাশের মৌল প্রবণতাসমূহ। সাহিত্যিক তাঁর রচনায় বিশেষ কোন মতাদর্শ বা নির্দিষ্ট কোন রাজনৈতিক - সামাজিক সমাধান যদি না-ও বা দেন, তবু বাস্তব সামাজিক জীবন রূপায়ণের জন্যে তাঁর সৃষ্টিকর্ম সমাজবিজ্ঞানীর কাছে বিবেচিত হতে পারে গুরুত্বপূর্ণ কোন গবেষণার উপাত্ত উপাদানের উৎস হিসেবে। এ প্রসঙ্গে ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের নিম্নোক্ত মন্তব্য বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য :

I think that the bias should flow by itself from the situation and action, without particular indications, and that the writer is not obliged to obtrude on the reader the future historical solutions of the social conflicts pictured....therefore, a socialist baised novel fully achieves its purpose, in my view, if by conscientiously describing the real mutual relations, breaking down conventional illusions about them, it shatters the optimism of the bourgeois world, instills doubt as to the eternal character of the existing order, although the author does not offer any definite solution or does not even line up openly on any particular side.[৬]

বুর্জোয়া সমাজের সাহিত্য প্রসঙ্গে এঙ্গেলস উপযুক্ত মন্তব্য করলেও বস্তুত তা সকল যুগের সাহিত্য সম্পর্কেই প্রযোজ্য। সামাজিক ঘটনা বা সমস্যাবলি সাহিত্যিকদের মনে কেবল অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে না, বা তিনি তা কেবল প্রকাশই করেন না, বরং সমাজের যে সামগ্রিক উত্থান-পতন হচ্ছে এবং যে-সব শক্তি ঐ উত্থান পতনে সহায়তা করছে, সাহিত্যিক সে-সবকে শৈল্পিক উপায়ে জনসমক্ষে উন্মোচিত করেন।[৭] বস্তুত সাহিত্যের সমাজতত্ত্বে সমাজবিজ্ঞানীর কাছে এটিই হওয়া উচিত কেন্দ্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি। সামাজিক পরিবর্তন ও বিকাশের ধারা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকলেই সাহিত্যিকের পক্ষে মহৎ কোন শিল্পকর্ম নির্মাণ করা সম্ভব। সমাজ বিকাশের ধারার সঙ্গে সাহিত্যিকের জ্ঞানগত সম্পর্ক প্রসঙ্গে নাজমুল করিমের নিম্নোক্ত উক্তিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

আমাদের দেশে ইউরোপীয় ফিউডালতন্ত্র হতে আলাদা ধরনের সামন্ততন্ত্র চালু ছিল। সে সামন্ততন্ত্র বৃটিশ ঔপনিবেশিক ধনতন্ত্রের আঘাতে ভেঙে পড়েছে এবং তার স্থানে নতুন গড়া আরম্ভ হয়েছে। আমাদের সমাজ বিবর্তন সম্পর্কে এ হল মূলসূত্র। সাহিত্যিককে কেবল এ মূলসূত্র জানলেই চলবে না — সমাজের প্রতি স্তরে কি করে এ সমাজ পরিবর্তন পরিব্যাক্ত হয়ে কাজ করছে, তা বোঝা ও অনুভব করবার ক্ষমতা না থাকলে, তিনি এ

যুগের সাহিত্যিক হতে অপারগ। তবে এখানে বলা প্রয়োজন যে, কেবল সঠিক সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি বা কেবল রসসৃজনশীল প্রতিভাই এ ধরনের সাহিত্য সৃজন করবে না। প্রকৃত সাহিত্য সৃজনে এ দু'-এর সংমিশ্রণ চাই। এ সংমিশ্রণের অভাবের ফলেই বনেদি সাহিত্যিকদের সংজ্ঞায় রসোত্তীর্ণ সাহিত্যকে আমরা সাহিত্য বলতে নারাজ।[৮]

তবু এরকম একটি সাধারণ ধারণা প্রচলিত যে, কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকরা হচ্ছেন প্রবলভাবে ভাবপ্রবণ এবং এই ভাবের উৎস হচ্ছে তাঁর অন্তরলোক, অলৌকিক প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন বলেই তিনি সাহিত্য সৃষ্টি করতে সক্ষম। কিন্তু কোন সমাজবিজ্ঞানীই এ ধরনের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেন না। ব্যক্তির স্বতন্ত্র প্রতিভার কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু শিল্পীচিত্তে ভাব-সৃষ্টিতে সামাজিক পটভূমি ও সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ নির্ধারণ করাই সমাজবিজ্ঞানীর কাছে মুখ্য বিবেচ্য বিষয়। বস্তুত সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য থেকেই জন্ম নেয় ভাবরাজি এবং কবিচিত্ত স্বাভাবিকভাবে সংবেদনশীল ও অনুভূতিপ্রবণ বলেই তাঁর কাছে তা বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়। সামাজিক ক্রিয়াই যে ভাবের জন্ম-সূত্র, সে প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞানী ডব্লিউ, স্টার্ক-এর নিম্নোক্ত উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য —

Ideas are engendered in and grow out of social interaction, and that they show, in their concrete content, the reflected image of the social reality within which they have come to life.[৯]

আদিম কাল থেকেই সামাজিক প্রয়োজনে মানুষ শিল্পের চর্চা করে আসছে। শিকারযুগে যৌথশক্তির উদ্বোধনে অপরিহার্য ছিল সমন্বিত উদ্যোগ আবেগের এবং তারই অনুষঙ্গী হয়ে সৃষ্টি হয়েছিল আদিম কাব্য-গীতি ও গোষ্ঠী-সঙ্গীত। গুহাবাসী মানুষ প্রাণ ধারণের প্রয়োজনে যে সঙ্গীত সৃষ্টি করেছিল তাই আদিম কাব্য-গীতি ও গোষ্ঠী-সঙ্গীত। গুহাবাসী মানুষ প্রাণ ধারণের প্রয়োজনে যে সঙ্গীত সৃষ্টি করেছিল, তা ছিল তখনকার জীবনের অঙ্গীভূত, সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তা স্বতন্ত্র সত্তা লাভ করে উপরি-কাঠামোয় পরিণত হয়। সমাজ ও জীবনের সঙ্গে সাহিত্য-শিল্পের সম্পর্ক নিরবধি কাল ধরেই থেকে গেছে অচ্ছেদ্য। বর্তমান কালেও যৌথ-সঙ্গীতের (ছাদ-পেটা, নৌকা-বাইচের গান) মাঝে আমরা আদিম সংস্কৃতির অপসৃয়মাণ নিদর্শন প্রত্যক্ষ করি।[১০] ইংরেজ সমালোচক ডেভিড ডাইচেচ-এর নিম্নোক্ত বক্তব্য এ প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ -

Primitive folk-song was probably communal improvisation to the rhythm of work...gradually it looses its communal authorship and the words are supplied by one more skilled in versification.[১১]

প্রাচীনকাল থেকেই শিল্প-সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের এই মৌলিক সম্পর্ক সভ্যতার বিবর্তনে রূপান্তরিত হয়েছে, তবে তার কেন্দ্রীয় প্রত্যয়টি থেকে গেছে অবিকৃত। সমাজের অনুপ্রেরণায় লেখক সাহিত্য নির্মাণ করেন। অবকাশরঞ্জন বা চিত্তবিনোদনের জন্য সাহিত্য-সৃষ্টি— সমাজবিজ্ঞানীর কাছে একথা গ্রহণযোগ্য নয়। সমাজের শৈল্পিক প্রতিফলন ঘটে সাহিত্যে, যা সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও বিকাশ বিবর্তনকে শিল্পরূপ প্রদান করে। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত ইংরেজ সমালোচক ক্রিস্ট্রোফার কডওয়েল-এর একটি চমৎকার উপমা উল্লেখযোগ্য।

"The developing complex of society. in its struggle with the environment, secretes poetry as it secretes the technique of harvest, as part of its nonbiological and specifically human adaptation to existence."[১৪]

বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের আঙ্গিক ও প্রকারণগত বৈশিষ্ট্য ও সমাজ- সংগঠনের প্রত্যক্ষ প্রভাবে বিকশিত এবং রূপান্তরিত হয়। সমাজসংগঠনের গুণগত পরিবর্তন কিংবা নতুন শ্রেণীবিন্যাসের প্রভাবে সাহিত্যে দেখা দেয় নতুন নতুন আঙ্গিক। বস্তুত, সাহিত্যের ভাষা ও আঙ্গিক তার বিষয়বস্তুর মতই সমাজের মূল থেকে উদ্ভূত হয়। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী সরোকিন-এর মন্তব্য খুবই প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, "Style is thus an eminently social phenomenon. Style, in some way, expresses the philosophy, the feelings and the values of a generation." সাহিত্যের ভাষা ও আঙ্গিক যে আকস্মিক নয়, কিংবা সমাজনিরপেক্ষও নয়, সে-সম্পর্কে সাহিত্যের সমাজবিজ্ঞানী দীপ্তিকুমার বিশ্বাস-এর অভিমত ও উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে — "The style in literature is also a social product. [১৬] বুর্জোয়া সমাজে আমরা আধুনিক উপন্যাসের উদাহরণ লক্ষ করি। বস্তুত, বুর্জোয়া বিকাশই জীবনের সমগ্রতাস্পর্শী সাহিত্য-রূপকল্প উপন্যাসের জন্ম-সম্ভাবনাকে সম্ভব করে তুলেছিল। বুর্জোয়া সমাজের উদার মানবতাবাদ, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যচেতনা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ উপন্যাসের বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছে। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সাহিত্যিক, আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের বীর শহিদ র‍্যালফ ফক্স-এর মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে —

The Novel is the epic-form of our modern. bourgeois society....It did not exist except in very rudimentary form before that modern civilization which began with the renaissance and like every new artform it has served its purpose extending and deepening human consciousness.[১৭]

পুঁজিবাদী সমাজের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সঙ্কট থেকে জন্ম নিয়েছে অ্যাবসার্ড নাটক। মধ্যযুগীয় সামন্ত সমাজের সঙ্গে সরাসরি জড়িয়ে আছে আখ্যানধর্মী বা রোমান্সমূলক। কাব্য — প্রাচীন সভ্যতার যুগে অপরিসীম সাধনায় রূপ লাভ করেছে রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, ওডেসি প্রভৃতি মহাকাব্য। সামন্তবাদ থেকে ধনতন্ত্রে রূপান্তরের পর্যায়ে গদ্য, গীতিকবিতা ও কথাসাহিত্যের বিকাশ ঘটে।[১৮] কেবল আঙ্কিক নয়, ভাষার ক্ষেত্রেও সামাজিক রূপান্তরের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ করা যায়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের দিকে যদি আমরা দৃষ্টিপাত করি তা হলে দেখতে পাব যে, স্থির-অঞ্চল গ্রামনির্ভর সমাজের ছায়াপাত ঘটেছে ভাষা ও ছন্দের উপর। কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বণিক পুঁজির প্রভাবে বাংলাদেশের উৎপাদন ব্যবস্থায় যে গতিশীলতা সঞ্চারিত হয়, তা পরিবর্তিত করে দেয় বাংলা কবিতার ভাষা ও ছন্দরীতিকে। তাই দেখি, মধ্যযুগীয় গতিহীন পর্যায়-ত্রিপদী ছন্দের শরীরেই ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কলকাতাকেন্দ্রিক বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণীর নবজাগরণের প্রভাবে মাইকেল মধুসূদন দত্ত নিয়ে আসেন প্রবল গতিশীলতা, প্রবহমাণ ছন্দদোলা এবং পঞ্চইন্দ্রিয়-শাসিত ভাষাশৈলী। দুই যুগে রচিত দুটি সাহিত্যকর্ম থেকে উদাহরণ উপস্থাপন করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে —

ক. ঘোড়ার চড়িয়া মর্দ্দ হাঁটিয়া চলিল।
কিছু দূর গিয়া পুনঃ রওনা হইল।।[১৯]

— এখানে সমাজের গতিহীনতার কারণে কবিতার ভাষায়ও এসেছে গতি সম্পর্কে বিভ্রান্তি। তাই কবি তাঁর নায়ককে ঘোড়ায় চড়িয়েও অজান্তে হাঁটিয়ে নিয়ে যান বোধের অপমৃত্যু ঘটিয়ে। কবিতার ছন্দের গতি এখানে 'ঘোড়ার চড়ে হেঁটে চলার মতই ক্লান্তিকর, বিষণ্ণ।'[২০] পক্ষান্তরে, নিম্নের উদাহরণে আমরা লক্ষ করবো সামাজিক গতিশীলতা ও সচলতা কীভাবে ভাষারীতি ও ছন্দসজ্জাকে গতিমান করে তুলেছে —

খ. রুষিলা দানব-বালা প্রমীলা রূপসী।
কি কহিলি, বাসন্তি? পর্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?[২১]

— ভাব এখানে চরণ থেকে চরণান্তরে প্রবহমান, এই প্রবহমাণতা সামাজিক সচলতারই শৈল্পিক চিত্র। কোম্পানি আমলে ভারতবর্ষের উৎপাদন ব্যবস্থায় যে গুণগত রূপান্তর সাধিত হয়, বস্তুত তারই প্রভাবে মাইকেলের কাব্যসাহিত্যে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয় সামাজিক পরিবর্তনশীলতার চিত্র। রাক্ষস রাবণকে তিনি নির্মাণ করেন ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতাকেন্দ্রিক নবজাগরণের মানসসন্তান রূপে। বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সমালোচক ক্ষেত্র গুপ্ত যথার্থই বলেছেন — ''মধুসূদনের লঙ্কায় বাংলাদেশের উনিশ শতকের উল্লাসিত জীবনবীর্য এবং পরাধীনতার গ্লানি যুগপৎ প্রতিফলিত। ফলে এই কাব্য জাতীয় জীবনের যুগ-বিস্তারকে অনেকখানি আয়ত্ত করেছিল।''[২২]

সাহিত্য ও সমাজের মধ্যে এই আন্তঃসম্পর্কের স্বরূপ নির্মাণ বর্তমান যুগের সমাজবিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। আমাদের দেশে এ জ্ঞানশাখাটি এখনো প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সে ভাবে অগ্রসর হয়নি। তবে এ বিষয়ে কোন কোন গবেষকের মধ্যে সচেতনতা দেখা যাচ্ছে, সেটাই আশাব্যঞ্জক দিক।

তথ্যনির্দেশ :


১. অরবিন্দ পোদ্দার, রেনেসাঁস ও সমাজমানস (কলকাতা; উচ্চারণ, ১৯৮৩), পৃ. ৯৩।
২. Neelima Ibrahim, "Society Reflected in 19th Century Bengali Litera ture," In Pierre Bessaignet (ed). Social Research in East Pakistan (Dacca : Asiatic Society of Pakistan 1964). P - 66.
৩. এ. কে. নাজমুল করিম, 'সাহিত্য ও সমাজবিজ্ঞান', এ. কে. 'নাজমুল করিম্ স্মারকগ্রন্থ (সম্পাদক ঃ মুহম্মদ আফসারউদ্দীন), (ঢাকা ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪), পৃ. ২৬.
৪. শ্রীশচন্দ্র দাস, সাহিত্য-সন্দর্শন (কলকাতা ঃ চক্রবর্তী-চ্যাটার্জী অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৭৬), পৃ. ১৭.
৫. E.B. Tylor, Primitive Culture (New York : Brentano's, 1924). P-1.
৬. Marx-Engels. On Literature and Art (Moscow : Progress Publishers, 1976). P. 37.

৭. এ. কে. নাজমূল করিম, পূর্বোক্ত, পাদটীকা ৩, পৃ. ২৬.
৮. পূর্বোক্ত।
৯. W. Stark. The Sociology of Knowledge (London : Routledge Kegan Paul. 1958). P - 45.
১০. আবুল আসেম চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যে সামাজিক নকশা ঃ পটভূমি ও প্রতিষ্ঠা (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮২), পৃ. ১৭।
১১. David Daiches. Literature and Society (London : Lawrence and Wishart. 1938). P - 35.
১২. Christopher Caudwell. IIlusion and Reality (Bombay : People's Pub lishing House. 1947). P - 12.
১৩. Kenneth Burke, "Literature as Equipment of Living" in Elizabeth and Tom Burns (ed) : Sociology of Literature and Drama : Selected Read ing (London : Penguin Books, 1973). PP-137-39.
১৪. Christopher Caudwell, Op cit, note No. 12.P.25.
১৫. Pitirim Sorokin. Social and Cultural Dynamics (London : Peter owen. 1957). P. 213.
১৬. Dipti Kumar Biswas, Sociology of Major Bengali Novels (Haryana : The Academic Press, 1974) PP 14-15.
১৭. Ralph Fox, The Novel and the People (London : Lawrence and Wishart, 1937). P. 27.
১৮. সাঈদ-উর রহমান (সংকলক ও অনুবাদক), মার্কস ও মার্কসবাদীদের সাহিত্যচিন্তা (ঢাকা ঃ একাডেমিক পাবলিশার্স, ১৯৮৫), পৃ. পাঁচ।
১৯. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, বাংলা কবিতার ছন্দ (ঢাকা ঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৯), পৃ. ২১-এ মধ্যযুগের এই কবিতাংশ উদ্বৃত হয়েছে।
২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯.
২১. মাইকেল মধুসূদন দত্ত, মেঘনাদবধ কাব্য, মধুসূদন-রচনাবলী, (কলকাতা ঃ সাহিত্য সংসদ, ১৯৮৪), পৃ. ৫৫-৫৬.
২২. ক্ষেত্র গুপ্ত, মধুসূদনের কবি-আত্মা ও কাব্যশিল্প (কলকাতা ঃ এ. কে. সরকার অ্যান্ড কোং, ১৩৯১): পৃ. ২৭৫.

# বাংলায় মুসলমানদের আগমণের সূত্রে সাহিত্য সংস্কৃতির স্থায়ী চিহ্নের অনুসন্ধান

**ড. অরিজিৎ ভট্টাচার্য***

বাংলায় মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস অনুধাবন করতে হলে এদেশে মুসলমানদের আগমণের ধারাটি প্রথম বুঝতে হবে। বাংলায় মুসলমানদের সামরিক সাফল্য প্রতিষ্ঠার পূর্বে মুসলমানদের আগমণ ও মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠা তিনটি পর্বে সংঘটিত হয়েছিল। প্রথম পর্বটির শুরু আট শতক থেকে। এসময় আরব বণিকরা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে চট্টগ্রাম ও নোয়াখালির সমুদ্র তীরে নোঙর ফেলেন। বাণিজ্যিক কারণে মুসলমান বণিকরা ধীরে ধীরে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারত হয়ে বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশের সমুদ্র তীরাঞ্চলে এসে পৌঁছেছিলেন। এই আরব বণিকরা বাণিজ্যিক কারণে দীর্ঘদিন উপকূলবর্তী অঞ্চলে অবস্থান করেন। এদের কেউ কেউ স্থানীয় রমণী বিয়ে করেন। এভাবে সীমিত আকারে ঐ অঞ্চলে একটি মুসলিম সমাজ প্রতিষ্টার সুযোগ সৃষ্টি হয়। অবশ্য এই বণিক শ্রেণির মধ্যে ধর্মপ্রচারের কোনো উদ্দেশ্য কাজ না করায় এ পর্বে মুসলিম সমাজ বিস্তার তেমন গতি পায়নি। তবে এই বণিক মুসলমানদের রচিত পথ ধরেই একদিন সুফি সাধকদের আগমণ মুসলিম সমাজ প্রতিষ্টার ভিত্তি রচনা এবং তারই ধারাবহিকতায় তের শতকের শুরুতে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পথ প্রস্তুত হয়। দ্বিতীয় পর্বে বাংলায় ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে সুফি সাধকদের আগমণে ঘটে। এই পর্বের সময়কাল ১১ থেকে ১৩ শতক। সেন শাসন যুগে তাঁরা খুব নির্বিঘ্নে ধর্ম প্রচার করতে পারেন নি। তৃতীয় পর্বের শুরু ১৩ শতক থেকে। এসময় বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার যাত্রা শুরু হয়।

বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পেছনে মুসলমান সেনাপতিদের সামরিক কৌশল আর যোগ্যতা যতটা না কাজ করেছিল তার থেকে শতগুণ বেশি ভূমিকা ছিল এদেশের তৎকালীন সমাজ সংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের। মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে বাংলার সমাজ সংস্কৃতির প্রকৃত অবস্থা অনুসন্ধানে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে আরো বেশি কিছুকাল পূর্বে। প্রকৃত অর্থে বাংলার সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি রচিত হয়েছিল হিন্দু-বৌদ্ধ এক মিশ্র সংস্কৃতির সাথে মুসলিম সংস্কৃতির সংস্পর্শ সৃষ্টির মাধ্যমে। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় দেখা যায় সাত শতকের শুরুতে রাজা শশাঙ্কের বৌদ্ধ দলনের প্রতিবাদে বাংলায় বৌদ্ধরা ক্রমে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বৌদ্ধরা শক্তি সঞ্চয় করতে করতে এক সময় আট শতকের দিকে রাজ ক্ষমতায় বৌদ্ধ ধর্মীয় পাল শাসকদের উত্থান ঘটে। তবে অনেকটাই উদারনৈতিক পাল শাসকদের প্রশাসনিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বাংলার রাজদণ্ডে দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটকের অধিবাসী সেন রাজারা অধিষ্ঠিত হন। বাংলার প্রশাসনিক কাঠামোতে মুসলিম শক্তির অধিষ্ঠান আলোচনা করতে গেলে এই

*অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রেক্ষাপটটি বোঝা বেশ জরুরি। পাল রাজারা বাংলার মাটির সন্তান ছিলেন। তাঁরা দেশের মানুষের চাওয়া পাওয়াকে মূল্য দিতেন। তাদের সময়ে মানুষ অনেকটা শান্তিতেই ছিল। কিন্তু সুদূর দাক্ষিণাত্য থেকে আগত সেন শাসকগণ বাংলার মানুষের চাওয়া পাওয়ার প্রতি ততটা গুরুত্ব দিতে না পারায় তাদের উপরে দিনের পর দিন বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়তে থাকে এদেশবাসী। একদিকে বৌদ্ধ ধর্মীয় পাল রাজাদের শাসন নীতি যেমন ছিল উদার ও মানবিক, বিপরীতে সেন শাসকদের শাসন নীতি ছিল অনুদার, সঙ্কীর্ণ ও দমনমূলক।

আর তাদের এই দমনমূলক শাসনের সময় মানুষ যখন অতিষ্ঠ ঠিক তখনই বিদেশী সুফিরা এদেশে আসতে থাকেন। সুফিদের মূল উদ্দেশ্য ধর্ম প্রচার হলেও প্রথমত জনগণের সাথে তাঁরা মিশে যেতে থাকেন। আর অত্যাচারে অতিষ্ঠ মানুষ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ঠাঁই পেয়ে যান সুফিদের খানকা হয়। সুফিদের সাফল্যে তৎকালীন তুর্কি যোদ্ধারাও অনুপ্রাণিত হতে থাকেন। ইতিহাসের একটু পেছনের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখি সেন শাসন আমলে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় হিন্দু-বৌদ্ধ নির্বিশেষে বাংলার সর্বস্তরের মানুষের উপর তাদের একাধিপত্য সাধারণ মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে মুসলিম আধিপত্য বিস্তারের পর ভারতের হিন্দু সমাজ নিভু নিভু অবস্থায় কোনো রকম টিকে ছিল। শ্রী চৈতন্যদেব যখন শাস্ত্রচর্চায় আমজনতাকে অধিকার প্রদান করেন তখনো তাঁর বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ সমাজ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। একটি বিষয় বলা যায়, তৎকালীন ব্রাহ্মণ শ্রেণী অন্তজ শ্রেণীকে সমাজে অবহেলিত নিগৃহীত করে রেখেছিল। তাই তাদের কাছে হিন্দু ধর্মের সেন রাজাদের পতনে ভিনদেশী ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মুসলিম শাসকদের অনাহূত মনে হয়নি। বরং সেন শাসনে অত্যাচারিত জনগণ নতুন একটি শাসকগোষ্ঠীর আগমণের পর তাদের আচরণ পরীক্ষা করার সুযোগই যেন নিতে চাইছিল। এই সেন মতদপুষ্ট ব্রাহ্মণরা শুধু ধর্মীয় আর সামাজিক বিধিনিষেধ আরোপ করেই তাদের কাজে ক্ষান্ত দেয়নি বরং মানুষের জীবন যাত্রায় সরাসরি নাক গলিয়ে তাদের সামাজিক জীবনের পাশাপাশি রাতের ঘুম দিনের স্বস্তিটুকু কেড়ে নিতেই যেন বদ্ধপরিকর হয়েছিল। ইতিহাসের সূত্র থেকে পাওয়া যায় সাধারণ হিন্দুদের সহায় সম্পত্তি গ্রাস করা এমনকী তাদের হত্যা করলেও ব্রাহ্মণগণ বিচারের আওতায় আসতেন না। 'সেখ শুভোদয়া'র সূত্র থেকে অত্যাচারী লক্ষ্মণসেনের শাসনামলে তার স্ত্রী বল্লভা আর তার শ্যালক কুমার দত্ত কর্তৃক সাধারণ মানুষের প্রতি নির্মম আচরণের কথা জানা যায়। পাশাপাশি বল্লাল সেনের তান্ত্রিক মতবাদের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ আর কৌলিণ্য প্রথা প্রজাগণ ও রাজশক্তিকে অনেকটাই বিপরীতমুখী অবস্থানে দাঁড় করায়। এই শ্রেণীভেদ ইসলাম বিস্তারের জন্য একটি পটভূমি রচনা করে যার উপরে দাঁড়িয়েই ধর্ম প্রচার করেছিলেন সুফি সাধকরা। তাদের কর্মে প্রাথমিক সফলতা চূড়ান্ত সফলতার রূপ নেয় সেন রাজবংশের পতনের পর থেকে।

বাস্তবতা বিচার করতে গিয়ে দেখা গেছে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় বাধা, ধর্ম পালনে নানাবিধ বিধিনিষেধ আর সমাজে লাঞ্ছনার পাশাপাশি সামন্তবাদী অর্থনীতি নিম্নশ্রেণীর মানুষকে আর্থিকভাবেও সর্বসান্ত করতে থাকে। জনমন বিভ্রান্তির ঠিক এই সময়েই আগমণ ঘটতে থাকে সুফি সাধকদের। মুসলিম শক্তির রাজ্য বিস্তারের সাথে সাথে সুফি-সাধকদের

বাংলাদেশের ভূখণ্ডে ধর্ম প্রচারের পথ অনেক বেশি সুগম হয়। যদিও তাঁদের কর্মকাণ্ডই রাজ্য বিস্তারের প্রাথমিক ভিত্তি রচনা করেছিল। প্রকৃত অর্থে সুফিদের জীবনযাত্রার সরলতা আর মানবতার জয়গান শুনে দলে দলে মানুষ জমায়েত হতে থাকে সুফিদের পতাকাতলে। ভারতের প্রেক্ষাপটে বিচার করতে গেলে ইসলাম প্রচার ঘটেছিল মূলত দুইভাবে। এর একটি সুফিয়ানা তরিকা আর অন্যটি তুর্কানা তরিকা। সুফিয়ানা তরিকা হচ্ছে সুফিসাধক কর্তৃক আল্লাহর প্রেমবাণী প্রচার করে ইসলামের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করা। অন্যদিকে তুর্কানা তরিকা হচ্ছে তুর্কি যোদ্ধাদের ধর্ম প্রচারে বল প্রয়োগ করা। বাংলায় মূলত সুফিয়ানা তরিকার মাধ্যমেই ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয়েছে। মানবতার বাণীতে আকৃষ্ট করে মানুষকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার প্রমাণ রয়েছে অনেক। বার শতকের শেষ বা তের শতকের শুরুর দিকে ভারতের রাজদণ্ড মুসলমান শাসকদের হাতে এলে তাঁরা বিভিন্ন দূরবর্তী প্রদেশ দখল করার চেষ্টা করতে থাকেন। তারই ধারাবাহিকতা হিসেবে মুহাম্মদ ঘোরীর সেনাপতি বখতিয়ার খলজী নদীয়া আক্রমণ করেন। তাঁর নদীয়া আক্রমণ ও লক্ষ্মণ সেনের পরাজয়কে দেশের প্রচলিত ইতিহাসে বখতিয়ার খলজীর বাংলা বিজয় বলা হলেও একে বাংলা বিজয় বলাটা একদমই ঠিক হবে না। কারণ তাঁর নদীয়া ও লখনৌতি বিজয় পশ্চিম ও উত্তর বাংলার কিয়দংশই জয় করা। বাংলার বাকী অংশে সেন রাজা ও স্থানীয় হিন্দু রাজাদের ক্ষমতাই প্রতিষ্ঠিত ছিল। বখতিয়ারের নদীয়া বিজয়ের তারিখ ও শাসক হিসেবে তাঁর মর্যাদা জানার সুযোগ এতকাল তেমন ছিল না। পরে বখতিয়ারের মুদ্রা বলে শনাক্ত করা মোহাম্মদ বিন সাম নামাঙ্কিত গৌড় বিজয়ের স্মারক মুদ্রা এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১২০৪ সালে নদীয়া বিজয়ের পরের বছর বখতিয়ার লখনৌতি বা গৌড় দখল করেন। তিনি শাসন ব্যবস্থার সুবিধার জন্য তার অধিকারকৃত পুরো অঞ্চলগুলোকে কয়েকটি ইকতা বা প্রদেশে বিভক্ত করেছিলেন। সামাজিক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে বখতিয়ার খলজি মসজিদ, মাদ্রাসা নির্মাণ করেন।

বখতিয়ার খলজির হাত ধরে বাংলার প্রচলিত সংস্কৃতির সাথে বিদেশী সংস্কৃতির সংমিশ্রণে নতুন ধারার চর্চার যে পথ রচিত হলো তা চলেছিল দীর্ঘদিন। এরপরে বখতিয়ার খলজির মৃত্যুর পর তার অনুসারী খলজিরা নিজেদের মধ্যে হানাহানিতে লিপ্ত হয়ে শাসন ক্ষমতা থেকে বিদায় নেয়। তারপর ১২২৭ সালের দিকে সুলতান শামস উদ্দিন ইলতুতমিশের বড় ছেলে নাসির উদ্দিন মাহমুদ গিয়াস উদ্দিন ইওয়াজ খলজিকে পরাজিত ও হত্যা করে বাংলা দখল করেন। ১২৮৭ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবনের মৃত্যু পর্যন্ত বাংলা দিল্লীর অধীনে ছিল। এই অবস্থায় লখনৌতির কোনো কোনো শাসক স্বাধীনতা ঘোষণার চেষ্টা করলেও তাদের সেই চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। পরবর্তিকালে বলবনের মৃত্যুর পর বুগরা খানের পুত্র কায়কাউস রুকন উদ্দীন কায়কাউস উপাধি ধারণ করে অনেকটা দিল্লির সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলা শাসন করতে থাকেন। এরপর বাংলার শাসন ক্ষমতায় আসেন শামস উদ্দিন ফিরুজ শাহ।

বাংলার মধ্যযুগের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূণ ঘটনাটা ঘটে ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দে ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে। যা মোগল অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত স্থায়ী

হয়েছিল। পরবর্তীকালে বাংলার শাসন কাঠামোতে কয়েকজন বিখ্যাত সুলতানের আবির্ভাব লক্ষ করা যায়। শামস উদ্দিন ইলিয়াস শাহ, সিকান্দর শাহ, গিয়াস উদ্দিন আযম শাহ ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। পরবর্তীকালে হিন্দু রাজা গণেশ বাংলার শাসন ক্ষমতায় কিছুদিনের জন্য অধিষ্ঠিত থাকলেও জৌনপুরের ইব্রাহীম শর্কির হস্তক্ষেপে গণেশ পরাভূত হন। এরপর পরবর্তী ইলিয়াসশাহী বংশের শাসনকালে আমরা রুকন উদ্দীন বারবক শাহ, শামসউদ্দিন ইউসুফ শাহ, জালালউদ্দিন ফতেহ শাহ প্রমুখ সুলতানের শাসনের পর হাবশী দাস বংশীয় শাসনের ফলে বাংলার শাসনকাঠামো অনেক দুর্বল হয়ে পড়ে। এরপর হুসেন শাহী বংশের চারজন সুলতান রাজত্ব করেন। তাদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন আলাউদ্দিন হুসেন শাহ ও নাসির উদ্দিন নুসরত শাহ। শাসক হিসেবে তাঁরা তাঁদের খ্যাতি ছড়িয়ে দেন।

মুসলিম আগমণের আদিপর্বে মুসলিম সংস্কৃতির সাথে হিন্দু সামাজিক রীতি ও প্রথার সংমিশ্রণের ফলে একটি নতুন ধারার সমাজ কাঠামো গড়ে উঠতে দেখা যায়। এখানে একটি বিষয় সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়েছে। তা হল গ্রহণ বর্জনের উদারতা। হিন্দু ধর্মে ব্রাহ্মণদের একচ্ছত্র আধিপত্য আর শ্রেণিভেদের বিপরীতে মুসলিম সমাজের সাম্য আর ভ্রাতৃত্বের বন্ধন হিন্দু সমাজকেও আলোড়িত করে। অন্যদিকে ভারতের বৈচিত্রময় হিন্দু সংস্কৃতি মুসলিম শাসকবর্গসহ অন্যান্যদের প্রভাবিত করে। রাজদণ্ড ধারণের পর মুসলিম শাসকবর্গের সভাসদ, রাজদরবারের কর্মচারী, অমাত্যসহ নানাপদ অলংকৃত করার মাধ্যমে হিন্দু জনগোষ্ঠী মুসলিম শাসকদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পায়। অন্যদিকে মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতিবেশী হিসেবেও হিন্দুগণ মুসলমানদের সংস্পর্শে আসেন। বাস্তবতার নিরীখে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় শাসকগোষ্ঠী শাসিত শ্রেণিকে তাদের আদর্শ, সংস্কৃতি আর জীবনধারার নানাদিকে প্রভাবিত করে থাকেন। উদাহরণ হিসেবে বৃটিশ শাসন আমলে এদেশীয় সংস্কৃতির উপর নানামুখী প্রভাবের কথা বলা যেতে পারে। একই ভাবে ভারতে মুসলিম শাসকগোষ্ঠীর রাজদণ্ড ধারণের পর এদেশীয় হিন্দুদের অনেকেই তাদের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হন। তৎকালীন কবি জয়ানন্দের বিবরণ হতে এর সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। মধ্যযুগের কবি জয়ানন্দ 'চৈতন্যমঙ্গল'-এ লিখেছেন 'জগাই ও মাধাই নামক দুইজন ব্রাহ্মণ ফারসি কবিতা আবৃত্তি করতো এবং মাংস ভক্ষণ করতো'। তিনি আফসোস করে বলেছেন 'বিধবা রমনীরা এখন মাছ মাংস ভালবাসতে শিখেছে পাশাপাশি অগুণিত ব্রাহ্মণগোষ্ঠীরও মাছ মাংসের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি রয়েছে'।

শূদ্র সব ছাড়িবেক ব্রাহ্মণের সেবা।।
পৃথিবী ছানির অবধূত যদি সতী।
মাংস মৎস্য খাবে বিধবা যুবতী।।
পিতা লঙ্ঘিবেক পুত্র গুরু লঙ্ঘিবেক শিষ্য।
বিধবা ব্রাহ্মণী সব খায়ব আমিষ্য।।

.....

ব্রাহ্মণে ছাড়িব একাদশীযজ্ঞ দান।
সূদ্র সব করিবেক পুরাণ বাখান।।

আমরা গোঁড়া মতাদর্শের কবি জয়ানন্দের দেওয়া সূত্র থেকে তৎকালীন সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা করতে পারি। এখানে আমরা দেখি মুসলিম শাসকগোষ্ঠীর রাজদণ্ড ধারণ তৎকালীন গোড়া মতাদর্শের হিন্দুসমাজের সংস্কৃতির নানা দিক, খাদ্যাভ্যাস, শ্রেণিভেদ, নারীর সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদা, পোশাক-পরিচ্ছদসহ নানা আঙ্গিকে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিল। মানিকচন্দ্র রাজার গানে একজন হিন্দু রাজপুত্রের পাগড়ী পরিধান করার কথা জানা যায়। অন্যদিকে নতুন কলিঙ্গ শহর পত্তনের পর সেখানকার কালকেতুর রাজদরবারে যাওয়ার সময় জনৈক কায়স্থ ভাড়ুদত্তও পাগড়ি পরেছিলেন বলে জানা যায়। এছাড়া মুসলিম ধর্মীয় নানা অনুষ্ঠানে আগত হিন্দু অতিথিদের অনেকে মুসলমানদের মতো পোশাক পরিধান করতেন। মুহাম্মদ কবির রচিত বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ মধুমালতীতে যুবরাজ মনোহরের পাগড়ি ও আবা নামক ঢিলা জামা পরিধানের তথ্য রয়েছে যা একান্তই মুসলিম সমাজে প্রচলিত ছিল। অন্যদিকে প্রখ্যাত হিন্দু কবি রামায়ণের কৃত্তিবাস, মনসা মঙ্গলের রচয়িতা বিজয়গুপ্ত, মনসা বিজয়ের রচয়িতা বিপ্রদাস পিপিলাই এবং বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের চৈতন্য ভাগবতের মধ্যে তৎকালীন সম্ভ্রান্ত হিন্দু রমণীদের মুসলমানি পোশাক পরতে দেখা যায়। বিবরণীতে তাঁদের ঘাগরা, কামিজ, সালোয়ার, ওড়না এবং চোলি ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। পাশাপাশি অনেক মুসলমান সমাজে প্রচলিত নানা ধরণের সুগন্ধিও ব্যবহার করতেন। এই সকল তথ্যসূত্রের আলোকে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ দীনেশচন্দ্র সেন মন্তব্য করেছেন মুসলিম আমলে হিন্দু অভিজাত সম্প্রদায় মুসলিম সম্প্রদায়ের মতোই পোশাক পরিধান ও কেশবিন্যাস করতেন। শুধু সিঁথিতে সিঁদুর আর কপালে তিলক বা চন্দনের ফোঁটার উপস্থিতিতে তাদের হিন্দু হিসেবে চিহ্নিত করা সম্ভব হতো। অন্যদিকে হিন্দু সমাজ থেকে সাধারণ মুসলিম সমাজে লুঙ্গি, ফতুয়া, ধুতি পাঞ্জাবীর মতো পোশাক প্রচলিত হতে দেখা যায়। অনেক মুসলিম রমণীকে ভারতীয়দের আদলে শাড়িতে অভ্যস্ত হতে দেখা যায়। পরবর্তিকালে শাড়িই হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে প্রায় সকল ভারতীয় রমণীদের সাধারণ পোশাকে পরিণত হয়। তবে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই এই দেশের আবহাওয়া জলবায়ুর কথা বিবেচনা করে আঁটসাঁট পোশাক পরিধান করতো না বললেই চলে। প্রায় সবাই ঢোলা পোশাকে অভ্যস্ত ছিল।

দুই ধর্মের পারস্পরিক সংস্পর্শের একটি জ্বলন্ত উদাহরণ হিসেবে দেখতে পারি হিন্দু সমাজে প্রচলিত লক্ষ্মীসরার মতো মুসলিম সমাজে কদমরসূল এর প্রচলন। গবেষণালব্ধ তথ্যে অনুমান করা যায় এদেশে মাজারের জনপ্রিয়তা হিন্দু সমাজের পুজা থেকে চলে আসতে পারে। যদিও বিষয়টি নিয়ে বিশ্লেষণ করার অবকাশ আছে। হিন্দু সমাজে প্রচলিত পণ প্রথা থেকে মুসলিম সমাজের মধ্যেও প্রবেশ করেছে যৌতুক নামক ভয়াবহ এক সামাজিক ব্যাধি। তৎকালীন ভারতের হিন্দু আর মুসলিম রাজদরবারের মধ্যে একটা বিষয়ই কেবল ভিন্ন ছিল আর তা হচ্ছে মুসলিম প্রশাসনে আচার অনুষ্ঠান পালন করার পাশাপাশি মুসলমানদের গুরুত্বপূর্ণ রাজকার্যে নিয়োগ করতেন। মুকুন্দরামের চণ্ডিমঙ্গল কাব্যের তথ্যে জানা যায় গুজরাটের নতুন শহরের রাজা কালকেতু তার সৈন্যদলের অশ্বারোহী বাহিনীর

জন্য বেশ কয়েকজন মুসলিম সৈন্য নিয়োগ করেন। এ থেকে ধারণা করা যায় হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক সময়ের আবর্তে অনেকটা নৈকট্য লাভ করে।

ইতিহাস ও সাহিত্যিক নানা সূত্র থেকে দেখা যায় সেন শাসনকালে এসে হিন্দু সম্প্রদায় ব্রাহ্মণদের মাধ্যমে নানা শোষণ নির্যাতনের শিকার হতো। কিন্তু মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর মুসলমানদের সমাজের সংস্পর্শে এসে হিন্দু সমাজে তা অনেকাংশে খর্ব হয়। তাদের অধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করে সাধারণ হিন্দু জনগোষ্ঠী অনেকাংশেই মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হয়। প্রেক্ষাপট বিচার করলে আমরা বলতে পারি মুসলিম শাসকদের ভূমিকায় ব্রাহ্মণদের একাধিপত্য খর্ব করার পরেই সাধারণ শ্রেণীর হিন্দুরা তাদের ধর্মগ্রন্থগুলো পাঠ করা, বিশ্লেষণ করা কিংবা সমালোচনা করার সুযোগ পায়। গোয়ালা রামনারায়ণ গোপ, ভাগ্যমন্ত ধুপি প্রমুখ নিচু শ্রেণির হিন্দুর পাশাপাশি নাপিত, হাঁড়ি ও সাহারাও কাব্যচর্চা ও বিদ্যালাভের সুযোগ পায়। আমরা এর অনুষঙ্গ হিসেবে গণমানুষের দেবী মনসাকে নিয়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কাব্য লিখিত হতে দেখি। তবে হিন্দু সমাজের এহেন পরিবর্তনের পেছনে মুসলিম শাসকবর্গের ভূমিকাকে নেহাৎ অচ্ছ্যুৎ করে দেখার অবকাশ ছিল না। ইতিহাস যাচাই করতে গিয়ে দেখা যায় বাংলার হিন্দুদের সমাজ সংগঠনে সুলতানদের রাজদরবারে কর্মরত হিন্দু কর্মকর্তা কর্মচারীদের একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল। আলাউদ্দিন হুসেন শাহ এই দিক দিয়ে সবার চেয়ে বেশি এগিয়ে ছিলেন। দবির খাস ও সাকর মল্লিক উপাধি-খ্যাত দুই ভাই রূপ-সনাতন ছিলেন হুসেন শাহের দরবারের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা। সুখময় মুখোপাধ্যায়ের দেওয়া -বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর স্বাধীন সুলতানদের আমলে- কিছু খোঁড়া যুক্তিকে কেন্দ্র করে পরবর্তিকালের ইতিহাসবিদ রিচার্ড ইটন একটু তর্ক করার অবকাশ খুঁজে পান। তাঁর মতে রূপ-সনাতন-এর উচ্চপদে নিয়োগ তৎকালীন সময়ে হিন্দু মুসলিম সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক প্রমাণে যথেষ্ট নয়। তাঁরা এটিকে নিছক রাজনৈতিক কৌশল বলে দাবি করেছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে কেবল রাজনৈতিক কৌশল হলেও রাজনৈতিক সম্পর্কও মানবিক সম্পর্ককে অস্বীকার করতে পারে না।

যদিও ইতিহাস থেকে আমরা জানি মহাপ্রভুর সমকালীন শিষ্যবর্গের নব্বই শতাংশেরও বেশি উচ্চবর্ণের হিন্দু। তবু মহাপ্রভুর তিরোধানের পরে নিজেদের আভিজাত্যের অচলায়তনের বেড়া ভেঙে যাওয়ায় বৈষ্ণব প্রভাবিত নিম্নশ্রেণির হিন্দুদের প্রতি ব্রাহ্মণরা খড়্গহস্ত হয়ে পড়ে। কারণ তাঁদের মনে এক ভীতির সঞ্চার হয় যে এই নিচুশ্রেণী যদি একবার শিক্ষা-দীক্ষা আর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের থেকে এগিয়ে যায় তাহলে কোনোদিনই আর ব্রাহ্মণরা সমাজে তাঁদের অবস্থান ফিরে পাবে না। যদিও ব্রাহ্মণদের এই ভয় কোন ঐতিহাসিক আকারে সমর্থিত, তা আমরা জানি না। তৎকালীন হিন্দুদের সামনে জ্বলন্ত উদাহরণ হিসেবে দাঁড়িয়ে গেল মুসলমানদের পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআন। যদি স্বয়ং সুলতান থেকে শুরু করে সবাই পড়লে জাত না যায়, হিন্দু ধর্মগ্রন্থ তাহলে এক ব্রাহ্মণ বাদে অন্যরা পড়লে বা চর্চা করলেও কোনো জাত যাবে না। মুসলমান শাসকদের কৌশলে বিভিন্ন নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা যেখানে নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ পেয়ে তাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে পেরেছিলেন সেখানে অনেক ব্রাহ্মণও পরিস্থিতির চাপে পড়ে

তাদের নীতিগত দিকে পরিবর্তন আনতে বাধ্য হন। এই সময়ে ব্রাহ্মণ্যবাদে সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে বিশেষত কায়স্থ শ্রেণির হিন্দুরা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি সাধনে সক্ষম হয়েছিল। বিদ্যাচর্চার দ্বার উন্মুক্ত হওয়াতে এই সকল ব্যক্তিবর্গ তাদের প্রতিভার সাক্ষর রেখে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি সাধনে সহায়তা করেছিল। প্রখ্যাত কবি গুণরাজ খান বা মালাধর বসু, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, যশোরাজ খান, কাশীরাম দেব, বিজয় গুপ্ত, লোচনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, গোবিন্দ দাস প্রমুখ কবি সাহিত্যিকদের প্রায় সবাই ছিলেন বৈদ্য কিংবা কায়স্থ শ্রেণীর।

বাংলা রাজদণ্ডে মুসলিম শক্তির আগমণের পর সব থেকে উল্লেখযোগ্য সামাজিক সংস্কার ছিল কুলীন বা কৌলিন্য প্রথার উচ্ছেদকরণ। কুলীন প্রথার মাধ্যমে একটি শ্রেণিকে সমাজের সিংহাসনে বসানো ও অপর জাতিগোষ্ঠীর সম্মান ভূলুণ্ঠিত করা হয়েছিল সেন শাসক বল্লাল সেনের আমলে। সেন রাজা লক্ষ্মণ সেনের আমলে হিন্দু ব্রাহ্মণদের একাধিপত্য, মাত্রাতিরিক্ত গোঁড়ামি আর অনুদার ধর্মনীতি হিন্দু সমাজের ভিত্তিকে একেবারেই দুর্বল করে দিয়েছিল। ব্রাহ্মণদের ভূমিকার কারণে এসময় হিন্দু ধর্ম একটি বিশেষ শ্রেণির প্রাধান্য আর কিছু আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের সারসংক্ষেপ হয়ে যায়। তথাকথিত সুবিধাভোগী লোভী আর সুবিধাবাদী ব্রাহ্মণগণ যেখানে তাদের নিচু শ্রেণীকে ঘৃণার পাশাপাশি মুসলিম শাসকদের ম্লেচ্ছ এবং অস্পৃশ্য বলে কৃত্রিমভাবে দূরে থাকার ভান করতো সেখানে নিচু শ্রেণির হিন্দুরা সামাজিকভাবে একটি মর্যাদা লাভের আশায় ধীরে ধীরে মুসলমানদের সাহচর্যে আসতে শুরু করে।

ব্রাহ্মণ্যবাদ বিকাশে পুরোহিতদের একাধিপত্য সমাজে নারীর অবস্থানের সাথে কোনো ভোগ্যপণ্য কিংবা পশুর অবস্থানের তেমন পার্থক্য রাখেনি। কিন্তু মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠার পর নারীরাও তাদের কৃতিত্বের যথাযথ মর্যাদা পেতে শুরু করে। আসলে তখনকার সমাজকে মুসলিম সমাজ বলাটা ঠিক হবে না। তখন আসলে গ্রহণ বর্জনের উদারতার মধ্য দিয়ে হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতির একটি মডারেট রূপ বাংলায় বিরাজ করছিল। কুলীন উপাধিধারী ক্ষমতালোভী আর স্বার্থান্বেষী ব্রাহ্মণদের নানামুখী চোখরাঙানি এমনি সমাজচ্যুত করার হুমকিকেও অগ্রাহ্য করে নিচু শ্রেণির হিন্দুরা মুসলমানদের সাহচর্যে আসতে থাকে। ফলে তারা বিভিন্নভাবে লাভবান হয়। অন্যদিকে মুসলমানরাও একান্ত বিশ্বস্ত এদেশীয় একটি শ্রেণির সহায়তা লাভ করে তাদের শাসন কাঠামোর ভিত্তি মজবুত করার পথ পেয়েছিল। বিশেষত ব্রাহ্মণদের সাথে বিরোধের ফলে সমাজচ্যুত হয়ে হিন্দু বেশ কয়েকটি নতুন দলের জন্ম দেয়। তারা পরবর্তিকালে মুসলমানদের সাথেই যুক্ত হয়েছিল। বিশেষত এই সব সমাজচ্যুত হিন্দুদের মধ্যে শেরখানী, শ্রীমন্তখানী আর পিরালি শ্রেণীর প্রভাবেই কৌলিন্য প্রথা তিরোহিত করা সম্ভব হয়। তবে অবাক করার বিষয় হলো এই গোঁড়া ব্রাহ্মণদের কেউ কেউ সামাজিক অবস্থান সংহত করতে মুসলিম শাসকবর্গ এমনকি নিচু শ্রেণীর হিন্দুদের সাথে পর্যন্ত আপোস করেছে। দেবীবর ঘটক নামক এক ব্রাহ্মণের পরিবারের বেশ কয়েকজন সদস্যকে ব্রাহ্মণরা সমাজচ্যুত করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরিবার রক্ষার্থে তিনি একটি নিয়ম বের করেন। যার আওতায় তারা তাদের প্রাক্তন সামাজিক অবস্থান উদ্ধার করতে

সক্ষম হন। ঠিক এর পাশাপাশি কায়স্থ সমাজেও একটি সংস্কারের ছোঁয়া লাগে। একজন কায়স্থ প্রধান পরমানন্দ বসু কায়স্থদের সমাজে প্রচলিত কৌলিণ্য প্রথার উপর ভিত্তি করে বিয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিয়ম কানুনে বেশ কিছু পরিবর্তন সাধন করেন।

ধর্মপূজা নামে একটি লৌকিক ধর্মীয় বিশ্বাস হিন্দু সমাজের উপর মুসলিম সমাজ ও জীবনাচারণের প্রভাব প্রমাণের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠা সম্প্রদায়ের মূল বৈশিষ্ট্য এরা একেশ্বরবাদী ছিলেন। ধর্মঠাকুর নামে পরিচিত এই সম্প্রদায় সকল ধর্মমতের মানুষেরা একাত্ম হয়ে ও মিলেমিশে বসবাস করার পক্ষপাতী ছিলেন। এই বিশেষ সম্প্রদায়ের উত্থান পরবর্তীকালে হিন্দু সমাজে ভেদাভেদ ও বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস রোহিতকরণে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। পরবর্তীকালে অনেকটাই মুসলিম সুফি মতবাদের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব মতবাদেও শ্রেণীভেদের বদলে মানুষের ঐক্যের প্রতি জোর দেওয়া হয়। প্রকৃত অর্থে মুসলিম সমাজের দৌর্দণ্ড প্রতাপের মাঝে শ্রী চৈতন্যদেবের মানব ধর্ম প্রচারের জন্যই হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সমাজ টিকে যায়। বৈষ্ণব মতাদর্শী কীর্তনীয়ারা তাই যত বেশি মুসলিম সমাজের সাথে বিরোধিতায় জড়িয়েছিলেন তার থেকে ঢের চক্ষুশূল হন ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুদের। বর্তমান সময়ের মধ্যযুগের আঁকর সূত্র বিশ্লেষণ না করা কোনো কোনো ইতিহাস চর্চাকারী বিশেষত ভারতবর্ষের সাবঅল্টার্ণগ্রুপ-এর চোখে দুই একটি অসঙ্গতি অনেক বড় হয়ে ধরা পড়েছে। তারা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বলার চেষ্টা করেছেন মুসলিম শাসকবর্গ কীর্তনীয়াদের অবাধ কীর্তনে বাধা দিয়েছেন। কিন্তু চৈতন্যচরিত কাব্যে হিন্দু কবিদের জবানী থেকেই জানা যায় চৈতন্য বিরোধী অভিযোগ যাচাই করে নদীয়ার কাজী কোনো দোষ দেখতে পাননি। তাই তিনি চৈতন্যদেবকে স্বাধীনভাবে তাঁর কীর্তন প্রচারের অনুমতি দিয়েছিলেন।

মুসলিম অধিকারের আদিপর্বে বখতিয়ার খলজীর মুদ্রা আবিষ্কারের পর থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে হিন্দু প্রতীকের ব্যবহার, মসজিদের নামকরণ, তোঘরা লিপিতে সরস্বতীর বাহন রাজহাঁসের সাঁতার কাটার দৃশ্যে হিন্দু প্রভাবের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। পাশাপাশি হিন্দু সমাজে নানা ধর্ম সম্প্রদায়ের উত্থান তৎকালীন সময়ে হিন্দু মুসলিম সুসম্পর্কের প্রতিই ইঙ্গিত করে।

বিচ্ছিন্ন দুই একটি শত্রুতার বিষয় বাদ দিলে হিন্দু মুসলিম সমাজে উন্নত একটি সামাজিক সম্পর্ক ছিল। মোঘল আক্রমণের সময় বারভুঁইয়াদের নেতৃত্বে হিন্দু মুসলিম সম্মিলিত বাহিনীর প্রতিরোধেই মোঘল বাহিনী বার বার পর্যুদস্ত হয়। বিশেষত শ্রীপুরের রাজা চাঁদ রায় ও কেদার রায় সোলায়মান লোহানীকে তাদের সেনাবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করেন। এগুলো আর কিছুই নয় হিন্দু-মুসলিম বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও পারস্পরিক বিশ্বাসের প্রমাণ। ভুলুয়া তথা বর্তমান নোয়াখালীর হিন্দু জমিদার অনন্ত মাণিক্য তার বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করেছিলেন মির্জা ইউসুফ বারলাসকে। কবি বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্য হতে জানা যায় চাঁদ সওদাগরের জাহাজে অনেক মুসলমান কর্মচারী ছিলেন। পাশাপাশি চাঁদ সওদাগরের ছেলে লক্ষীন্দরের বিয়েতে নয়শত মুসলিম গায়ক যোগদান করেছিলেন। আর চাঁদ সওদাগর তার ছেলের বিয়েতে হাসনাহাটির কাজিকে প্রচুর পান প্রদান করেছিলেন।

এই রকম আরো অনেক বিষয় আছে তা তৎকালীন সমাজে হিন্দু মুসলিম সুসম্পর্কের প্রতি ইঙ্গিত করে।

**সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :**

১। অমলেন্দ দে, বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, ১৯৭৪, রত্না প্রকাশ, কলকাতা।
২। অশীন দাশগুপ্ত, ইতিহাস ও সাহিত্য, ১৯৮৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা।
৩। বিমানবিহারী মজুমদার, সুখময় গঙ্গোপাধ্যায়, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, ১৯৭১, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা।
৪। রিচার্ড এম ইটন, দি রাইজ অফ ইসলাম এণ্ড বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার ১২০৪-১৭৬০, ১৯৯৬, ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস, ইউ এস এ।
৫। সুমিত সরকার, বেয়ন্ড ন্যাশানালিস্ট ফ্রেমস, ২০০২, পার্মানেন্ট ব্ল্যাক, নিউ দিল্লি।

**এবং প্রান্তিকের বই-**

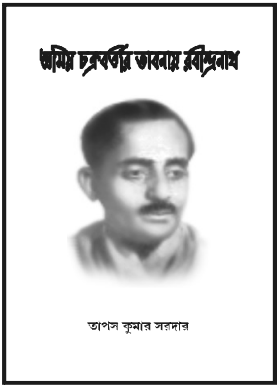


**অমিয় চক্রবর্তীর ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ**

**তাপস কুমার সরদার**

**মূল্য : ১৩০ টাকা**

রবীন্দ্র-পরবর্তীকালে রবীন্দ্রকাব্যের প্রেমচেতনা, রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরবিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এ যুগের কবিদের পথচলা শুরু। অবশ্য আধুনিক কবিদের অনেকেই রবীন্দ্র-বিদ্বেষী ছিলেন না। এই গোষ্ঠীর অন্যতম কবি অমিয় চক্রবর্তী, যিনি ছোট থেকেই রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী। তিনি সময়ে-অসময়ে-দুঃসময়ে রবীন্দ্রনাথের স্নেহের স্পর্শ লাভ করেছেন। শৈশব এবং যৌবনের ঊষালগ্নে রবীন্দ্রনাথের মতো প্রখর ব্যক্তিত্ব ও বিশ্বখ্যাত কবির সান্নিধ্যলাভ তাঁর জীবনে গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছে। রবীন্দ্র-সান্নিধ্যে থেকে জগৎ ও জীবনকে দেখেছেন। তা সত্ত্বেও পারিপার্শ্বিক সচেতনতা, সমাজ চেতনা, মানবপ্রেমের দৃষ্টিতে এসেছে পরিবর্তন। তবে এ পরিবর্তন অন্যান্য আধুনিক কবিদের সঙ্গেও মেলে না। স্বতন্ত্র তাঁর কবিদৃষ্টি, স্বতন্ত্র তাঁর কাব্য-জগৎ। তাঁর কাব্য-কবিতায় রবীন্দ্র-প্রভাব সর্বদা না থাকলেও তাঁর জীবনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল আজীবন। এককথায় কবি অমিয় চক্রবর্তীর চিন্তা-ভাবনার জগতের বিচিত্র প্রসঙ্গকে উপস্থাপিত করেছেন লেখক।

# ‘কোয়েলের কাছে’ : পালামৌর কাছে

**তাপস রায়***

বুদ্ধদেব গুহ আজ জনপ্রিয় বাংলা কথাসাহিত্যিক। বাংলা উপন্যাসকে পাঠকের কাছে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান যথেষ্ট। তিনি শিল্পের মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন বন-জঙ্গল, নদ-নদী, পশু-পাখি এবং অরণ্যে লালিত পালিত সাধারণ গরীব মানুষদের সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। নারী পুরুষের প্রেম বিরহের রোমাঞ্চকর অনুভুতিগুলিও তাঁর কলমে অপ্রতিদ্বন্দ্ব। ঝাড়খণ্ডের বনভুমি যেমন অনেক পশু শিকারীকে আকর্ষণ করে তেমনি অরণ্য প্রেমিক বহু সাহিত্যিককেও আকর্ষণ করে। এই তালিকায় বাংলা সহিত্যের একাধিক শিল্পীর নাম উঠে আসে। তাদের মধ্যে একদিকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যদিকে বুদ্ধদেব গুহ। বুদ্ধদেব গুহ মানুষটি বহু গুণের অধিকারী। চিত্রশিল্পী, গায়ক, প্রশাসক, সাহিত্যিক সব শাখাতেই তিনি সফল। তাঁর ‘কোয়েলের কাছে’ উপন্যাসে এই সব গুণের নিখুঁত মেল বন্ধন ঘটেছে। ফলে উপন্যাসে উঠে আসা বিভিন্ন ঘটনাগুলি বাস্তবোচিত রূপ পেয়েছে। পালামৌ জঙ্গলের সামগ্রিক ছবি যে ভাবে লেখক বর্ণনা দিয়েছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর ও অভাবনীয়। উপন্যাসটি পড়তে পড়তে পাঠক-পাঠিকারা সৌন্দর্যে, রোমাঞ্চে, উৎকণ্ঠায় শিহরিত হয়ে উঠে। নারী পুরুষের যে প্রেম বিরহের কথা আছে তা উপন্যাসটিকে অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে।

‘বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃ ক্রোড়ে’, পুরানো পালামৌ-এর এই প্রবাদ - পরিণত বাক্যটিকে মনে রেখেই আরেকটু এগিয়ে বলা যায়, ‘অন্যরা অন্যত্র সুন্দর, বুদ্ধদেব গুহ জঙ্গল মহলে’ সমালোচকের এই উক্তি যথার্থ। ‘কোয়েলের কাছে’ উপন্যাসে পালামৌ’র রূপ রস যে ভাবে ধরা পড়েছে তার নিরিখে এই মন্তব্যকে অস্বীকার করা কোন উপায় নেই। অরণ্য ভুমিকে ভালোবেসে বাংলা উপন্যাস জগতে বিস্ময় বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধি এনেছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অরণ্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সুন্দর। হিংস্র প্রাণী যে নেই তা নয়, তবু তারা অরণ্যকে হিংস্রতার প্রতীক রূপে গণ্য করে না। অন্যদিকে বুদ্ধদেব গুহের অরণ্যভুমি হিংস্র, ভয়ংকর কিন্তু ভীষণ সুন্দর। বলা চলে বুদ্ধদেব গুহের হাতে অরণ্যের দুই রূপকই সাহিত্যে উদ্ভাসিত হয়েছে। ‘কোয়েলের কাছে’ উপন্যাসে লেখকের দৃষ্টি অনায়াসেই প্রসারিত হয়েছে। আরণ্যক জনজীবনের দিকে। এখানে ঠিক আদিবাসী জনজীবনকে কেন্দ্র করে গল্প লেখেননি। পালামৌর অরণ্য পটভূমিকে কেন্দ্র করে উপস্থাপিত করেছেন নাগরিক নরনারীর প্রেম ভালোবাসার চিত্র। উপন্যাসটি পরিপূর্ণরূপে ঝাড়খণ্ডের একটি ভৌগোলিক

*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ইন্দাস মহাবিদ্যালয়।

চিত্র। সর্বত্র আছে পালামৌ'র অরণ্য প্রকৃতির বণনা যেমন রোমান্টিক তেমনি হিংস্র আদিমতার প্রতিচ্ছবি। বাস্তব ও রোমান্সের সমন্বয়ে এই উপন্যাস হয়ে উঠেছে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

প্রকৃতি এই উপন্যাসে প্রধান চরিত্র। এই প্রকৃতির সূত্র ধরেই যে কটি কথা উঠে এসেছে তারা কম কৌতূহলের নয়। মারিয়ানার প্রেম, সুগতর নীরব প্রেম, সুমিতা বৌদির কামনা বাসনা, জগদীশ পান্ডের হিংস্রতা, যশয়ন্তের আদিমতা, লালতির সোহাগ, ঘোষদার কৃত্রিমতা, সুগান সিং এর দুঃখ—নদীর মতই প্রাণবান এক প্রবাহ। এছাড়া পালামৌ অঞ্চলে চোরো, খেরওয়াড় এবং ওঁরাওদের জীবনধারার কিছু কিছু স্কেচ উঠে এসেছে। সব মিলিয়ে ঝাড়খণ্ডের বনভুমির অসাধারণ চিত্র। এই অরণ্যভুমির বিন্যাস হেমিংওয়ের 'গ্রিন হিলস অব আফ্রিকা'র সঙ্গেই তুলনীয়। স্বয়ং লেখক পালামৌকে যে ভাবে দেখাতে চেয়েছিলেন তা পাঠকের কাছে কতটা ধরা পড়বে সে নিয়ে বেশ উদ্বেগেই ছিলেন। সেই উদ্বেগের কিছুটা অংশ তুলে ধরলেই উপন্যাসে পালামৌ বর্ণনার লেখকের আন্তরিক প্রচেষ্টার দিকটা অনুধাবন করা যাবে। ''কোয়েলে কাছে'' লিখেছিলাম ষাটের দশকে, অত্যন্ত যত্ন করে এবং তিন বছর সময় নিয়ে। লেখাটি কলকাতাতেই লিখলেও প্রত্যেক ঋতুর বর্ণনা সেই ঋতুতেই বসে লিখেছিলাম এই ছেলে মানুষী বিশ্বাসে যে, তাতে পাঠক পাঠিকাদের কাছে পালামৌকে পরিপূর্ণভাবে তার রূপ রস গন্ধ স্পর্শ সমেত উপস্থাপিত করতে পারব''। লেখকের এই ইচ্ছা পূর্ণমাত্রায় সফল তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। কারণ এই উপন্যাসে শুধু অরণ্য নয়, নরনারীর জীবনধারাও পরিপূর্ণ রূপে উঠে এসেছে।

প্রকৃতিই এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। লেখক এই পালামৌ বনভূমির সৌন্দর্য যেমন একদিকে তুলে ধরেছেন তেমনি এই বনভূমির ভয়ংকরতার দিকটিকেও দেখিয়েছেন। জ্যোৎস্না রাত্রে জঙ্গলের সৌন্দর্যের বর্ণনা লেখক দিয়েছেন, মনের গহনে এক কল্পিত রূপ তৈরি হয়ে অজানা আনন্দে পুলকিত হয়ে ওঠে। প্রতি ক্ষণে ক্ষণে সেই শিহরিত আবেগ আবিষ্টিত হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক তুলে ধরার ক্ষেত্রেও লেখকের কলমের মায়াবী স্পর্শ পাঠককের মনকে এক স্বর্গীয় সুখে ভরিয়ে দেয়। যখন লেখক বলেন ''এঁকে বেঁকে পাথরের পর পাথরের উপর দিয়ে ঘন জংগলের ছায়া নিবিড় সুবাসিত পথেই আমরা নেমে চলেছি। পথের দুধারে ছোট ছোট লঙ্কার মত কি কতগুলো গাঢ় লাল ফুল ফুটেছে। এমন লাল যে মাথার মধ্যে আঘাত করে। ঝনঝন করে স্নায়ুগুলো সব বেজে ওঠে।.....আর ওই যে ফিকে বেগুনি রঙের ফুলগুলো দেখছ, ঐ ডান দিকে, ওগুলোর নাম 'জীর হুল'। এই গরমেই ওদের ফুটা শুরু হল। গরম যত জোর পড়বে ওরা তত বেশি ফুটবে। ওদের রঙে তত চেকনাই লাগবে। ভালো করে দেখলাম বেগুনি ফুলগুলোকে। ছোট ছোট ঝোপ, ফুলগুলো হাওয়ায় দুলছে, যেন গান গাইছে, যেন ভীষণ খুশি। রঙটা ঠিক বেগুনি বললে সম্পূর্ণ বলা হয় না, কিশোরীর মিষ্টি স্বপ্নের মত রঙ, যে স্বপ্ন আচমকা

ভেঙে যায়নি।" কোয়েল ও সুহাগি নদীর বর্ণনাতেও এই জাতীয় মায়ার ইমেজ সর্বত্র লেগে আছে। পাশাপাশি এই অরণ্যের ভয়ংকর দিকের কথা যখন আসে তখন উৎকণ্ঠা আর আতঙ্কে হৃদয় অস্থির হয়ে ওঠে। ভয়ংকরতার দিক দু ভাবে বর্ণিত হয়েছে। এক. প্রাকৃতিক তাণ্ডব ও জন্তু জানোয়ারদের থেকে দুই. মানুষের আদিমতার দিক থেকে। পশু শিকার এই অঞ্চলের মানুষজনের রক্তে। এমনকি চাকরি করতে যারা আসে তাঁরাও এই নেশাতে নিজেদেরকে সঁপে দেয়। এই নেশার কবলে পড়ে কত তরতাজা মানুষ যে জন্তু জানোয়ারদের শিকার হয়েছে তার হিসাব নেই। পশু শিকারে সাময়িক আনন্দ কত স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করেছে তা বলাই যায়। যেমন মারিয়ানাদের ভালোবাসার মানুষ সুগত, পশু শিকারে গিয়ে চিতার আক্রমণে প্রাণ হারায়। ফলে মারিয়ানার জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। এই ভাবে বাঘ, ভাল্লুকের আক্রমণে কত নিরিহ মানুষের প্রাণ গেছে। অন্যদিকে মানুষ জন কর্তৃক ভয়ংকরতার পরিবেশ রচিত হয়েছে। ইগোকে কেন্দ্র করেই এই আদিম ভয়ংকরতা এই জঙ্গলে মানুষের মধ্যে লক্ষ করা যায়। জগদীশ পাণ্ডে ও যশয়ন্তের মধ্যে যে বিবাদ তা ভয়ংকরতার চরম আদিমতার নিদর্শন। এরা পারে না এমন কোন কাজ নেই। নিজেদের প্রয়োজনে যেমন কাউকে আপন করে আবার অপ্রয়োজনে ছুঁড়ে ফলে দিতেও পিছপা হয় না। এদের নৈতিকতা আর পাঁচ জনের মত নয়। এরা জীবনকে দেখে অন্য ভাবে। মানুষ যে কত ভয়ংকর হতে পারে জগদীশ পাণ্ডে তার উদাহরণ।

মানুষ যেখানে সেখানেই প্রেম-প্রীতি, কামনা-বাসনা, ছলনা থাকবেই। 'কোয়েলের কাছে' উপন্যাসেও সেই চিত্র আছে। পালামৌ জঙ্গল এই উপন্যাসের পটভূমি। কিন্তু প্রেম-প্রীতি, কামনা-বাসনা, ছলনার কথা এই অঞ্চলের আদিবাসী নর-নারীর চেয়ে নাগরিক নর-নারীদের দিকটি বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। নাগরিক মানুষজন এসেছে চাকরির প্রয়োজনে। কিন্তু বনভুমিও তাদেরকে আকর্ষণ করেছে। আর তারা আকর্ষিত হয়েছে এই অরণ্যের নর-নারীদের সরলতা আর নারীদের সুঠাম গঠনের প্রতি। একথা ঠিকই কিন্তু লেখক কোন একটা কে না দেখিয়ে তাদের সামগ্রিক দিককেই তুলে ধরেছেন। ঔপন্যাসিক কয়েকটি চরিত্রকে সামনে রেখে 'ভালোবাসার' ব্যাপার নিয়ে নরনারীর নানা ভাবনার দিক সুকৌশলে ব্যক্ত করেছেন। কখনো তাত্ত্বিকতা উঠে এসেছে কখনো বা দেহগত দিকও উঠে এসেছে। তিনি ভালোবাসাকে নানা ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। ভালোবাসা বা প্রেম নিয়ে যুগ যুগ ধরে যে নানা বিতর্ক দেখা গেছে লেখক সেই বিতর্কের মধ্যে অন্য মাত্রা এনেছেন। প্রেমের অভিমুখ বর্ণনা করতে গিয়ে কেউ কেউ বলেন প্রেমের অনুভূতি হল প্ল্যাটনিক আবার কেউ কেউ বলেন ফিজিক্যালি। অর্থাৎ প্রেম হয় মনগত আরেক শ্রেণির মতে দেহ ছাড়া প্রেম হতেই পারে না। যেভাবেই তার ব্যাখ্যা হোক না কেন লেখক বলতে চেয়েছেন ভালোবাসা ভালবাসাই। কোনটা ঠিক আর কোন ভুল এর কোন হ্যাঁ বা না তে উত্তর হয় না। ভালোবাসার অনুভুতির জন্য হাজার হাজার মাইল থেকে ছুটে আসা যায়। যার জন্য সারা জীবন একা

থাকা যায়। যার আলতো ছোঁয়া সারা জীবন এক বিশেষ অনুভূতিতে ভরিয়ে রাখে। মারিয়ানা আর সুগতর প্রেম যেন এই রকমই অনুভূতি। এই প্রেমকে বলা চলে নিকষিত হেম। তথা কথিত সমাজের চোখে হয়তো অবৈধ্য। প্রেম কি আর নির্দিষ্ট ফ্রেমে বাঁধা নিয়মে চলে। সে চলে তার স্বাভাবিক গতিতেই। মারিয়ানা আর সুগতর প্রেম গভীর, নীরব অথচ আকর্ষণীয়। সুগত বিবাহিত, মারিয়ানা সব জানে তা সত্ত্বেও সুগতের স্ত্রীর প্রতি তার কোন ঈর্ষা নেই। বরং অনেক বেশি দায়িত্ব ও কর্তব্য সচেতন। মারিয়ানা ও সুগতর কয়েকটি চিঠি তাই প্রমাণ করে। এই প্রেমের নির্মম পরিণতি আমাদেরকে ভীষণ ভাবে কষ্ট দেয়। চিতা বাঘের আক্রমণে সুগতর মৃত্যু সত্যিই নির্মম। একটা মৃত্যু সমস্ত জঙ্গলের আয়োজনকেই বেশামাল করে দেয়। অন্য দিকে যশোয়ন্ত এক বৈচিত্র্যময় পুরুষ। তার কাছে ভালোবাসার সংজ্ঞা আলাদা। ''লালতিকে তুমি ভালবাস? যশোয়ন্ত আবার হাসল। মাঝে মাঝে গোঁফের ফাঁকে ও কেমন হাসি হাসে। বলল, নিশ্চয় ভালবাসি। শরীরের ভালোবাসা। আর মনের ভালোবাসা?.....মনের ভালোবাসা তো সবাইকে বাসা যায় না লালসাহেব। সে একজনকেই বাসি। তবে কি জানো, সে ভালোবাসার তো গাঁ বদল হয় না; সে ভালবাসা এক গাঁয়েই থাকে। জীবন একজনকেই তেমন করে ভালোবাসা যায়। জীবনের অন্য ভালোবাসাগুলো সব সেই একই ভালোবাসার ভেঙে যাওয়া আয়নার টুকরো টুকরো। টুকরোগুলো এক জীবনে দু'হাতে কুড়িয়ে জড়ো করেও আর সে ভাঙা আয়না জোড়া লাগে না। যে আয়না ভাঙে; তা ভাঙেই''। ''মনের ভালোবাসা আর শরীরের কখনো এক জনের কাছ থেকে তুমি পাবে না। যদি তা ঘটে, সে এক দুর্ঘটনা বটে। তা না হওয়াই ভাল। .....কেউ একই সঙ্গে শরীর আর মনের ভালোবাসার চাহিদা মেটাতে পারে''। যশোয়ন্ত একটা আদিম মানুষের মতো কালো পাথরের স্তূপ বেয়ে চাঁদের রাতের তরল সায়ান্ধকারে নালার মধ্যে তরতরিয়ে নেমে এসে আমার হাত ধরল। বলল, ভাগতে কিঁই ইয়ার? আরে বৈঠো। তুম সে কুচভি ছিপনা নেহি। তার পর উপরের দিকে সে ডাকল। উতারকে আ লালতি। লালতি সলজ্জে বলল, নেহি। কিঁউ? নাঙ্গা? ইস লিয়ে?'' অন্য দিকে সুমিতা বৌদিকে যশোয়ন্ত মন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। তাদের কথাপোকথনে তা স্পষ্ট''। সুমিতা বৌদি যশোয়ন্তর মাথার একরাশ চুল হাত দিয়ে এলোমেলো করে দিয়ে ওর গালের সঙ্গে গাল ছুঁয়ে বসে রইলেন। আমার সেই সায়ান্ধকালেও মনে হল, যশোয়ন্তের সারা শরীরে কেমন একটা শিহরণ খেয়ে যেতে লাগল। যশোয়ন্ত বৌদির হাত দুখানি একটানে নিয়ে নিজের হাতে মুঠি করে ধরল। তার পর হাতের তেলো দুটি ওর ঠোঁটে একবার ঘষল। অনেকক্ষণ নিজের হাতে সুমিতা বৌদিকে বললেন, এই তুমি কাঁদছ? — এই বোকা! তুমি কাঁদছ? ছি ছি ছি, কি বোকা। তুমি কাঁদছ? এই বলতে বলতে বৌদির গলার স্বরও কান্নায় বুজে এলো।'' এই হল যশোয়ন্তের মনগত ভালবাসার রূপ। যখন যশোয়ন্ত বলে ''বুজলে লালসাহেব, নরম পাখির মত মহুল ফুলের মত, মেয়েদের শরীর নিয়ে অনেক নাড়লাম চাড়লাম। শিঙ্গাল হরিণের মতো হরিণীর

দলের সঙ্গে ছায়ায় রোদ্দুরে অনেক খেললাম। কিন্তু সুমিতা বৌদির মত কাউকে দেখলাম না। মনের ভালবাসার গাঁ বদল আমার হল না"। যশোয়ন্তের কথা আর কাজের মধ্যে যে একটা ভারসাম্য আছে এই স্বীকারোক্তি থেকেই বোঝা যায়। তবে তার নীতি আলাদা যা মানতে অসুবিধা হয়, কিন্তু কোনটি ঠিক বা কোনটি ভুল সে বিচার করা সহজ নয়।

লালসাহেবের স্মৃতিচারণের মধ্যে দিয়ে যে জীবন উঠে এলো তা নানা দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। এতো রোমাঞ্চকর ও উৎকণ্ঠায় ভরা যা কখনই ভুলা যাবে না। লেখকের জবানী দিয়েই বলা যায় ''পাথরটাই বসে বসে অনেক কথাই মনে হয়। যে দিন যশায়ন্তের সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিল, সেদিনকার কথা। এই পাথরের পাশে কত বার চড়ুইভাতি হয়েছে। সুমিতা বৌদি 'কা' ও 'বা' দিয়ে হিন্দি বলা শিখিয়ে ছিলেন আমাকে এখানে। সুমিতা বৌদিকে কখনই ভোলবার নয়। তিনি যে ঘোষদার স্ত্রী, এই কথাটা ভাবলেই কষ্ট হয়। আমার বান্ধবী মারিয়ানা, মারিয়ানার বন্ধু সুগত, সকলের স্মৃতি নিয়েই যাবো। মনে ভাবি, হারাবো না কিছুই। মনের কোনে দুর্মূল্য আতরের মতো এই ভালো লাগা, এই ভালোবাসা; এই সুগন্ধ বয়ে বেড়াবো অনুক্ষণ; আজীবন। যতদিন বাঁচি"। এই ভাবেই 'কোয়েলের কাছে' উপন্যাসের সৌন্দর্য ও প্রেম প্রীতির আখ্যান নির্মিত হয়েছে। যা আমাদেরকে গভীর ভাবে ভাবায়। 'বহু ধরনের প্রশ্ন আসে, কোনো উত্তরই মনকে পরিপূর্ণ শান্তি দিতে পারে না। আসলে জঙ্গল আর প্রেম এই রকমই যার রহস্য উন্মোচন করা যায় না কখনোই।


**এবং প্রান্তিকের প্রকাশিত**

**অপরূপা**
**পার্থ খাঁ**
**মূল্য : ১০০ টাকা**

জীবনের 'ছন্দ' ছাড়া যেমন গতি হয় না, ঠিক তেমনই 'বই' ছাড়া শিক্ষার বলয় পূর্ণ হয় না। এবং প্রান্তিকের প্রকাশনায় 'অপরূপা' কবিতা সংকলনখানিতে রয়েছে শিশুদের নির্যাস মনোবিদ্যার কবিতাগুচ্ছ, যৌবনের আবেগে প্রেমের কবিতা, জীবন 'পারাপারের' শেষ পরিণতি, কবিতার বুৎপত্তি থেকে 'লোকগীতি' ও 'প্রকৃতি পর্যায়ের' গানের উৎস সমন্বয় সাফল্যের শীর্ষে, 'অপরূপা'র প্রকাশ এক অনবদ্য প্রয়াস। এই প্রয়াসের সম্পূর্ণ সফলতায় ঝরে পড়ুক- প্রিয় ভালোবাসার মানুষদের অকৃপণ আর্শীবাদ।

# মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই-নহে কিছু মহীয়ান : নজরুল

**ড. নন্দকুমার বেরা***

নজরুল ইসলামের সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি মানবদরদী কবি। তিনি মানুষকে ভালোবাসতেন, মানুষের সুখে-দুঃখে, ব্যথা-বেদনার কথা তাঁর রচনায় বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে, তাই নজরুলের কাব্য আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখি রবীন্দ্র যুগে যে কয়েকজন কবি তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) তাঁদের অন্যতম। বাঙলা সাহিত্যে বিদ্রোহী কবি হিসেবে তিনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন পাঠকের মনে। নজরুলের জীবনে বৈচিত্র্য লক্ষণীয় তেমনি তাঁর রচনায়ও বৈচিত্র্য উল্লেখ করার মতো আজও বিদ্রোহ কবি কাজী নজরুল আমাদের প্রেরণার উৎস। নজরুল শুধু কবি হয়ে থাকতে চাননি। একদিকে দেশ, সমাজ আর যুগের যেমন তিনি প্রতিনিধি, তেমনি অন্যদিকে সারা বিশ্বের নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের তিনি প্রতিনিধি তাঁর সৃষ্ট কবিতাগুলি তাই যুগ যুগ ধরে সর্বহারা মানুষের ফরিয়াদ, তারই জয় ঘোষণা।

নজরুল দারিদ্র্যের জ্বালা বুকে নিয়ে প্রত্যক্ষ করেছিলেন মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই-নহে কিছু মহিয়ান মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্য তিনি লেখনী ধারণ করেছিলেন। তাঁর বুকে ছিল সৈনিকের সাহস। তাঁর বিদ্রোহ, শোষণের বিরুদ্ধে, শাসনের বিরুদ্ধে, অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে। তাই রবীন্দ্রনাথের ভক্ত হয়েও তিনি রবীন্দ্রনাথের পথের পথিক হতে পারেননি, তিনি হয়েছেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাই যুগের হুজুক কেটে গেলে তাঁর কবিতার সমাদর হবে কি না সে সম্বন্ধে দ্বিধাহীন ভাষায় কবি ঘোষণা করেছেন-

বর্তমানের কবি আমি ভাই ভবিষ্যতের নই নবী,
কবি ও অকবি যাহা বলো মোরে মুখ বুজে সই সবি।

প্রথম মহাযুদ্ধের সমাপ্তি এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূত্রপাতের মধ্যবর্তী সময়টুকু নজরুল ইসলামের কবি প্রতিভার বিকাশকাল। কবিগুরু রবীন্দ্র তখন বলাকা-পূরবী অর্থাৎ সাহিত্যের মধ্যগগনে বিরাজ করছিলেন। সে সময় কালবৈশাখীর ঝড়ের মত বাংলা সাহিত্যে নজরুলের আর্বিভাব। কালবৈশাখীর ঝড় যেমন চকিত আর্বিভাবে বিশ্ব সংসার এক মুহূর্তের মধ্যে বিমোহিত করে দেয় ঠিক তেমনি রবীন্দ্রকাব্য সাধনার মধ্যাহ্ন লগ্নে নজরুলকাব্য এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। তাই বিদ্রোহী কবিতায় কবি নিজেকে স্থান দিয়েছেন বিশ্ব সংসারে সকলের উপরে। হিমালয়ের শিখরও যেন তাঁর কাছে অবনত-

বল বীর
বল উন্নত মম শির,
শির নেহারি আমারি নত-শির ওই শিখর হিমাদ্রির

*অধ্যাপক, স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগ, রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচি।

বল বীর
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি
ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া
খোদার আসন আরশ ছেদিয়া
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ববিধাত্রীর

কাজী নজরুল ইসলাম বিদ্রোহী কবি১ তাঁর বিদ্রোহ সকল অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে নজরুল যে সময় কবিতা লিখেছেন সে সময় মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তিনি এই অন্যায়, অসাম্য, অত্যাচার ও অবিচার লক্ষ্য করেছিলেন, সে সময় বিদেশী শাসকের শাসনদণ্ডে পরাধীন ভারতবাসীর প্রাণ ওষ্ঠাগত তাই নজরুল চেয়েছিলেন এ জুলুমবাজ শাসনের অবসান হোক। পরাধীনতার নাগপাস ছিঁড়ে ভারতবর্ষ স্বাধীন হোক। তাই সোচ্চার কণ্ঠে নজরুল ঘোষণা করেছিলেন তাঁর বিদ্রোহ চলবে ঠিক ততোদিন পর্যন্ত-

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না-
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত

এই প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচকের মন্তব্যটি উল্লেখনীয়-যে-সময়ের মানুষ ও শিল্পী ছিলেন নজরুল-সেই সময়ে প্রতিটি ভারতবাসীই সম্ভবত ছিলেন মনে মনে বিদ্রোহী। সেই বিদ্রোহ ঔপনিবেশিক শাসকের বিরুদ্ধে, ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে পরাধীনতার গ্লানির বিরুদ্ধে তখন বাঙালির মনে জেগে উঠেছে ক্ষোভ ও প্রতিবাদ। পরিস্থিতি ও সেই সাক্ষও দেয়। সেই প্রতিবাদী বাতাবরণের উদ্দীপনার মধ্যেই অতিবাহিত হয়েছে নজরুলের কিশোর বয়স। বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের সূত্রপাত ১৯০২ খ্রিস্টাব্দ থেকেই। স্থাপিত হল বিপ্লবী দল যুগান্তর ও অনুশীলন। বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন উত্তাল হল ১৯০৫ সাল থেকে, ১৯০৯-১০ সাল পর্যন্ত তার অগ্নিতাপ বালকদের মনকেও স্পর্শ করেছে। অরবিন্দ ঘোষের জাতীয়তাবাদী প্রতিকার আহ্বান, মানিকতলা বোমার মামলা ও ক্ষুদিরামের ফাঁসির উত্তেজনা ১৯০৮ সালে। তার পর প্রথম মহাযুদ্ধের রণধ্বনি। নজরুল বালক বয়সেই এই পরিমণ্ডলের তড়িত-প্রবাহস্পৃষ্ট হয়েছিলেন। তারপর প্রথম মহাযুদ্ধের সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রশক্তির বিন্যাস সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন তিনি। তখনই ঔপনিবেশিক প্রভুত্বের স্বরূপ অনুভব করেছিলেন নজরুল। পরাধীনতার গ্লানি তাঁর অন্তরে মুদ্রিত হয়েছিল আগেই। শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয়দের প্রভুত্ব বিস্তারের প্রবণতা তাঁর কাছে স্বচ্ছ হয়ে উঠেছিল। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ সঞ্চিত হয়েছিল তাঁর হৃদয়ে। স্পষ্ট ভাষায় রাজনৈতিক শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঘোষণাও তিনি করেছেন কোনো কোনো কবিতায়। সেখানে চিহ্নিত হয়েছে উৎপীড়কের অবস্থান, সেখানে ঘোষিত হয়েছে বিদ্রোহের কারণ।৪

নজরুলের বিশ্বাস ছিল একমাত্র বিদ্রোহের মধ্য দিয়েই স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব। তাই লিখেছেন - কাণ্ডারী তব সম্মুখে ঐ পলাশির প্রান্তর,

বাঙালীর খুনে লাল হল যেথা ক্লাইভের খঞ্জর
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকার
উদিবে সে রবি আমাদের খুনে রাঙিয়া পুনর্বার

শুধু রাজনৈতিক অব্যবস্থা নয়, অর্থনৈতিক অব্যবস্থার ফলেও সাধারণ মানুষের জীবন দূর্বিষহ হয়ে উঠেছিল, মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি ও ধনিক শোষণের নির্মম বেড়াজাল বিস্তার করেছে এবং যারা শ্রমজীবী তাদের রক্তশুষে নিয়ে দিনের পর দিন স্ফীতোদর হচ্ছে, তাই নজরুল শ্রমজীবি মানুষের প্রতিনিধি হয়ে সোচ্চার কণ্ঠে বলেছেন -

তোমরা রহিবে তেতালার পরে আমরা রহিব নীচে
অথচ তোমাদের দেবতা বলিব সে ভরসা আজ মিছে ১১গ

সামাজিক বিদ্রোহেও নজরুল বিদ্রোহী। তাঁর এ বিদ্রোহের মূলে রয়েছে তাঁর স্বদেশ প্রীতি, তাই অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন -

জনগণে যারা জোঁক-সম শোষে তারে মহাজন কয়,
সন্তান সম পালে যারা জমি, তারা জমিদার নয় ১
মাটিতে যাদের ঠেকে না চরণ,
মাটির মালিক তাঁহারই হন-
যে যত ভণ্ড ধড়িবাজ আজ সেই তত বলবান ১৭

নজরুল ছিলেন মাটি ও মানুষের কবি। যে সব মানুষ শ্রম ও ঘামের উষ্ণতা দিয়ে গদ্যময় পৃথিবীটাকে নিজের সৌন্দর্য বর্ধন করে চলেছেন নজরুল তাদেরই কবি। এ তো গেল রাজনৈতিক ও সামাজিক বিদ্রোহের কথা। এছাড়াও তাঁর মধ্যে আছে প্রেমের বিদ্রোহ, ধর্মীয় বিদ্রোহ ও সাহিত্যের বিদ্রোহ, মানুষ হয়ে মানুষের সমাজে বেঁচে থাকার বিদ্রোহ। নজরুলের এ সব বিদ্রোহ যতদিন মানব সমাজে থাকবে ততদিন এ বিদ্রোহও থাকবে। নজরুলও আমাদের মানব জাতির মধ্যে থাকবেন।

**সঙ্কেত সূত্র :**

১। আমার কৈফিয়ত-সর্বহারা, পৃষ্ঠা ৯৪
২। বিদ্রোহী-অগ্নিবীনা, পৃষ্ঠা ১
৩। ঐ ঐ
৪। সৃষ্টি স্বাতন্ত্র্যে নজরুল-সুমিতা চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা ৪৮
৫। কাণ্ডারী হুশিয়ার - সর্বহারা, পৃষ্ঠা ৬৫
৬। কুলিমজুর - সাম্যবাদী, পৃষ্ঠা ৪৪
৭। ফরিয়াদ-সর্বহারা, পৃষ্ঠা ৯০

# সরস্বতী ব্রাহ্মী

**ডা. সুবলকুমার মাইতি***

আমাদের অতি পরিচিত ব্রাহ্মীশাক বেদের যুগ থেকে নানা নামে আখ্যায়িত হয়ে আসছে। বেদোক্ত নাম সোনা থেকে সোম, এটিই ব্রাহ্মী ভোজ। 'সোমা ইতি সোমো ব্রাহ্মী ভোজং' — মহীধর এভাবেই ভাষ্য করেছেন অথর্ববেদের বৈদ্যককল্পের সূক্তটিকে। অর্থাৎ যেটি সোমা, সেটিই সোম, আর সেটাই ব্রাহ্মী। বিশেষ ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে — শরীরের শিরোভাগে একে অভিষিঞ্চিত করা হয়। শুক্রের পবিত্রতা এবং শরীরের বল রক্ষা করে। চণ্ডের সমান যশোলাভ হয়। সোমই ওজ, তারই ক্ষরণে মধুমেহ আসে। সোম নামক এই ভেষজটি ওজ ধাতুকে রক্ষা করে, অকাল মৃত্যু রোধ করে।

চরক সংহিতায় বলা হয়েছে — অগ্নিসোমাত্মকত্বেন ওজঃ, ত্বনাশনাৎ নাশমৃদ্ধতি — অর্থাৎ এই বস্তুটি আগ্নেয় ও সোমীয়, একাধারে অগ্নিধর্মী ও জলধর্মী। ওজঃ ক্ষয় হলেই মৃত্যু, এক্ষেত্রে ব্রাহ্মী তা প্রতিরোধ করে। চরকের মত — এটি অসাধারণ গুণ-সম্পন্ন ভেষজ। ভেষজটি রসায়ণ - গুণসম্পন্ন, অপস্মার (মৃগী) রোগনাশক। সুশ্রুতে বলা হয়েছে — মেধা ও আয়ুবর্ধক ভেষজের মধ্যে ব্রাহ্মী শ্রেষ্ঠ।

পরবর্তী কালের ভাবপ্রকাশ (ষোড়শ শতক) গ্রন্থে বলা হয়েছে — ব্রাহ্মী ও থানকুনী সমগুণ-সম্পন্ন। যার ফলে দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মীর চেয়ে থানকুনীর কদর বেশি। কোথাও কোথাও ঔষধ তৈরির ক্ষেত্রে একসঙ্গে দু'টোকেই ব্যবহার করা হয়। দু'টিই জলাসন্ন ভূমিতে জমে। বর্ষাকালে অধিক বৃদ্ধি হলেও সারাবছর পাওয়া যায়। লতানে উদ্ভিদ। মাটিতে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যায় এবং প্রত্যেকটি গাঁট থেকে শেকড় বেরোয়, ব্রাহ্মীর বোটানিক্যাল নাম Becpa monnieri (L) Pennell. আর থানকুনির নাম হলো centella asiatica (L) Urban. একটা মজার ব্যাপার হলো—আজকের দিনে কি চিকিৎসক আর কি সাধারণ মানুষ, তাঁদের মনে গেঁথে গেছে — থানকুনি আমাশা হলে আর ব্রাহ্মী বুদ্ধি কম হলে খাওয়া দরকার।

থানকুনি হলো পরের ভাবনা, এখন ব্রাহ্মীকে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করা যাক্।

বেদের সূত্র ধ'রে পরবর্তীকালের অনুসন্ধানে দেখা যায় — ব্রাহ্মীকে চলতিবর্মি, বির্মি, ব্রহ্মী নামে ডাকা হয়। তার পোশাকী নামকরণ করা হয়েছে গুণবত্তার নিরিখে। যেমন — সোমবল্লী, কপোতবঙ্কন, সরস্বতী প্রভৃতি। এছাড়া প্রদেশভেদে নানা নামকরণ। আমরা সরস্বতী নামটি এজন্য বেছে নিলাম যে, বুদ্ধি, স্মৃতি, মেধা তথা পাণ্ডিত্যের ধারক ও বাহক দেবী সরস্বতী আর এই ভেষজটি এসব গুণকে বৃদ্ধি ও রক্ষা করে।

আয়ুর্বেদ মতে ব্রাহ্মীর গুণ হলো — তিক্ত - কষায়-মধুর, রস সম্পন্ন শীতবীর্য, সারক, লঘু, মেধাজনক, আয়ুবর্ধক, স্বরবর্ষক, স্মৃতিপ্রদ, রসায়ণ, শুক্রবর্ধক, পুষ্টিকর কুষ্ঠ, পাণ্ডু,

*ভারত সরকারের আয়ুর্বেদ গবেষণা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত চিকিৎসা-বিজ্ঞানী, বনৌষধি গবেষক আয়ুর্বেদ চিকিৎসক।

মেহ (মধুমেহ সহ সব রকমের মেহ বা প্রমেহ), রক্তদোষ, কাস, শোথ, জ্বর, বিষদোষ, উন্মাদ, অপস্মারে, বসন্তরোগ, কোষ্ঠবদ্ধতা, মূতকৃচ্ছ্রতা প্রভৃতি নাশক।

নব্যের সমীক্ষায় আমরা দেখতে পাই — স্বাদে তেতো, সূত্রকারক, কামোদ্দীপক, মৃদু বিবেচক ও রক্তপরিষ্কারক। এটি চিন্তাশক্তি, পড়াশোনার ক্ষমতা ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে। যেহেতু এটি মস্তিষ্কের কোষকে রক্ষা করে, সেহেতু এই ভেষজটি অ্যালঝাইমার্স রোগটিকে প্রতিরোধ করতে পারবে। ব্রাহ্মী আমাদের উদ্বেগ, দুঃশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠা, ব্যাকুলতা, স্নায়বিক দুর্বলতা, বুক ধড়াফড় (হার্টের গতিবৃদ্ধি), মাথার যন্ত্রণা, অবসন্নতা, ঘুমের ব্যাঘাত, মনসংযোগের অভাব, হজমে বিস্বতা (বদহজম) প্রভৃতিকে প্রতিরোধ করতে পারে। এটি অপস্মার ও অন্যান্য মনোবিকারে কার্যকর। লিভারের ক্রিয়াকে বৃদ্ধি ক'রে শরীরকে বিষদোষমুক্ত (Toxin মুক্ত) করতে পারে। রক্তে শর্করার পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত কমে গিয়ে নবজাতকের মস্তিকে যে ক্ষতি হয়, তা ব্রাহ্মী পূরণ করতে সক্ষম। এটির বেদনাশক গুণ রয়েছে। যেক্ষেত্রে অতিরিক্ত যন্ত্রণানাশক ঔষধ খাওয়ার দরকার হয়, সেক্ষেত্রে ব্রাহ্মীর ব্যবহারে, ঔষধের মাত্রা কমে, কার্যকারিতা বাড়ে। শরীরে অযথা ফোলা, লাল লাল চাকা চাকা দাগ, এলার্জি কমাতে পারে। ব্রাহ্মীতে অত্যন্ত ক্ষমতা সম্পন্ন অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আছে, যা কিডনীর পক্ষে খুবই উপকারী। সব বয়সের মানুষের স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে, দ্রুত মননশীলতা বৃদ্ধি পায়। মস্তিষ্ক কোষের ক্ষয় পূরণ করার ক্ষমতা থাকায় ভেষজটি মন ও মস্তিস্কের পক্ষে খুবই উপকারী। নারী ও পুরুষ উভয়েরই যৌনক্ষমতা বৃদ্ধির সহায়ক। এক কথায় বার্ধক্য প্রতিরোধে এটির বিশাল ভূমিকা রয়েছে। এটি ব্লাড প্রেসারকে স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে।

যেকোন স্থানের ব্রাহ্মী ব্যবহার করা ঠিক নয়। যেসব মাটিতে আর্সেনিক, ক্যাডমিয়াম, সীসা, পারদ প্রভৃতি ক্ষতিকর দ্রব্য থাকে, সেখানকার ব্রাহ্মীতে এসব মাত্রাতিরিক্ত থাকবে। বালি, গোবরসার ও সামান্য মাটি মিশিয়ে এটির চাষ সহজে করা যেতে পারে। টবে ভালভাবে চাষ করা যায়। জিঙ্ক, কপার, প্রভৃতি দ্রব্য ও এটি সহজে গ্রহণ করে নেয়।

কয়েকটিক্ষেত্রে ব্রাহ্মীর ব্যবহার সাবধানে করতে হয়, অথবা করতে নেই।

১। গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী মা — একটি ব্যবহার করবেন না।

২। যাঁদের হার্টের গতি কম (Bradycardio) তাঁরা ব্যবহার করবেন না।

৩। পাকস্থলী, অর্শ প্রভৃতিতে ক্ষত থাকলে ব্যবহার না করাই ভাল।

৪। অ্যাজমা ও এসফাইসিমা রোগে ব্যবহার করতে নেই।

৫। অন্ত্রে কোন অবরোধ বা ব্লকেজ থাকলে ব্যবহার করবেন না।

৬। ব্রাহ্মী সেবনে কোন কোন ক্ষেত্রে পাকস্থলীতে থিচখিচ ভাব, বমিবমি ভাব, মুখ শুকিয়ে যাওয়া, পাৎলা পায়খানা, অবসাদ প্রভৃতি আসতে পারে। তখন মাত্রা কমাতে হতে পারে। অথবা বন্ধ করার দরকার হলে তা করা উচিত। যেহেতু এটি থায়রডের হরমোন বৃদ্ধি করতে পারে, সেজন্য যাঁরা থায়রয়েডের সমস্যায় ভুগছেন বা ওষুধ খাচ্ছেন, তাঁরা ব্যবহারের পূর্বে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেবেন। এটি মূত্রকর স্বভাবের, তাই মূত্রসংবহন তন্ত্রে কোনপ্রকার অবরোধ থাকলে সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত।

এবার এটির লোকায়তিক ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলি নিয়ে আলোচনায় আসা যাক্।

**লোকায়তিক ব্যবহার:**

ব্রাহ্মীর রস, সিরাপ, বটী — নানাভাবে এটিকে ব্যবহার করা যায়। ঘরোয়া ব্যবহারে ঘিয়ে ভাজা ব্রাহ্মী, ব্রাহ্মীশাকের তরকারি ব্যবহার করাটা সহজ। সপ্তাহে ৩-৪ দিন আলু, বেগুন সহযোগে ব্রাহ্মীশাক রান্না করে ভাতের প্রথমে (দুপুর বেলায়) খাওয়া যেতে পারে। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ব্রাহ্মীশাক ঘিয়ে ভেজে ভাতের সঙ্গে খেতে দেবেন। রস করে বা সিদ্ধ করে সেই জলটিও দেওয়া যায়।

১। বুদ্ধি-স্মৃতি-মেধা হ্রাসে এবং পঠন-পাঠনে অনীহায় : পড়লে কিছুই মনে থাকছে না। তোতা পাখির মত কেবল বুলি আওড়ে যাচ্ছে, পরে দেখা গেল — স্মৃতিতে কিছুই রইলো না। আবার কারুর কারুর পড়তে বসার ইচ্ছে নেই, সব সময় মনের মধ্যে একটা ভয় ভয় ভাব, উদ্বেগ, দুঃশ্চিন্তা এবং মননশীলতা ও একাগ্রতার অভাব, সেক্ষেত্রে ব্রাহ্মীশাকের রস ১-২ চা-চামচ (বয়স অনুপাতে) নিয়ে তাতে আধ চা-চামচ মধু মিশিয়ে সকালে টিফিনের পর কিছুদিন খাওয়াতে হবে। কমপক্ষে লাগাতার মাস তিনেক খেতে হবে। এছাড়া এই রসটি আধ চা-চামচ ঘি ও আধ কাপ দুধে মিশিয়ে খেতে পারে।

২। অপস্মারে (মৃগীরোগে) : ব্রাহ্মী শাকের রস বয়সানুপাতে ১-৪ চা-চামক আধ থেকে এক কাপ হালকা গরম দুধে মিশিয়ে সকালের দিকে কিছু খাওয়ার পর এক বার করে খেতে হবে বছর খানিক।

৩। কোষ্ঠবদ্ধতা ও সূত্রকচ্ছেতায় : যাঁদের দু'টোতেই সমস্যা, তাঁরা ব্রাহ্মীশাকের রস ৩-৪ চা-চামচ নিয়ে কাপখানিক গরম দুধে মিশিয়ে সকালে হালকা টিফিনের পর দিনে একবার করেই খাবেন। এছাড়া মাঝে এই শাকটি রান্না ক'রেও খাওয়া দরকার।

৪। যৌন ক্ষমতা ও ইচ্ছা হ্রাসে : বয়স বাড়তে থাকলে নারী-পুরুষ উভয়েরই এই সমস্যা আসতে পারে। তার উপর কাজের চাপ, উদ্বেগ, দুঃশ্চিন্তা, বিশ্রামহীনতা অনিদ্রা প্রভৃতি থাকলে যৌন ক্ষমতা কমতে পারে, আবার ক্ষমতা থাকলেও ইচ্ছাটা নাও থাকতে পারে। যাই হোক না কেন, এক্ষেত্রে ব্রাহ্মীশাকের রস ৩-৪ চা-চামচ নিয়ে তাতে আধ চা-চামচ ঘি ও কাপখানিক গরম দুধ মিশিয়ে সকালের দিকে একবার করে খান। রক্তে শর্করার ভাগ বেশি না থাকলে প্রয়োজনমত চিনি মিশিয়ে নেবেন। মাস তিনেক খান, উদ্দীপনা ও উত্তেজনা, সেইসঙ্গে মনের অদম্য ইচ্ছা ধীরে ধীরে ফিরে আসবে। মাসখানিক লাগাতার খাবেন। তারপর মাঝে মাঝে অর্থাৎ সপ্তাহে ২দিন খাবেন। তারই মাঝে দু'একদিন তরকারি করে খাবেন।

৫। হুপিং কাসিতে : বাচ্চাদেরই বেশি হয়। ব্রাহ্মীশাকের রস হাল্কা গরম করে বয়সানুপাতে ১৫-২০ ফোঁটা থেকে ১চা-চামচ রস সামান্য মধুর সঙ্গে মিশিয়ে দিনে ২বার দেবেন। ৫-৭ দিনে সমস্যা চলে যাবে।

৬। শুক্রতারল্যে : কেন হলো, কিভাবে হলো, কিসের দোষে হলো, এসব আলোচনা বাতিল করে ব্রাহ্মীশাকের রস ২-৪ চা-চামচ মাত্রায় নিয়ে এককাপ গরম দুধে মিশিয়ে

সকালের দিকে জলখাবারের পর কিছুদিন খান। সুগার বেশি না থাকলে অবশ্যই প্রয়োজনমত চিনি মেশাবেন।

৭। গেঁটে বাতে : সাধারণ গেঁটে বাতে ব্রাহ্মীশাকের রস ২-৪ চা-চামচ হালকা গরম করে দুধে (আধ-এক-কাপ) মিশিয়ে খেতে পারেন।

৮। বুক ধড়ফড়ে : হার্টের গতি সব সময় বেশি, নাড়ীপরীক্ষা করে দেখলে দেখা যাবে — মিনিটে ৮০-৯০ বার বা অধিক। এক্ষেত্রে ব্রাহ্মী শাকের রস ৩-৪ চা-চামচ কাপখানিক হালকা গরম দুধে মিশিয়ে মাঝে মাঝে খান। ৭ দিন খাবেন, ৭ দিন বাদ দেবেন। স্বাভাবিক অবস্থায় এলে সপ্তাহে ১ বা ২ দিন করে খেয়ে খাবেন।

৯। গলা বসায় : প্রায়ই গলা ভেঙে গলা বসে যায় এক্ষেত্রে ব্রাহ্মী রস ২-৪ চা-চামচ গরম করে ঠাণ্ডা হলে তাতে এক চা - চামচ মধু মিশিয়ে চেটে চেটে খাবেন। সকালে বা বিকালে একবার। লবন জলে দিয়ে ২-৩ বার গার্গল করবেন।

মাঝে মাঝে রস করে খাওয়া, ঘিয়ে ভেজে খাওয়া, তরকারি করে খাওয়া চালিয়ে গেলে মারাত্মক মারাত্মক মস্তিষ্কের রোগ আসতে পারবে না। যেমন স্মৃতিলোপ, ভুলে যাওয়া, অ্যালঝাইমার্গ প্রভৃতি রোগ। রোগটা হয়ে গেলে কিন্তু কিছু করার থাকবে না।

শেষে বলি — বেদের, ঋষিগণ আমাদের হাতে এমন একটা পশুপাত অস্ত্র তুলে দিয়েছিলেন, কিন্তু সঠিকভাবে তা চর্বিত চর্বন করতে পারিনি। শাকটি বুদ্ধি বাড়ায় ব'লে আমরা যতই চেঁচাই না কেন, ক'জন আয়ুর্বেদসেবী এটি নিয়মিত ব্যবহার করেন? ফলে আমাদেরই বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে। যেটিকে একদিন শাণ্ডকারগণ সরস্বতী ব'লে আখ্যায়িত করেছেন, সেটির, মর্মোদ্ধার করতে কত শত বছর, কেটে যাবে কে জানে।

বর্তমানের সমীক্ষায় যা যা বলা হয়েছে, তার প্রায় সবগুলি বেদ ও পরবর্তী সংহিতা গ্রন্থগুলিতে আলোচিত হয়েছে। এমনিতে মাছে-ভাতের বাঙালির শাকের দিকে নজর নেই, তায় আবার বুনো তেতো শাক, বাজারে পাওয়া গেলেও নজর এড়িয়ে যায়।

আমাদের যেসব বংশধরগণ একদা ব্রাহ্মীর দৌলতে সরস্বতীর বরপুত্র হয়ে আমাদের উদ্দেশ্যে কিছু আপ্তোপদেশ রেখে গিয়েছিলেন, যেগুলোর হদিশ কি আমরা আর কোনদিন পাব? এজন্যই এ জাতটার এত অধোগতি। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য একদল কঠিন পরিশ্রমী অনুসন্ধানকারীর দল চাই। আমরা যে স্বতস্ফূর্তভাবে তা করবো না, সেটা বোধহয় দিব্যি ক'রে বলা যেতে পারে। সরকারি ব্যবস্থাপনায় চেষ্টা হলে সেখানে বেতন, প্রমোশন, খেয়োখেয়ি, কোন্দল নিয়ে চর্চার আসর জমজমাটি হয়ে উঠবে না তো!

# বৈষ্ণবধর্মে হেমলতা ঠাকুরাণীর ভূমিকা

**বিজলি দে***

চৈতন্যদেব ছিলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রবক্তা। ষোড়শ শতকের প্রথমে চৈতন্যদেবের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে নারীর প্রবেশের অধিকার ছিল না। কারণ মহাপ্রভুর ধর্ম সন্ন্যাসীর ধর্ম। সেখানে স্ত্রীসঙ্গ ছিল পরিত্যাজ্য। মহাপ্রভুর অন্যতম পরিকর নিত্যানন্দ প্রভুর গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে নারীর প্রবেশাধিকার ছিল। কারণ নিত্যানন্দ প্রভুর ধর্ম ছিল গৃহীর ধর্ম। স্ত্রী সংস্পর্শে পতনের ভয় এক্ষেত্রে কম। নিত্যানন্দ প্রভুর ইচ্ছায় নারীর গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে প্রবেশের অধিকার এবং সহধর্মিনীরূপের সার্থকতা ঘটাতে শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণী, নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবীদেবী, অদ্বৈত পত্নী ঈশ্বরী ও গৌরাঙ্গপ্রিয়া এবং শিখী মাহাতি, মালিনী ঠাকুরাণী, সত্যভামা দেবী, লক্ষীহীরা কৃষ্ণদাসী, মাধবীলতা ইত্যাদি বৈষ্ণব মহিলাগণের মন্ত্রদীক্ষাদানের অধিকার ও 'গুরুমা' বা 'মা-গোঁসাই' ইত্যাদি রূপে মর্যাদা লাভ ও নারীর গুরুমা রূপে বা ভাবে অভ্যুত্থান ঘটে।[১]

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের স্বর্ণযুগের সূচনা হয়েছিল ষোড়শ শতকের প্রথম থেকেই। কিন্তু এখানে পুরুষের তুলনায় নারীর অবদান খুবই সামান্য। কিন্তু সামান্য হলেও একেবারে নারীর অবদান নেই একথা কোনো মতেই বলা যায়না। এমনকি কোনো ক্ষেত্রে নারীর অবদান পুরুষের তুলনায় বেশি, বিশেষ করে হেমলতা ঠাকুরাণীর।

মধ্যযুগে স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন বাংলাদেশে বৈষ্ণব সমাজের মধ্যেই প্রথম দেখা যায়। এই নারীরাই শিক্ষিকারূপে প্রধান ভূমিকা নেন। নারীশিক্ষা প্রচলনের ক্ষেত্রেও বৈষ্ণব নারীদের অবদান রয়েছে।

শ্রীনিবাস আচার্যের দুই পত্নী ছিল। প্রথমা পত্নীর নাম ঈশ্বরী এবং দ্বিতী পত্নীর নাম পদ্মাবতী। পদ্মাবতী ছিলেন শ্রীনিবাসের শিষ্যা। শ্রীনিবাসের তিনপুত্র ও তিন কন্যা। তাঁর পুত্রদের নামগুলি হল যথাক্রমে বৃন্দাবন বল্লভ, রাধাকৃষ্ণ ও গতিগোবিন্দ। তাঁর তিন কন্যার নাম গুলি হল যথাক্রমে হেমলতা, কৃষ্ণপ্রিয়া ও কাঞ্চনপ্রিয়া। শ্রীনিবাস আচার্যের পুত্রদের মধ্যে গতিগোবিন্দ এবং কন্যাদের মধ্যে হেমলতাদেবী খুবই প্রসিদ্ধা ছিলেন। শ্রীনিবাসের প্রথমাপত্নী ঈশ্বরীর কন্যা ছিলেন হেমলতা ঠাকুরাণী।

হেমলতাদেবীর বিবাহ হয়েছিল মুর্শিদাবাদে। তাঁর স্বামীর নাম গোপীবল্লভ চট্টরাজ। হেমলতা দেবীর স্বামী অল্প বয়সে মারা গিয়েছিলেন। হেমলতা দেবী ছিলেন নিঃসন্তান। তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সুবলচন্দ্রকে দত্তক নিয়েছিলেন।

অল্প বয়সেই হেমলতা ঠাকুরাণীর জীবনে নেমে এসেছিল বৈধব্যের কালোছায়া। সেই যুগের আর পাঁচটা সাধারণ নারীর মতো তিনি ভবিতব্যকে মেনে সারাটা জীবন কাটিয়ে দেন

*অধ্যাপিকা, পাঁশকুড়া বনমালী কলেজ, বি.এড বিভাগ, পূর্বমেদিনীপুর।

নি। বরং পিতার গৃহে ফিরে এসে পিতার সাধনা ও কাব্যচর্চার ঐতিহ্যকে সযত্নে রক্ষা করেছিলেন। অল্পদিনের মধ্যে হেমলতাদেবী বৈষ্ণব ধর্ম-দর্শন ও ইতিহাস সম্পর্কে যথেষ্ট শিক্ষিতা হয়ে উঠেছিলেন। তিনি নিজে 'মানবি বিলাস' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। হেমলতাদেবীর পিতা শ্রীনিবাস আচার্য ছিলেন বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণপুর শ্রীপাটের প্রতিষ্ঠিতা। এই শ্রীপাটকে কেন্দ্র করে হেমলতা ঠাকুরাণী আরো কতকগুলি আখড়া গড়ে তুলেছিলেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল — অবন্তিকা, মেরেলা, দ্বারিকা, কোঠা ইত্যাদি। মুর্শিদাবাদে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বুধুইপাড়া শ্রীপাট। তাঁকে কেন্দ্র করে নিয়াল্লিশ পাড়া, কুমারপুর, মহুলা, রায়পুর ইত্যাদি অঞ্চলেও তিনি বহু শ্রীপাট গড়ে তুলেছিলেন। এইভাবে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সূত্রপাত ঘটেছিল এক বৃহৎ কর্মকাণ্ডের।

হেমলতা দেবী একটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তাঁর পিতাগুরু গোপাল ভট্টের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের নামানুসারে এই বিগ্রহের নামকরণ করেছিলেন 'রাধারমণ'। হেমলতা দেবী বহু শিষ্যকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। 'কর্ণানন্দে' তাঁদের কয়েকজনের নাম রয়েছে, যথা — সুবলচন্দ্র ঠাকুর, গোকুল চক্রবর্তী, রাধাবল্লভ ঠাকুর, বল্লভদাস, যদুনন্দম, কানুরাম চক্রবর্তী, দর্পনারায়ণ ইত্যাদি। এই শিষ্যদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন মালিহাটী গ্রাম নিবাসী সপ্তদশ শতাব্দীর যদুনন্দন দাস বৈদ্য। যদুনন্দন অনেক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সেই সমস্ত গ্রন্থে হেমলতা ঠাকুরাণীর জয়গান করেছেন।

'শ্রী আচার্য প্রভুর কন্যা শ্রীল হেমলতা।
প্রেমকল্প বল্লী কিবা নিরমল ধাতা।।
সেই দুই চরণ পদ্ম হৃদয়ে বিলাস।
কর্ণানন্দ রস কহে যদুনন্দন দাস।।'

এই 'কর্ণানন্দ' গ্রন্থ রচনা করে তিনি প্রথম হেমলতা দেবীকেই শুনিয়েছিলেন এবং হেমলতা দেবী নিজে গ্রন্থটির নাম দিয়েছিলেন 'কর্ণানন্দ'।[৩]

হেমলতা ঠাকুরাণী মুর্শিদাবাদে এই বড় বৈষ্ণবগোষ্ঠীর গুরুমারূপে প্রসিদ্ধা ছিলেন। তাঁর রচিত সহজিয়া পুথি বিলাস কাব্য 'মানবি বিলাস' বিষ্ণুপুরের আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে সংরক্ষিত আছে। 'প্রেমবিলাস' কাব্যের প্রতিলিপি রচনা করেছিলেন মল্লরাজ গোপাল সিংহের মহিষী ধ্বজামণি, নিজহস্তে। হেমলতা ঠাকুরাণীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী রাধারমণজীউ বিগ্রহটি এখনও বিষ্ণুপুরের বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর বাড়িতে পূজা পাচ্ছে।[৪]

হেমলতাদেবীর লিখিত 'মানবি বিলাস' গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬। মাত্র এই ১৬ পৃষ্ঠার পুথিতে লেখিকা তথা হেমলতাদেবী তাঁর পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের যথেষ্ট নিদর্শন রেখে গেছেন। এই গ্রন্থটি তিনটি পর্বে বা পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পর্বে বৈষ্ণব আচার্যদের কথা রয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে সাধক ভক্তের কথা রয়েছে। তৃতীয় পর্বে মানব তত্ত্বের কথা রয়েছে। গ্রন্থটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল মানুষ এবং মানবমহিমা প্রচার করা।

হেমলতা ঠাকুরাণী মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেছিলেন। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে আরও একজন বৈষ্ণবধর্ম প্রচারিকার সন্ধান পাওয়া যায়, তাঁর নাম 'হরিপ্রিয়া'। বৈষ্ণব

নারী হেমলতা ঠাকুরাণী ও হরিপ্রিয়া ঠাকুরাণীর অবদান বৈষ্ণব জগতে অসামান্য। তাঁরা নূতন যুগের সূচনা করেছিলেন বৈষ্ণব সমাজে, সাধারণভাবে যখন নারীরা ছিল অসূর্যস্পশ্যা, সেই সময়ে তাঁরা নানা বাধা বিপত্তির মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেছিলেন।

হেমলতা ঠাকুরাণী ছিলেন সুকণ্ঠের অধিকারিণী। ধ্রুপদাঙ্গ কীর্তন সংগীতে তিনি ছিলেন পারদর্শিনী। খেতুরীর দ্বিতীয় বৈষ্ণব মহাসম্মেলনে তিনি পিতার সঙ্গে প্রতিনিধিরূপে যোগ দিয়েছিলেন। পুরী, বৃন্দাবন, নবদ্বীপের গৌড়ীয় সমাজ তাঁকে আচার্যারূপে বরণ করে নিয়েছিলেন। বিষ্ণপুরের রাজপরিবারেও তিনি ছিলেন অতিশয় সম্মানীয়া। রাজ অন্তঃপুরের নারীদের মধ্যে তিনি শিক্ষার প্রসার ঘটিয়েছিলেন। তাঁর অনুপ্রেরণায় রাজঅন্তঃপুরিকারা একাধিক মন্দির স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। শুধু রাজ অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে নয়, শ্রীপাটগুলিকে কেন্দ্র করে সাধারণ নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার শুরু হয়। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নারীদের মধ্যে পর্দাপ্রথাও শিথিল হয়। যদিও তার ক্ষেত্র ছিল খুবই সীমাবদ্ধ।

বুঁধই পাড়াতে হেমলতাদেবী শ্রীবংশীবদন ও শ্রীরাধামাধব বিগ্রহের সেবা করতেন, কথিত আছে বংশীবদনের প্রতি হেমলতাদেবীর বাৎসল্য প্রীতি ছিল। হেমলতা দেবীর কোনো সন্তান ছিল না। সুবলচন্দ্রকে হেমলতা দেবী পোষ্যপুত্র রূপে গ্রহণ করেছিলেন। সুবলচন্দ্রও সন্তান না থাকার জন্য পোষ্য গ্রহণ করেছিলেন। এই রূপে পোষ্য গ্রহণের ধারা চলে আসছে।[৫] তবে আচার্য প্রভুর বংশ ছাড়া পোষ্য গ্রহণের রীতি নেই।

বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর হেমলতা ঠাকুরাণীর পিত্রালয়। হেমলতা দেবী অধিকাংশ সময় বিষ্ণুপুরে থাকতেন এবং বিষ্ণুপুর পাঠ তাঁর নির্দেশে পরিচালিত হত। কথিত আছে হেমলতাদেবী বৃন্দাবনে গিয়ে 'শ্রীরাধারমন জীউ' ও 'শ্রীরাধাদামোদর জীউ'র দুটি বিগ্রহ নিয়ে এসেছিলেন। 'শ্রীরাধাদামোদরের' বিগ্রহটি হেমলতাদেবী কন্দর্প চট্টরাজকে দিয়েছিলেন। কন্দর্প চট্টরাজ বিষ্ণুপুরের নিকটস্থ মণিপুর রাউতোড়া গ্রামে বাস করতেন। মণিপুর গ্রামে রাধাদামোদরের একটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। কন্দর্প চট্টরাজের বংশধরগণ নিষ্ঠার সঙ্গে এই দেবতার সেবা করে চলেছেন।

রাধারমণ বিগ্রহকে হেমলতাদেবী বাৎসল্যভাবে ভজনা করতেন। মানবজীবনে যত রকমের প্রেমসম্পর্ক আছে, বৈষ্ণবেরা সেই সমস্ত প্রেমসম্পর্কের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে পাবার চেষ্টা করেছেন। তাই ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে বৈষ্ণবধর্মে কোনো দূরত্ব নেই। পৃথিবীর আর কোনো ধর্মমতই ঈশ্বর সাধনার ক্ষেত্রে এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে নাই। যা অসীম, অনন্ত, ইন্দ্রিয়াতীত, তাকে সীমার মধ্যে তাকে আপনজনে পরিণত করা খুব সহজ সাধ্য ব্যাপার নয়। বৈষ্ণবধর্মে তাই দেবতা প্রিয় হয়েছেন, তার প্রিয় দেবতার স্থান অধিকার করেছেন। বৈষ্ণবধর্মে ঈশ্বর হলেন একান্তভাবে ভক্তের কাছে মনের মানুষ, তার অন্তর্যামী। হেমলতা ঠাকুরাণী বৈষ্ণবধর্মের সেই ধারাটিতে অনুসরণ করেছিলেন। মায়ের সঙ্গে ছেলের যে সম্বন্ধ, রাধারমনজীউর সঙ্গে হেমলতা ঠাকুরাণীর সেই সম্পর্ক ছিল।

নারী শিক্ষা প্রচলন, বৈষ্ণবধর্ম প্রচার ও প্রসারে হেমলতাঠাকুরাণীর অবদান অনস্বীকার্য। ইনি আবার স্বনির্ভরশীল হওয়ার জন্য নয় বৈষ্ণবধর্ম প্রচার ও প্রসারের জন্য মধ্যযুগে

গৃহের বাইরে বের হয়েছিলেন। সেজন্য এই মহিলা আরো বেশি আলোচিত হওয়ার দাবি রাখেন।

**তথ্যসূত্র :**


১। সুতপা মুখোপাধ্যায়, বৈষ্ণবজীবনী সাহিত্যে নারী সমাজ, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১লা বৈশাখ, ১৪০৩, পৃ. ৮৩

২। কৌশিক দাশগুপ্ত, মধ্যযুগীয় সাহিত্য দর্পণে নায়িকা অন্বেষণ, শ্রীভারতী প্রেস, কলকাতা, আগস্ট ২০১১, পৃ. ১২৪

৩। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা. লি., কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ১৬১।

৪। প্রদীপ কর, মল্লভূমের বৈষ্ণবচর্চার প্রেক্ষাপটে বীরসিংহ গ্রাম, প্রত্ন পরিক্রমা : মল্লভূম, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, অক্টোবর ২০০৪, পৃ. ১৮৪, সম্পাদক - জলধর হালদার।

৫। প্রদীপকুমার সিংহ, শ্রীল হেমলতা ঠাকুরাণীর মানবি বিলাস, বাঁকুড়া, ২৫শে বৈশাখ ১৩৮৭, পৃ. xxviii



**এবং প্রান্তিক প্রকাশিত**

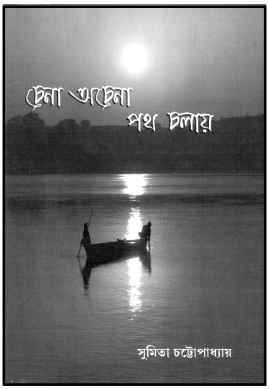


**চেনা অচেনা পথ চলায়**
**সুমিতা চট্টোপাধ্যায়**
**মূল্য : ৮০ টাকা**

সময় মানুষকে চেনায়, শেখায়। শিল্পী সময়ের হাত ধরে চলে সৃষ্টির পথে পথে। জীব-অজীব সমস্ত রকম উপাদান কুড়িয়ে থরে থরে সাজিয়ে রাখেন অন্তরে। সৃষ্টির সাধনায় মগ্ন আত্মা নিসর্গের যজ্ঞ বেদীতে প্রস্তুত। বিলাস বৈভবে মোড়া আজকের আধুনিকতম জীবন। উন্নততর প্রযুক্তির আতিথ্য সমগ্র জীবন জুড়ে। তারই মধ্যে স্বাদবদলের গৃহস্থ রুচি সংজ্ঞায় জায়গা করে নেয় প্রাক্-আধুনিক জীবন। পৌরাণিক ছোঁয়া ছাঁদ মুহূর্তের জন্য বদলে দেয় পারিবারিক রীতি-রেওয়াজ। লোক জগতের অন্তর খুঁড়ে অলোক আনন্দ তুলে আমার কাজ শিল্পী করেন নিখুঁত বয়নশিল্পের আদলে। জীবন জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে ফেরেন স্বপ্নজীবীর মত। জীবন-জগৎ অন্তহীন পথের গান পাথেয় করে স্রষ্টা চলেন মনফকিরার বেশে। আত্মার অনুসন্ধান করাই যে প্রকৃত মানুষের সন্ধান, জীবনের সন্ধান সেকথা প্রাবন্ধিক সুমিতা চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রতিটি প্রবন্ধের বিষয় বিন্যাসে প্রকাশ করেছেন।

## প্রজ্ঞা বিকাশ প্রকাশিত

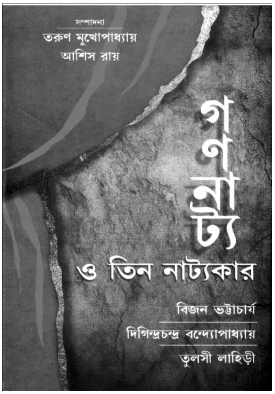


**গণনাট্য ও তিন নাট্যকার**
**সম্পাদনা**
**তরুণ মুখোপাধ্যায়**
**আশিস রায়**
**মূল্য : ৮০ টাকা**

বাংলা নাট্যধারায়, গণনাট্য এক অবিস্মরণীয় নাটক ও নাট্যপ্রযোজনা। যা চারের দশকে বঙ্গরঙ্গমঞ্চে আলোড়ন এনে দিয়েছিল। বাংলা নাট্য-আন্দোলনে নতুন রক্ত সঞ্চার করেছিল। যে-প্রবাহের অভিঘাতে আমরা পেয়েছি নবনাট্য, সৎনাট্য, পিপল্‌স্ থিয়েটার, থার্ড থিয়েটার ইত্যাদি নতুন ভাবনার নাটক। সেই গণনাট্য এবং নবনাট্যের অগ্রণী তিনজন নাট্যব্যক্তিত্ব - বিজন ভট্টাচার্য, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী লাহিড়ী। যাঁদের নাটক, নাট্যভাবনা নিয়ে কিছু আলোচনা, গবেষণা স্বতন্ত্রভাবে হয়েছে, হবে। তবু এক মলাটে তিন নাট্যকারকে বেঁধে ফেলে প্রায় নখদর্পণে দেখে নেওয়ার প্রচেষ্টা সম্ভবত এটাই প্রথম। নাট্যপ্রেমী যেসব পাঠক ও পাঠার্থী বিস্তৃত পড়ার অবকাশ পান না, তাঁরা এই সংকলন পাঠে সমৃদ্ধ হবেন, আশা রাখি।

## এবং প্রান্তিক প্রকাশিত

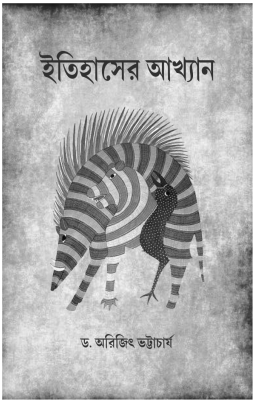


**ইতিহাসের আখ্যান**
**ড. অরিজিৎ ভট্টাচার্য**
**মূল্য : ১৩৫ টাকা**

প্রথা নয়, ইতিহাস ছড়িয়ে আছে প্রান্তে-প্রান্তরে। সাহিত্যে প্রকাশিত ইতিহাসের উপাদান সত্যি কিনা তা মিলিয়ে দেখার প্রয়োজন হয় না লেখ্যাগারে গিয়ে। যদিও একথাও ঠিক যে একটি বিষয়ের সমগ্র ইতিহাস লিখতে গেলে সেখানে সাহিত্যও আসলে একটি উপাদান হিসেবে কাজ করে। তাই অন্তহীন ইতিহাস আর অন্তহীন সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পথ চলা। ইতিহাসের ইতিহাস খোঁজার কাজ কলমে কলমে চলে এসেছে চিরায়ত-ভঙ্গিতে সাহিত্যের খাঁজে খাঁজে। গবেষক কেবল খোঁজার চোখ নিয়ে তার বাঁক, মোচড়, ঘাত-অভিঘাতকে চিহ্নিত করেন। এই গ্রন্থে উপন্যাসের পরতে-পরতে সন্ধানী চোখ তাকে টেনে বার করার প্রাণান্ত প্রয়াসী। চেনাকে চেনানো নয়, অচেনাকে, যা আমাদের সাদা চোখে সচরাচর ধরা পড়ে না, সেই অচীন প্রান্তরের সওয়ারী ড. অরিজিৎ ভট্টাচার্য এবং তাঁর এই গ্রন্থ।

# মাহফুজার সাথে কয়েক মুহূর্ত

**সৌরভ চক্রবর্তী***

এক অনিবার্য - অপূর্ণ দশক-ভিত্তিক বিভাজনে নির্দিষ্ট সময়ের স্টিকার কবিদের গায়ে এঁটে দেওয়ার সিস্টেমই কাব্যালোচনার ডিসিপ্লিনে দস্তুর হয়ে দাঁড়িয়েছে। আসলে, এ যেন 'দিল্লীকা লাড্ডু'। যে খায় সে পস্তায় আবার যে খায় না সেও পস্তায়। সত্যি কথা বলতে কী, দশক, সেই নির্দিষ্ট সময়ের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে পাঠককে 'গভীরে যাও আরও গভীরে যাও' এই অমোঘ সুরে ডেকে নিয়ে যেতে পারে। আবার সময়ের অনিবার্যতা কিছু নতুন শব্দের সৃষ্টি করে সংশ্লিষ্ট দশকের কবিতাকে ঋদ্ধ করতে পারে। পাশাপাশি আবার এটাও সত্য; — কোন নির্দিষ্ট সময়ে বা বলা ভাল দশকে কোন কবি লিখতে শুরু করে পূর্ণতার সন্ধান না পেয়ে পরবর্তী সময়ে যেতেই পারেন। আবার কোনো একটি নির্দিষ্ট দশকে লিখতে এসেই কবিতা হয়ে ওঠার সফলতার আস্বাদ পেয়েও পরবর্তী দশকগুলিতেও সময়ের চিহ্নকে ধারণ করে তাঁর কাব্য-ভাষা তথা আঙ্গিকও সাফল্যের সাথেই পরিবর্তিত হতে পারে। তাই অনেক সময় প্রকাশ আর বিকাশের মধ্যে যেমন সময়ের দুস্তর ব্যবধান থাকতে পারে তেমনি বিকাশের ধারাও সময়ের সাথে সাথে বিবর্তিত হতে পারে। অনেকক্ষেত্রেই আবার দুই দশক বা শতকের সন্ধিক্ষণেও কবির আত্মপ্রকাশ ঘটে। মজিদ মাহমুদের আবির্ভাব এইরকম-ই ঘূর্ণায়মান সময়ের মধ্যে; আটের দশকের শেষ আর নয়ের দশকের শুরুতে।

স্বপ্নের স্বাধীনতা সত্তরে এসেছে। তবুও স্বাধীনতার স্বাদ বাংলাদেশ পায়নি। এসে গেছে এরসাদ; — বিশ্বাসভঙ্গকারী স্বজাতির প্রতিনিধি। আর তথাকথিত স্বাধীন দেশের পরাধীন কবিরা, বিশেষ করে আটের দশকে যারা লিখতে এলেন তাদের কবিতায় শাণিত অস্ত্রের ঝন্‌ঝনে আওয়াজ যেমন পেলাম। তেমনি তাদের গলা বুজে গেল গুপ্ত ঘাতকের হাতে খুন হওয়ার আশঙ্কায় —

> ''কেবল মৃত্যুর দ্যুতি গাছ থেকে নেমে চুপি
> অঁধারে দাঁড়িয়ে থাকে, দাঁড়িয়ে থাকে শুধু, ডাকে না।'' (১)
>
> ('পুষ্পদম্পতি', বিষ্ণু বিশ্বাস)

কিংবা,

> ''ছুড়ি হাতে অশ্ব ছুটে যায়
> রজঃস্বলা হলে নাকি মেয়ে?
> এসেনিন কবিতা লিখবেন'' (২)
>
> ('প্রবাহমান', সৈয়দ তারিক)

বিষ্ণু বিশ্বাস বা সৈয়দ তারিকের মত মজিদ মাহমুদও আটের দশকে লিখতে আসেন।

---

*গবেষক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়।

আটের দশকের একেবারে শেষের দিকে ১৮৮৯-এ প্রকাশ পায় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মাহফুজামঙ্গল'। এই প্রথম কাব্যগ্রন্থেই তিনি তাঁর স্বতন্ত্রতার ছাপ রাখেন।

'মাহফুজামঙ্গল' শব্দবন্ধটি উচ্চারণের সাথে সাথে কয়েকশো বছরের ওপার থেকে যেন মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল কিংবা অন্নদামঙ্গলের প্রলম্বিত ক্ষীণ ধ্বনি কানে ভেসে আসে। মনে প্রশ্ন জাগে মনসাদেবী, চণ্ডীদেবী, ধর্মঠাকুর কিংবা অন্নদার মতো মাহফুজাও কী ঈশ্বর? কিন্তু কবি বলেন —

''তুমি সগর্বে প্রচার করো ঈশ্বরের মতো
তোমার অবাধ্যতায় কত জনপদ হয়েছে খতম।'' (৩)

('তোমার অহংকার', মজিদ মাহমুদ)

অর্থাৎ মাহফুজা আর ঈশ্বরের মাঝে বসে থাকার মতো এই তুলনাবাচক শব্দটি জানান দেয় 'মাহফুজামঙ্গল' আসলে traditional মঙ্গলকাব্যের সম্প্রসারণ নয়। মাহফুজাও ঈশ্বর নন। তবুও মাহাত্ম্যলোভী মঙ্গলকাব্যের দেবীদের মতো কোন্ স্বার্থান্ধতায় খতম করার ফরমান এখানেও জারি থেকেছে? তবে কি তিনি রক্ত-মাংসের মানুষ —

''মাহফুজা তোমার কারণে যদি ধসে যায় ট্রয়
মরে যায় গ্রিকের সভ্যমানুষ
তাহলে দায়ী কে তুমি না মানুষ'' (৪)

('তোমার অহংকার', মজিদ মাহমুদ)

উদ্ধৃত পংক্তি আমাদের পূর্বোক্ত প্রশ্নের সহজ জবাবে জানান দিচ্ছে মাহফুজা মানুষও নন। তিনি ঈশ্বরও নন, তিনি মানুষও নন। তবে কি তিনি? মজিদ লিখছেন —

''রবীন্দ্রনাথকে তুমি দাওনি ধরা
কাজীদা অভিমানে তোমার বিপরীত
ফিরায়েছে গাল
আবার কেন ধরছে অনুজের পাছ
তুমি ছাড়া নেই আমার কবিতার বিষয়।'' (৫)

('তোমাকে জানলেই', মজিদ মাহমুদ)

এখানে প্রাসঙ্গিক ভাবেই আলোঘরের পক্ষ থেকে আহমেদ ফিরোজের নেওয়া মজিদ মাহমুদের একটি সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ উদ্ধৃত করতে চাই —

''আলোঘর ঃ মাহফুজামঙ্গল বহুল পঠিত একটি কাব্যগ্রন্থ, এ গ্রন্থে মূল উপজীব্য কী — যা আপনাকে সবচেয়ে বেশি টানে?

মজিদ মাহমুদ ঃ মানবের গহীন - গহন কান্না। রবীন্দ্রনাথ যাকে জীবনদেবতা বলেছেন। মানুষের সবটুকু চেতনা দিয়ে যাকে ধরা যায় না। আবার যা ধরা যায় না, তা কী করেই বা মানুষের কামনার বস্তু হতে পারে। পাওয়া আর না পাওয়া, ধরা আর অধরার দ্বন্দ্ব। কবি নিজেও যাকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করতে পারেন না। বহু ব্যবহারে কবি যখন ক্লিষ্ট হয়ে পড়েন, কবি যখন প্রাত্যহিকতার মধ্যে বন্দি হয়ে পড়েন, তখন সুদূর অথচ কাছের দেখা অথচ অস্পষ্টতার মাঝে কেউ এসে কবিকে উদ্ধার করতে চায় — সেই মাহফুজা।''(৬)

মানুষ বলছি না, মানবের গহীন-গহন কান্না রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা কি না সে নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, কিন্তু জীবনদেবতার

''তারে ধরি ধরি মনে করি
ধরতে গেলাম
আর পেলাম না''

— এই আচরণের মধ্য দিয়ে কবির কঠোর তপস্যাজাত অভীষ্ট সান্নিধ্য প্রায় করায়ত্ত হয়েও যদি ছু-মন্তর জাদুতে ভ্যানিশ হয়ে যায় তখন তো গহীন-গহন থেকে ডোকরানো কান্নার চাপা স্বর ভেসে আসাই অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। বাকি কথাগুলি অবশ্য জীবনদেবতার সম্পর্কেও খাটে। আসলে কবি নিজে মাহফুজাকে রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার সাথে তুলনা করলেও আমরা মাহফুজামঙ্গল পাঠে স্পষ্ট বুঝতে পারব জীবনদেবতার সাথে মাহফুজার একটা স্পষ্ট পার্থক্য আছে। এমনকি মাহফুজা জীবনানন্দের বনলতা, সুদর্শনা বা সুচেতনাও নন পুরোপুরি। এই মাহফুজা একান্ত মজিদেরই। যদিও সেই মাহফুজার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা বা জীবনানন্দের সুচেতনার কিছু সাদৃশ্য আছে। বস্তুত এই মাহফুজা অনেকগুলো চেতনার সমাহারে সৃষ্ট। মাহফুজারো কবি যখন বলেন —

''তুমি তো পাঁচলাখ বছর আগের মাহফুজা
তুমি তো সৃষ্টির প্রথম মাহফুজা''

— তখন আমরা বুঝতে পারি এই মাহফুজা আসলে অমরত্বের অধিকারী। তবে অন্তরের শাশ্বত অমরতার আড়ালে রূপান্তরের নতুনত্বে তার বহিরঙ্গের মানানসই সাজ নির্মিত হয়েছে। আর এই অন্তর্লীন সত্যই কি কবিকে দিয়ে লিখিয়ে নেয় না —

''তুমি যদি বলতে পার মাহফুজা
আমরাও তোমাদের কেউ
তোমার সত্তার কসম
আর তবে ধরব না বেশ্যার হাত'' [৭] ?

('এন্টার্কটিকা', মজিদ মাহমুদ)

কিন্তু একবিংশ শতক কবেইবা আর কেবল শাশ্বত বোধের সন্ধানে নিমগ্ন থাকতে পেরেছে? এই শতকের প্রথমার্ধেই আমাদের গা ঘিনাঘিন করে উঠেছে —

''যেই কুঁজ — গলগণ্ড মাংসে ফলিয়াছে
নষ্ট শসা — পচা চালকুমড়ার ছাঁচে,
যে সব হৃদয়ে ফলিয়াছে
— সেই সব।'' [৮] — দেখে। ('বোধ', জীবনানন্দ দাশ)

তাই একাদশ শতকের শেষেও যখন 'খবর' আসে —

''গতকাল আমাদের গ্রাম থেকে এসেছিল এক অদ্ভুত কৃষক
এবার বন্যায় ভেসেছে যার হালের বলদ
সারাদিন নিরন্ন থেকেও চাখেনি আমার ডাইনিংয়ে খাবার'' [৯]

('খবর', মজিদ মাহমুদ)

— তখন আর আমাদের গা ঘিনঘিনও করে না, আত্মাও চায়না 'যোনির চেয়ে কুঁকড়ে থাকুক ভয়ে'। এ যেন এক বিকৃত অভ্যাসের রোজনামচা। যার গর্ভেই বড় হচ্ছে আগামীর প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদই একদিন সংঘটিত করবে বিপ্লব। যদিও প্রতিবাদী স্বরে সবাই যে উচ্চকিত হবেন এমন নয়। মজিদও নন। তিনি তাঁর নিজস্ব স্টাইলে রক্তমাখা চিত্রকল্প দিয়েই সংযত স্বরে কবিতার বুনট তৈরি করতে জানেন —

''পুরুত আনন্দিত আমার মাঁসে
আগুনে ঝলসে করেছে রগরসা
তুমি তো রয়েছ বেদিতে বসা
আনন্দ করো মা রক্তাক্ত ঘাসে।'' (১০)

('যূপকাঠ', মজিদ মাহমুদ)

এই রক্তঝরা প্রেক্ষিত-ই সূচিত করবে আরেকটা রক্তঝরা সকালের। এর মধ্য দিয়ে হয়ত একদিন 'রণ রক্ত সফলতা' সূচিত হবে। যদিও —

''এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা
সত্য; তবু শেষ সত্য নয়।'' (১১)

('সুচেতনা', জীবনানন্দ দাশ)

এই সত্য মনে রেখেই হয়তো রক্তের রণভূমি ছেড়ে অখন্ড স্নিগ্ধতায় 'এন্টার্কটিকা' হয়ে নেমে আসেন মাহফুজা —

''তোমার বরফসুষমা চিবুক
হিমানির দেহ
অসম্ভব বিশ্বাসে নগ্ন হয়ে আছে তুষার স্তন
আমার বড় হিংসে হয় মাহফুজা
তোমার ওই বিশাল দেহে হেঁটে বেড়ায় পেঙ্গুইন।'' (১২)

('এন্টার্কটিকা', মজিদ মাহমুদ)

হিংসে তো সাপেক্ষের মানদণ্ডে হয়। অনিবার্য ভাবেই কবির ক্যামেরা তখন নিজস্বী তুলতে তৎপর। হঠাৎ 'এন্টার্কটিকা'-য় ঘটে ছন্দপতন —

''দংশিত ক্ষতে পচে ওঠে আমাদের বহু ব্যবহৃত শরীর'' (১৩)

('এন্টার্কটিকা', মজিদ মাহমুদ)

বস্তুত কবিদের ঘ্রাণশক্তি যে বড় তীব্র। তাই শুভ্র-সুগন্ধি রুমালে আঁশটে গন্ধ চাপা দেওয়ার উপায় নেই। প্রেমিকা মাহফুজার উন্মুক্ত বক্ষের ছবি এক ব্যক্তিগত অ্যালবাম থেকে প্রকাশ্যে আনেন কবি —

''আমি তো দেখি তোমার সবুজ স্তন — আগুনের ক্ষেত
অসম্ভব কারুকাজে বেড়ে ওঠা তাজমহলের খুঁটি'' (১৪)

('খবর', মজিদ মাহমুদ)

সত্যিই তো এর চেয়ে বেশি আর কী-ই বা করতে পারেন কবি? সঙ্গী তো শুধু কাগজ, কলম। একাই থাকেন, একাই ফোটান, একাই তো খান। আর এই কৃচ্ছসাধনায় মাঝে মাঝে

দেখা পাওয়া সাধ্য সঙ্গিনীকেও তাই অনায়াসে পাঠাতে পারেন সেই 'অদ্ভুদ কৃষক'-এর বাড়ি। কারণ —

''তুমি না গেলে
আবাদ রহিত হবে বেরুবাড়ির সেই বন্দিকৃষকের'' (১৫)

('খবর', মজিদ মাহমুদ)

বস্তুত কবি বাধ্য হয়েছেন হৃদয়-চারিণী মাহফুজাকে নগ্ন বক্ষে আমাদের সামনে হাজির করতে। মাহফুজার সবুজ স্তনই তো পারে নিরন্ন অদ্ভুত কৃষককে খনিকটা জীবনীশক্তি দিতে। তাই কবির স্পষ্ট স্বীকারোক্তি —

''তোমার চুলের অরণ্যে পাই না কল্যাণের ঘ্রাণ।''

তবুও একটা অনুতাপ কোথাও থেকে গেছে। স্বপ্নচারিণীকে নির্মম বাস্তবের সম্মুখীন করতে বাধ্য হয়েও শ্রেয় আর প্রেয় বোধের অন্তর্দ্বন্দ্বে বিক্ষত হয়েছেন তিনি। যুক্তিতে হয়ত শ্রেয় বোধ জিতেছে। তবুও প্রেয়বোধের পরাজয়ে অন্তরাত্মার আর্তিই তো অনিবার্য ছিল —

''তোমার চুলের অরণ্যে পাই না কল্যাণের ঘ্রাণ।
এমন অযোগ্য কবিকে তুমি সাজা দাও মাহফুজা
যে কেবল খুঁজেছে তোমার নরম মাংস'' (১৬)

('খবর', মজিদ মাহমুদ)

এখানে 'তোমার চুলের অরণ্যে পাই না কল্যাণের ঘ্রাণ' পংক্তিটি পর পরবর্তী যে স্তবক শুরু হচ্ছে সেখানে যদি অনুচ্চারিত একটি শব্দ 'তাই' যোগ করা যায় তবে আমাদের সামনে একটি সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা উঠে আসতে পারে। বস্তুত যে কৃষি সভ্যতা নিরন্ন কৃষককেও ছিনিয়ে খেতে শেখা তো দূর, দয়ার দান পর্যন্ত নিতে শেখায়নি সেই বুভুক্ষ কৃষককে চোখের সামনে দেখে মাহফুজার চুলের অরণ্যে কল্যাণের ঘ্রাণ পাওয়া কী সম্ভব? আবার স্বপ্নবাসিনী মাহফুজাকেই বা কী করে বাস্তবের ঊষরতায় বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব? তাই স্বপ্নচারিণীকে নির্মম বাস্তবের সম্মুখীন করতে বাধ্য হয়ে শ্রেয় আর প্রেয় বোধের অন্তর্দ্বন্দ্বে বিক্ষত হয়েছেন কবি। যুক্তিতে হয়ত শ্রেয় বোধ জিতেছে তবুও প্রেয় বোধের পরাজয়ে অন্তরাত্মার আর্তিই তো অনিবার্য ছিল। তাই তো তাঁর নিজেকে কামনা সর্বস্ব নরম মাংস লোভী বলে মনে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে সেই আপ্ত বাক্যটি — সাহিত্য সাহিত্যের জন্য। সাহিত্য উদ্দেশ্যমূলক নয়।

মাহফুজার মর্জির বিরুদ্ধে গেলে ধ্বংস যে অনিবার্য তা তো বিলক্ষণ জানেন —

''তোমার অবাধ্যতায় কত জনপদ হয়েছে খতম'' (১৭)

('তোমার অহংকার', মজিদ মাহমুদ)

প্রকৃত প্রস্তাবে এটা কী মাহফুজার মর্জি না কালবেলার করাল থাবা; যেখান থেকে উজ্জয়িনীপুরের সুন্দরীই হোক কিংবা মজিদ মাহমুদের মাহফুজা — কারোর-ই নিস্তার নেই। তাই 'তৃতীয় বিশ্বের বাঁচবার হিসাব' না কষলে মাহফুজার রোষে পড়াই তো স্বাভাবিক। তাই মজিদ মাহমুদ স্বপ্ন দেখেন উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মাহফুজাকে যেখান থেকে পেলেন

এবং যেখানে এনে দাঁড় করালেন সেখান থেকেই কালের হাত ধরে বিবর্তনের নতুন বেশে অন্য কোনো মজিদ চিরকালের সেই মাহফুজাকে অচ্ছেদ্য সাধন-সঙ্গিনী করে পাবেন —

"তুমি ছিন্নভিন্ন হয়ে
তুমি ক্ষয়িত ব্যথিত হয়ে
আবার ফিরে আস অখন্ড তোমাতে
আমার বিপক্ষে অভিযোগ থাকে না তোমার
কারণ তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পারে না যেতে
আমাদের দাসেদের জীবন।" (১৮)

('দাসের জীবন', মজিদ মাহমুদ)

অনেকক্ষণ থেকে মনে একটা প্রশ্ন খচ্‌খচ্‌ করছিল। কবির বক্তব্য কী মাহফুজারও বক্তব্য? এখানে এসে তার একটা উত্তর আমরা পেলাম। কারণ কবি জানাচ্ছেন মাহফুজাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে পারে না তাদের মতোন দাসেদের জীবন। অর্থাৎ মাহফুজার ইচ্ছাই কবির ইচ্ছা। তাই কবি যখন মাহফুজাকে সমকালীন প্রেক্ষিতে ছিন্নভিন্ন হয়ে, ক্ষয়িত-ব্যথিত হয়ে তার স্বীয় অখণ্ড সত্তাতে ফিরতে বলছেন তখন যে তা বকলমে মাহফুজার-ই ইচ্ছা তাতে সন্দেহ নেই।

মনে প্রশ্ন জাগে যে কারণে কবি অনুতপ্ত সেই কারণেই কী মাহফুজা গর্বিত? যে জীর্ণতা-দীর্ণতার সামনে কবি একান্ত অনিচ্ছা বশত মাহফুজাকে দাঁড় করাতে বাধ্য হচ্ছেন সেই দীর্ণতা জীর্ণতাকেই কী মাহফুজা স্বেচ্ছায় চূর্ণ করে দিয়ে তাঁর অখণ্ড স্বীয় সত্তায় ফিরতে চাইছেন না? বস্তুত এছড়া তো পথও নেই। নতুবা এই জীর্ণতাই তো পূর্ণতার পথে পরিপন্থী হয়ে দাঁড়াবে।

এখানে আরও একটি দিক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কবি মাহফুজার বিরুদ্ধে যেতে পারেন না ঠিকই। কিন্তু তা বলে কি কবির স্বতন্ত্র ইচ্ছে নেই? বিরুদ্ধাচরণ করতে অপারগ হয়ে মাহফুজার প্রতি কি অভিমান নেই? কবি বলেন —

"আমার তো একটাই জায়গা ছিল
পৃথিবীতে একটাই জায়গা ছিল আমার
তাও তুমি কেড়ে নিলে মাহফুজা
তাও তুমি কেড়ে নিলে
তোমারই কারণে যেতে পারব না তোমার সমুখ।" (১৯)

('তোমারই মানুষ', মজিদ মাহমুদ)

তবুও কবির কিছু বলার নেই। বাস্তবকে অস্বীকার করার ক্ষমতা কার-ই বা আছে? আর বাস্তবকে অস্বীকার করলেও মাহফুজা কি তাঁকে ক্ষমা করবেন? তাই নিঃস্ব মানুষটি ক্লান্ত হয়ে গলা বোজা স্বরে নিজের অজান্তেই যেন অস্ফুটে বলে ওঠেন —

"তুমি দুঃখ দিলে দাও
তুমি বিরহ দিলে দাও
এতে আমার কিছুই থাকবে না বলার

আমি তো কাদাজলমাখা তোমার মানুষ।" (২০)

('তোমারই মানুষ', মজিদ মাহমুদ)

অনিবার্য ভবিতব্যতায় 'নেই, তোর কেউ নেই, তোর কেউ নেই'-এর ঘমুভাঙানিয়া সুরে হঠাৎ জেগে উঠে প্রেমিকাকে যেন নিজ হাতে দু'টুকরো করেন। আর এইভাবে বিবর্তমান প্রেমিকার সামনে রাখা নৈবেদ্যের থালায় আলম্বন প্রিয়াকে কম্পিত হাতে সজ্জিত করতে করতে দৃঢ় কণ্ঠে উচ্চারণ করেন —

''তোমার কি জানা আছে মাহফুজা
এইসব মূর্খদের জবাব
যারা তোমাকে খণ্ডিত করেছে এমন
তুমি তো পাঁচ হাজার বছর আগের মাহফুজা
তুমি তো পাঁচ লাখ বছর আগের মাহফুজা
তুমি তো সৃষ্টির প্রথম মাহফুজা
পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হোক তোমার শাসন।" (২১)

('দেবী', মজিদ মাহমুদ)

এইভাবেই একবিংশ শতকের ক্রান্তিলগ্নে পৌঁছে আধুনিক মঙ্গলের দেবী মাহফুজার এক আশ্চর্য সমাপতন ঘটে যায়। তিনি Traditional মঙ্গলকাব্যের দেবীদের মতোন ভয় দেখিয়ে ভক্তির উদ্রেক করে মানবজাতির পূজা পেতে আগ্রহী নন। বরং ভয়ে ভক্তির পূজায় তাঁর তীব্র অনীহা, আসক্তি তাঁর প্রেমে। তাই অ-প্রেমের অচলায়তন ভাঙতে, Classic আভিজাত্য ভুলে যেন শোন-পাংশুদের দলে নাম লেখাতেই তিনি তৎপর। সময়ের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ঘটে যাওয়া তার এই রূপান্তরিত রূপটিকে নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করে, প্রেমিকের হাতে যেন তুলে দেন কাঁটা আর পাতা ভরা গোলাপের ডাল। প্রেমিকার এই বাস্তব উপহারে রক্তাক্ত হতে হবে দু'জনকেই। তারপর কোনো একদিন গোলাপের পাপড়ির মত প্রেমিকা মাহফুজার লাল কোমল আঙ্গুলের অযাচিত শাশ্বত পরশ কোনো না কোনো মজিদ পাবেন-ই পাবেন।

**তথ্যসূত্র** ঃ

১) 'বালুচর' ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা - ৬৬
২) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৬৮
৩) মাহমুদ মজিদ, ''কবিতামালা'', আশ্রম, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ঃ এপ্রিল ২০১৫, পৃষ্ঠা - ২৬৩
৪) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ২৬৩
৫) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ২৬৩
৬) ''সবুজস্বর্গ'', সম্পাদনা - লতিফ জোয়ার্দার, চতুর্থ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, আগস্ট ২০১২, পৃষ্ঠা - ১২৬

৭) মাহমুদ মজিদ, ''কবিতামালা'', আশ্রম, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জ্ঞ এপ্রিল ২০১৫, পৃষ্ঠা - ২৬২
৮) দাশ জীবনানন্দ, ''জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা'', ভারবি, কলকাতা, দশম মুদ্রণ জ্ঞ আগস্ট ২০০৩, পৃষ্ঠা - ২১
৯) মাহমুদ মজিদ, ''কবিতামালা'', আশ্রম, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জ্ঞ এপ্রিল ২০১৫, পৃষ্ঠা - ২৬০
১০) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ২৯০
১১) দাশ জীবনানন্দ, ''জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা'', ভারবি, কলকাতা, দশম মুদ্রণ জ্ঞ আগস্ট ২০০৩, পৃষ্ঠা - ৫২
১২) মাহমুদ মজিদ, ''কবিতামালা'', আশ্রম, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জ্ঞ এপ্রিল ২০১৫, পৃষ্ঠা - ২৬২
১৩) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ২৬২
১৪) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ২৬১
১৫) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ২৬১
১৬) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ২৬১
১৭) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ২৬৩
১৮) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ২৬০
১৯) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ২৬৮
২০) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ২৬৮
২১) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ২৫৮


**এবং প্রান্তিক প্রকাশিত**

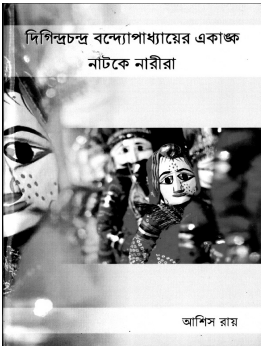


**দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের একাঙ্ক নাটকে নারীরা**
**আশিস রায়**
**মূল্য : ৮০ টাকা**

বার বার আহত পাখির মতো জীবনের আকাশে ওড়া-উড়ি দিয়ে প্রমাণ করেছে। 'এভাবেই ফিরে আসা যায়।' নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটকে সেই আহত পাখিদের বার বার ফিরে আসার গল্প শোনানো হয়েছে। নারী যারা নাকি সমাজের ধারক, বাহকও। তাদের স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার গল্প, সংসার সমুদ্রের নিত্য নৈমিত্তিক জোয়ার ভাটায় উথাল পাথাল জীবনে নিজেকে হারিয়ে যেতে না দেওয়ার গল্প শুনিয়েছেন নাট্যকার। প্রাবন্ধিক আশিস রায় এখানে দশটি প্রবন্ধের মধ্যে সেই স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে নারীদের কথা তুলে ধরেছেন।

# তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি' : এক কবিয়ালের জীবন সংগ্রাম

সুবর্ণা সিকদার*

কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নিম্নশ্রেণীর মানুষের অবজ্ঞাত জীবন নিয়েই সাহিত্য রচনা করেছেন। কাহার, বাউরি, বেদে, সাপুড়ে, চামার, বাগদীদের অতি সাধারণ জীবনকথাও তার সুনিপুন লেখনীতে উপাদেয় সাহিত্যে পরিণত হয়েছে। সর মূলে রয়েছে এইসব মানুষগুলির সাথে লেখকের প্রত্যক্ষ সংযোগ, এদের প্রতি লেখকের অপরিসীম দরদ। এইসব নিম্নশ্রেণির মানুষের জীবনের ভালো-মন্দ, দোষত্রুটি, কুসংস্কার, বাধানিষেধ, দুর্নীতি, কপটতা, দৈন্য সমস্তই তিনি সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাদের মুখের ভাষার যথাযথ প্রয়োগও এই সার্থকতার সহায়ক হয়েছে। আঞ্চলিক ভাষায় লেখকের পরিপূর্ণ অধিকার রয়েছে বলেই তিনি তাদের মুখের ভাষার যথাযথ প্রয়োগে সমর্থ হয়েছেন। সমাজের নিম্নতম স্তরে অবস্থিত মানুষগুলির জীবন, তাদের পটভূমি, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে লেখকের প্রত্যক্ষ পরিচয় রয়েছে। তারাশঙ্কর খুব কাছ থেকে এই মানুষগুলিকে দেখেছিলেন। তারাশঙ্কর জমিদার বাড়ির সন্তান হলেও জমিদারী ব্যবস্থার পতনের সময়কালে তাঁর আবির্ভাব। ব্যক্তিগত জীবনেও পিসিমার থেকে মায়ের প্রভাব তাঁর উপর বেশী কার্যকরী হয়েছে। এক বিরুদ্ধ মন নিয়ে তিনি পৌঁছে গিয়েছেন গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে। এক গভীর সহানুভূতি নিয়ে তিনি এই মানুষগুলির সাথে মিশেছেন।

তারাশঙ্করের 'কবি' উপন্যাসটিতে সমাজের একেবারে নীচের তলায় অবস্থিত ডোম সম্প্রদায়ের এক মানুষের কবিয়াল হয়ে ওঠার কাহিনী রয়েছে। নিতাইচরণের জীবন সংগ্রাম ও আত্মোপলব্ধির কাহিনী 'কবি'। নিতাইয়ের কবিয়াল হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে দুইজনের অবদান রয়েছে। প্রথম পর্বে গোপবধূ ঠাকুরঝি এবং দ্বিতীয় পর্বে ঝুমুর দলের স্বৈরিনী বসন্ত তাকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত এই দু'জন নারীই পার্থিব জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে নিতাইয়ের মনোভূমিতে বিচরণ করেছে এবং নিতাই এক গভীরতর জীবনদর্শনে উপনীত হয়েছে। নিতাই কবিয়াল অন্তর দিয়ে নিজেকে ও পারিপার্শ্বিক জীবনকে উপলব্ধি করে গান বেঁধেছে। তাঁর গানে নিম্নশ্রেণীর মানুষের জীবনের তুচ্ছ তুচ্ছ ঘটনা যেমন স্থান পেয়েছে তেমনি শাশ্বত কালের অনুভূতির কথাও স্থান পেয়েছে। নিতাই-এর সাথে রেলওয়ে পয়েন্টসম্যান রাজার বন্ধুত্ব, নিতাইয়ের জীবনে ঠাকুরঝি ও বসন্তের অবস্থান, ঝুমুর দলের মানুষগুলির সম্পর্কের টানাপোড়নের কথা ও নিতাই কবিয়ালের কণ্ঠে গান হয়ে উঠেছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'আমার সাহিত্যজীবন' গ্রন্থে 'কবি' উপন্যাসের গায়কের সাথে সাক্ষাতের কথা বলেছেন — 'মাঠে মাঠে ঘুরি।.....সেখান থেকে সাঁওতালপাড়া, সাঁওতালপাড়া থেকে মাঠে মাঠে জীবের বটতলা হয়ে দু-সতিশের কারণা, সেখান থেকে তারা-মায়ের ডাঙা। সেখানে বসে থাকি গাছতলায়। হঠাৎ কানে এসে পৌঁছায় গানের

*গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

সুর। গাছগুলিকে মুগ্ধ রসিক স্রোতা ধরে নিয়ে সে বাঁ হাত গালে দিয়ে — ডান হাতখানি নেড়ে নেড়ে আপন মনেই কবিগান শোনাচ্ছিল।' রাজা, ঠাকুরঝিরও যে বাস্তব ক্ষেত্রে অস্তিত্ব ছিল লেখক নিজেই সে কথা বলেছেন। রাজার আসল নাম রাজা মিয়া, সে জাতিতে মুসলমান, সে হিন্দিও বলে না আর যুদ্ধেও যায়নি। আবার ঠাকুরঝি রাজার শ্যালিকা না হলেও রেললাইন ধরেই সে আসন বেনের দোকানে দুধের যোগান দিতো, খুব চটপটে মেয়ে সে।

লেখক তারাশঙ্কর বাস্তব জীবন থেকে চরিত্রগুলি গ্রহণ করে নিজের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছেন। তাই তাঁর চরিত্রগুলি এত সজীব প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। লেখক এই মানুষগুলিকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন বলেই তাদের অন্তরের কথা এমন সুন্দরভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন।

লেখক তারাশঙ্কর 'কবি' উপন্যাসের শুরুতেই নিতাইচরণের বংশ পরিচয় তুলে ধরেছেন। হিন্দু সমাজে নিম্নশ্রেণির অন্তর্গত ডোমবংশে নিতাইয়ের জন্ম। এই ডোমেরা বাংলার বিখ্যাত লাঠিয়াল এদের উপাধি বীরবংশী। নিতাইয়ের মামা গৌর বীরবংশী ডাকাতি কথার জন্য পাঁচ বছর আন্দামানে জেল খেটে এসেছে। গৌরের বাবা শম্ভু বীরবংশী আন্দামানেই মারা গিয়েছে। আবার নিতাইয়ের পিতামহ ছিল আর তার পিতাও ছিল সিঁদেল চোর। তার পিতামহ রাতের অন্ধকারে নিজের জামাইকেই পথিক ভেবে হত্যা করেছিল। সেই মাঠ জামাইমারীর মাঠ হিসাবে পরিচিত। পুলিশ রিপোর্টেও এদের পূর্বপুরুষদের ইতিহাস রয়েছে। এককথায় নিতাইয়ের জন্ম ইতিহাস এক কলঙ্কিত অধ্যায়। এমনকি নিতাইয়ের চেহারাতেও তার বংশের সুস্পষ্ট ছাপ রয়েছে। তবে তার বড় বড় চোখের বিনীত সকরুণ দৃষ্টি তার কঠিন দেহ, সবল পেশী, রাতের অন্ধকারের মতো রংকে ছাপিয়ে যায়। এমন চোর ডাকাত বংশের ছেলের হঠাৎ-ই কবি হয়ে যাওয়াটা কাহিনীর সূচনাতেই সকলের মনে বিস্ময় উদ্রেক করে। লেখক দৃষ্টান্ত হিসাবে 'দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ' এবং 'রামায়ণের বাল্মীকি'র প্রসঙ্গ এনেছেন। অশিক্ষিত হরিজনেরাও নিতাই-এর কবি হওয়ার সংবাদে চমকে গিয়েছিল। মাঘী পূর্ণিমার দিনে দেবী চামুণ্ডার পূজা উপলক্ষ্যে অট্টহাসের মেলায় জাকজামক পূর্ণ কবিগানের আসর বসে। এই আসরে কর্তৃপক্ষের মান বাঁচাতে নিতাইচরণের কবিগান রচনার সূত্রপাত। এই অঞ্চলের বিখ্যাত দুই কবিয়াল গোটন দাস ও শহদেব পালের কবিগানের আসর বসার কথা। কিন্তু গোটন দাস উপস্থিত না হওয়ার উদ্যোক্তাদের দুঃশ্চিন্তার সীমা থাকে না। এরকম পরিস্থিতিতেই নিতাইচরণের আবির্ভাব। নিতাই তার সহজাত কবিত্বশক্তির বলে মহাদেব কবিয়ালের প্রতিপক্ষ হিসাবে আসর জমিয়ে তুলেছিল। কলকাতায় চাকুরিরত বাবুটি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছে — 'নেতাইচরণের আমাদের এত গুণ! A Poet! বাহবা, বাহবা রে নিতাই। তা লেগে যা রে বেটা, লেগে যা।' কিন্তু মহাদেব নিতাই চরণের কালিমাখা বংশের কথা এক মুহূর্তও ভোলেনি। সে প্রতি পদে নিতাইচরণকে অপমান করে ছড়া বলেছে। নিতাইকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করে ছড়া কেটেছে—''ও-বেটার বাবা ছিল সিঁদেল চোর, কর্তা-বাবা ঠাঙাড়ে। মাতামহ ডাকাত বেটার দীপান্তরে মরে।। সেই বংশের ছেলে, বেটা কবি করবি তুই। ডোমের দাওয়াল রত্নাকর, চিংড়ির পোনা রুই।।" দোয়ারেরা এর সাথে যোগ করেছে—

''আঁস্তাকুড়ের এঁটোপাতা — স্বগ্‌গে যাবার আশা গো! ফরাৎ করে উড়ল পাতা —

স্বগ্‌গে যাবার আশা গো!" নিতাইকে নিয়ে এরা ব্যঙ্গবিদ্রূপ করলেও নিতাই ধৈর্য্য হারায়নি। ঠাণ্ডা মাথায় বিনীতভাবে জবাব দিয়েছে। কিন্তু মহাদেবের উপহাস আর আক্রমণের পাশে এই বিনয় ম্লান। তাই নিতাই-এর হার হয়েছে। কিন্তু কবি হিসেবে পরিচিত হয়েছে নিতাই। যদিও বংশের কলঙ্ক তাকে নিষ্কৃতি দেয়নি পরবর্তী কালেও। এই কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়েই তাকে কবি হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য লড়তে হয়েছে। প্রতি পদক্ষেপেই অপমান সহ্য করতে হয়েছে।

নিতাই স্বভাবকবি। ডোম বংশ জন্ম নেওয়ায় কৈশোরে তার পড়াশুনার সুযোগ ঘটেনি। পরবর্তীতে সে জমিদারদের প্রতিষ্ঠিত নৈশ বিদ্যালয়ে নিয়মিত পড়াশুনা করেছে। সে পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে কাপড়, জামা, গামছা ও লণ্ঠন উপহার পেয়েছিল। দুবছরে সে অনেক বইও উপহার পেয়েছে, সেগুলি মুখস্থও করে ফেলেছে। কিন্তু পাঠশালাটি উঠে যাওয়ায় তার পড়াশুনা বন্ধ হয়েছে। তবে সে পড়াশুনা করেছে বলেই পরবর্তী কালে কবিগান চর্চার ভিন্ন ধারা তৈরি করতে পেরেছে। কবিগানের অশ্লীলতা, রসিকতার স্থানে সে গ্রহণ করেছে পুরাণ, রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী, কবিতার ছন্দ ও মিল। নিজেই গান বাঁধতে শুরু করেছে নিতাই। নিতাই নিজ সমাজ ত্যাগ করে অন্য গ্রামে ঘনশ্যাম গোসাইয়ের বাড়ীতে মাহিন্দারী করতে শুরু করেছে কিন্তু বইখাতার দপ্তর ত্যাগ করেনি। এরপর স্টেশনে এসে সে কুলিগিরি করেছে উপার্জনের 'কবি বর' বলে ঠাট্টা করেছে। তার নিজের মামাও তাকে 'আস্তাকুলের এঁটো পাতা' বলে উপহাস করতে ছাড়েনি। নিতাই নিদারুণ আঘাত পেয়েছে কিন্তু কখনও হাল ছাড়েনি। বার বার নিতাইয়ের আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছে। কখনও কখনও সে প্রতিবাদও করেছে, কিন্তু তার প্রতিবাদের ভাষা মার্জিত। নিতাই গান রচনা করেছে —'সংসারে যে সহ্য করে সেই মহাশয়।/ক্ষমার সমান ধর্ম কোন ধর্ম পায়।।'

যারা নিতাইকে বারংবার অপমান করেছে, তার জাত তুলে গালিগালাজ করেছে নিতাই নিজগুণে তাদের ক্ষমা করে দিয়েছে। সে জাত-পাতের অনেক উর্ধ্বে। তার উপলব্ধিতে — 'ডোমেই বা লজ্জা কি? ডোমই বা ছোট কিসে? ডোমও মানুষ বামনুও মানুষ।'

নিতাই এর কবিসত্তা বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই জেগে উঠেছে, সে পড়াই করতে শিখছে। আঘাত পেয়ে পেয়ে সে আত্মসচেতন হয়ে উঠেছে। সে কুলিমজুরের কাজ ছেড়ে সম্মানযোগ্য কাজের খোঁজ করেছে। নিজেকে কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠার জন্য নিতাই নিজের স্বাভাবিক বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়েছে। মহাদেব কবিয়াল অসুস্থ হওয়ার পর কবিগানের বায়না এল নিতাই-এর কাছে। পাঁচদিন কবিগান গেয়ে নিতাই যখন ফিরে এল তখন তাকে চেনাই যায় না, তার পায়ে একজোড়া জুতো, গায়ে চাদর। নিজের সম্মান বজায় রাখতে সে প্রচার করল এগুলি সে শিরোপা হিসাবে পেয়েছে, একথা সবাই বিশ্বাসও করল। কিন্তু এরপর বহুদিন আর কোন বায়না এলনা। এই সময় ঠাকুরঝির কাছ থেকেই নিতাই কবিয়ালের স্বীকৃতি লাভ করল — 'তুমি যে কবিয়াল! কত বড় লোক!' প্রথম কবিগানের আসরে ঠাকুরঝিই ছিল নিতাইয়ের মুগ্ধ শ্রোতা ঠাকুরঝি গোপবধূ, রেলওপয়েন্ট-সম্যান রাজার শ্যালিকা, টাকার অভাবে সে নিতাইয়ের দুধের যোগান বন্ধ হতে দেয়নি। নিতাইকে কবিগানের অনুপ্রেরণাও জুগিয়েছে এই ঠাকুরঝি। ঠাকুরঝির কালো রঙের কথা বলে রাজা তাকে

ঠাট্টা করলে নিতাই গানের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ করেছে —

'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে? কালো কেশে রাঙা কুসুম হেরেছো কি নয়নে?'

ঠাকুরঝিকে ভালোবাসার অনুভবের সাথে সাথে নিতাইয়ের মনে হয়েছে এ অসম্ভব। ঠাকুরঝি পরস্ত্রী। ঠাকুরঝিকে পেতে গেলে অন্য একজনের সংসার ভেঙে যাবে, এ নিতাই চায়না, তাছাড়া ঠাকুরঝির শ্বশুরবাড়ীর লোকজনও ভালো। মনের কথা মনেই চেপে রেখেছে নিতাই। নিজেকে সান্ত্বনা দিতে সে গান বেঁধেছে।

'চাঁদ-তুমি আকাশে থাক - আমি তোমায় দেখব খালি। ছুঁতে তোমায় চাইনাকো হে - সোনার অঙ্গে লাগবে কালি।।'

নিতাই তার প্রিয় বন্ধু রাজার কাছেও মনের কথা ব্যক্ত করেনি। অন্যদিকে তার সঞ্চিত পুঁজিও শেষ হয়ে এসেছে কিন্তু সে কোন ভাবেই মোটবহন করবে না, তাই গ্রাম দেবতা-মা চণ্ডীকে সে তার মনের জ্বালা পেটের জ্বালা জানিয়েছে। এমন সময় গ্রামে ঝুমুর দলের আবির্ভাব ঘটে। ঝুমুরদলের মেয়ে বসন্তকে দেখে নিতাইকে ভুল বুঝে চলে যায় ঠাকুরঝি। এরপর ঠাকুরঝি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। বিকারগ্রস্ত অবস্থায় নিতাই-এর নাম উচ্চারণ করায় সবাই নিতাইকেই দোষারোপ করতে থাকে। নিতাই রাজার কাছে স্বীকার করেছে ঠাকুরঝিই তার মনের মানুষ কিন্তু সে ঠাকুরঝিকে কলঙ্কিত করেনি। এরপর ঠাকুরঝি সুস্থ হবে, সুখী হবে, তার ভাঙা ঘর আবার জোড়া লাগবে এই মনস্কামনায় নিতাই সেখান থেকে বিদায় নিয়েছে। প্রেমাস্পদের মঙ্গলকামনাই নিতাইকে দূরে সরিয়ে এনেছে।

তারাশঙ্করের উপন্যাস-ছোটগল্পে বেদে, বাজিকর, বৈষ্ণব, ঝুমুরদলের জীবনযাত্রায় বিস্তারিত বর্ণনা আমরা পাই। নিম্নশ্রেণির মানুষের সংস্কৃতি চর্চার একটা দিক ঝুমুরগানের মধ্য দিয়ে ধরা পড়ে, তবে ঝুমুরগানের পূর্বেকার ঐতিহ্য বজায় থাকেনি। পরবর্তীকালে নিম্নশ্রেণির গায়িকা ও বাজনাদার, দোহার নিয়েই ঝুমুরের দল গড়ে উঠেছে। তারা যাযাবরের মতো একগ্রাম থেকে অন্যগ্রামে ঘুরে ঘুরে আসর বসায়। এই ঝুমুরদলে যোগদান করার পর থেকেই নিতাই-এর জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু। ঝুমুর দলের নায়িকা বসন্ত প্রথম দর্শনে তাকে 'কয়লামানিক' বলে উপহাস করলেও শেষপর্যন্ত নিতাই 'বসন্তের কোকিল' হয়ে উঠেছে। বসন্তের মধ্যে নিতাই ঝুমর দলের এক 'স্বৈরিনী নারীর উর্দ্ধে অন্য এক চিরন্তন প্রেমময়ী নারীকে আবিষ্কার করেছে। নিতাই ক্লেদাক্ত জীবনকে মেনে নিতে পারেনি। সে ঠিক করে যে ভাবে হোক পালিয়ে যাবে কিন্তু বসন্তের জন্য পারে না। ঝুমুর দলের নোংরা পরিবেশে দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার মুহূর্তে মোহান্ত ঠাকুরের কাছ থেকে অন্য জ্ঞান লাভ করে নিতাই, তার মনের ঘৃণা দূর হয়ে। ঝুমুরদলের গৃহস্থালিনীর দিকটিও চোখে পড়ে নিতাইয়ের। লক্ষ্মীব্রতের অনুষ্ঠানে বসন্তের নিষ্ঠাবতী রূপটি ফুটে ওঠে। বসন্তকে ভালোবাসার মুহূর্তেই বসন্ত তার দুরারোগ্য ক্ষয়রোগের কথা জানায় নিতাইকে। সংসার করার আকণ্ঠ পিপাসা থাক সত্ত্বেও আর গাঁট ছাড়া বাঁধা হয় না তাদের। নিতাইও জানে বসন্তের আয়ু বেশীদিন নয়। এই খেদ থেকেই নিতাই গান বাঁধে —

'এই খেদ আমার মনে মনে। ভালোবেসে মিটল না আশ — কুলাল না এ জীবনে।
হায় জীবন এত ছোট কেনে? এ ভুবনে?'

এরপর বসন্ত খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে, নিতাইয়ের কোলে মাথা রেখেই সে মারা যায়। বসন্তের মৃত্যুর পর মরণের কথা গভীরভাবে ভাবায় নিতাইকে। মরণের পর সত্যিই কি সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়? মরণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা থেকেই নিতাই গান বাঁধে। ভালোবাসার ধ্যানে চোখ বন্ধ করা অবস্থায় সে বসন্তকে দেখতে পায়। মরণজয়ী প্রেমের গান বেধে ফেলে সে — 'মরণ তোমার হার হল যে মনের কাছে ভাবলে যারে কেড়ে নিলে সে যে দেখি মনেই আছে মনের মাঝেই বসে আছে।'

বসন্তের মৃত্যুর পর ঝুমুরদল থেকে বিদায় নিয়ে নিতাই কাশী যায়। কিন্তু সেখানে গিয়েও উপেক্ষা ছাড়া কিছুই পায় না সে। বিদেশে তার গানের কোন কদর নেই। যদিও একেবারে রোজগার হয়নি তা নয়, কিন্তু কবিগানের আসর ছাড়া নিতাই থাকতে পারবে না। দেশের মাটির টানেই দেশে ফিরেছে সে। যেন আপন মায়ের কোলে ফিরছে সে। আত্মীয় স্বজনের সাথে মেলামেশার আগেই শেষ হয়ে গেছে। গ্রামের মানুষগুলি, নদী, মাঠ, মা চণ্ডী, বুড়ো শিব তার স্মৃতিতে ভীড় করে আসে আর সেই সাথে মাথায় সোনালী টোপর পরা এক কাশফুল ঠাকুরঝি। কিন্তু সেই ঠাকুরঝিও পাগল হয়ে মারা গেছে। ঠাকুরঝি, বসন-দুজনই নিতাইকে ছেড়ে দূরে চলে গেছে। জীবনের জন্য খেদ নিতাইয়ের রয়েই গেলো। ভালোবাসার সাধ এ জীবনে আর পূরণ হল না নিতাইয়ের কিন্তু দুজনেই গান রচনার অনুপ্রেরণা হয়ে রইল। সমাজের নিম্নতম শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করলেও প্রতিনিয়ত লড়াই করতে করতে শেষপর্যন্ত কবি হিসাবে সে স্বীকৃতি পেয়েছে। প্রতি পদে লাঞ্ছনা, অপমান, দুঃখ-বেদনাগুলিই তাকে গানের কলি জুগিয়েছে। এই কঠিন জীবন সংগ্রামই নিতাই এর গান-রচনার, আত্মোপলব্ধিই তার গান রচনার সহায়ক হয়েছে। এই সংগ্রাম নিতাইকে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এক গভীরতর দর্শনে উপনীত করেছে।

**সহায়ক গ্রন্থ :**

১. কবি। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স। সপ্তবিংশ মুদ্রণ। অগ্রহায়ণ ১৪১৩।
২. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবি। অচিন্ত্য বিশ্বাস। রত্নাবলী। তৃতীয় পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ। আগস্ট ২০১৬।
৩. তারাশঙ্করের কবি ঃ তত্ত্বে ও সৃজনে। ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়। জে এন ঘোষ অ্যাণ্ড সন্স। পুনঃ মুদ্রণ ২০১০।
৪. আমার সাহিত্যজীবন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী। জানুয়ারি, ২০১১
৫. বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান। রুমা বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। জুন ২০১৪।

# রামকুমারের ছোটোগল্পের ঐতিহ্য : 'প্রিয়াঙ্কার ছেলেই'

**প্রণব নস্কর***

**এক.**

সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা একটি বিশেষ উপাদান। সেই উপাদানের সঙ্গে যদিও সমসাময়িক প্রেক্ষাপটকে মেলাতে গেলে একটু দ্বিধান্বিত হতে হয় গল্প কথককে। তবে সাহিত্য রচনা করতে গেলে লেখককে সাত-পাঁচ ভাবতে লাগে না। অতীত জীবনের অভিজ্ঞতার স্মৃতিকে বাস্তব রসের মিশ্রণে সৃষ্টি করা যায় সাহিত্য—এমন ভাবনার দৃষ্টান্ত সাহিত্যের ইতিহাসে অজস্র। আধুনিককালের গল্পকারদের মধ্যে একটা বিশেষ ধারণা মাথা চেড়ে উঠছে — তা রোমান্সকে অতিক্রম করেও প্রাধান্যতা দেখিয়েছেন যৌনতাকে। আজ সমস্ত দেশ জুড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে লিঙ্গ নিরপেক্ষ সমানাধিকার। এই সমানাধিকারকে সামনে রেখে পুরুষ যেমন তার নিজের অধিকারকে জোর কদমে প্রতিষ্ঠিত করেছে, নারীও তেমনি পিছিয়ে থাকেনি কোনো খানে। সে নারী শহুরে মানসিকতাপন্ন হোক বা গ্রামীন পরিবেশে বেড়ে উঠুক। এমনই গ্রামীণ পরিবেশ ও তার প্রেক্ষাপটকে তুলির আঁচড়ে স্মৃতির অভিজ্ঞতা থেকে গল্পের মধ্যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন সাম্প্রতিক কালেরই গল্পকার রামকুমার মুখোপাধ্যায়।

জন্মসূত্রেই রামকুমার ছিলেন বাঁকুড়া জেলার মানুষ। শৈশব ও কৈশোরের প্রায় সম্পূর্ণ সময়ই তিনি বাঁকুড়ার জল-আবহাওয়া-মানুষজনদের নিয়ে একাত্ম ছিলেন। তাই তাঁর গল্পের শরীর জুড়ে থাকবে গ্রামজীবন, লোককথা, সংগ্রাম-ইস্তেহারের প্রসঙ্গ এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাঁর গল্প হয়ে ওঠে ছবির পর ছবির ফ্রেমবন্দি সারি। চোখের সামনে পাতার অক্ষর ছাপিয়ে সে ছবি এসে মেলে বাস্তবের জীবনপটে। ভৌগলিক গণ্ডির বিচারে রামকুমারের গল্প মূলত বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া অঞ্চলের কথাই শোনায়, ভাবায়; কয়েকটি ব্যতিক্রমও রয়েছে যেখানে কলকাতাসহ শহরের প্রেক্ষাপটে লেখা। প্রত্যন্ত গ্রাম সমাজের অন্ত্যজ মানুষরাই মানুষরাই ভিড় করে চিরাচরিত দুঃখ-বেদনা-আনন্দের সমাহারকে ভাগ করার জন্য। তবে কথকতার যে ভঙ্গিটাকে রামকুমারের গল্পের সরলতা বলে মনে হয়, একটু লক্ষ করলেই বোঝা যাবে সেটিই তাঁর style (স্টাইল) বা গল্পবলার বাচনভঙ্গি। তিনি কাহিনি থেকে নিজেকে বিযুক্ত করে নিরাসক্ত কথকের ভঙ্গিতে যেন বিষয়কে উপাস্থাপন করতে করতে অগ্রসর হন — এই আদর্শ ও রচনা শৈলীর দক্ষতায় তিনি হয়ে উঠেছেন ভারতীয় লেখকদের একজন। বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রেও তিনি কোনো গুরুগম্ভীর জটিল ঘটনাকে গুরুত্ব না দিয়ে দৈনন্দিনতার বহমান সময়কেই ফ্রেমবন্দি করেছেন। এ রকমই একটি ভিন্ন স্বাদের গল্প সংকলন 'প্রিয়াঙ্কার ছেলেই'। যেখানে রামকুমার স্থান দিয়েছেন 'বারোটি

*অংশকালীন শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, ফকিরচাঁদ কলেজ।

নারী-কেন্দ্রিক গল্প'কে। এই রকম ভিন্ন স্বাদের গল্প নির্বাচনের কৌতূহল নিরাসনের জন্য তিনি নিজেই এই গ্রন্থের শুরুতে জানিয়ে দিয়েছে একথা : — 'লেখালেখির শুরু গত শতকের সাতের দশকের শেষ দিকে। সেই হিসেবে প্রায় তিরিশ বছর হতে চলল। ইতিমধ্যে উপন্যাসের পাশাপাশি প্রকাশিত হয়েছে শ-খানেক গল্প। সে সবের দিকে ফিরে দেখি বেশ কিছু গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র একজন নারী। মনে হল এগুলি নিয়ে একটি সংকলন প্রকাশ করা যায়। তাহলে বোঝা যাবে নানা সময়ে নারী চরিত্রগুলি কেমন রূপ পেয়েছে গল্পগুলিতে। তবে এসব যুক্তি দুই একান্তই বাহ্য। শেষ কথা হল নারী পাঠকেরা তুষ্ট হলেন নাকি রুষ্ট।"[১]

**দুই.**

গল্পকার রামকুমার 'নানা সময়ে নারী চরিত্রগুলি'র রূপকে প্রকাশ করার জন্যই নির্মাণ করেছিলেন 'প্রিয়াঙ্কার ছেলেই' নামক অভিনব গল্পগ্রন্থটিকে। বিশেষ করে লক্ষণীয়, আজ একবিংশ শতকের দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে রামকুমার ফিরে গেছেন মূল শিকড়ের দিকে। বাঁকুড়া-বীরভূমের ভাষা ও সংস্কৃতি যেভাবে তাঁর শরীরে মিশেছিল তা তাঁর গল্পের পরতে পরতে ছড়িয়ে ঝিটিয়ে রয়েছে। এক আশ্চর্য বাচনভঙ্গির দ্বারা তিনি তাঁর গল্প-পাঠককে মনোবিশিষ্ট ও আকৃষ্ট করে তুলেছিলেন। তাই তাঁর গল্প পড়তে পড়তে একালের পাঠকও পৌঁছে যান রামকুমারের গল্পের অন্দরমহলে। যেন এক মুহূর্তে সেই পাঠক হয়ে ওঠে তার গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র। আসলে এক অদৃশ্য বন্ধনের মাধ্যমে গল্পকার পাঠককে বেঁধে রাখতে চেয়েছেন তাঁর আবর্তে। গল্পকার এ যুগের পাঠককে শুনিয়েছেন দৈনন্দিনতার চলমানতার ধারাপাত। আঞ্চলিক জীবন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা এখনো এতটাই কম যে, তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাই আমাদের কাছে নতুন লাগবে। এর একটা বড়ো কারণ আমাদের জীবনের সঙ্গে, আমাদের জীবন দর্শনের সঙ্গে তার কোনো রকম মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমরা যদি এক নজরে অবিনাশ দোলাসের গল্প 'বলি'-এর দিকে তাকাই, সেখানে দেখব গাঁয়ের কুয়োর জল নেওয়াকে কেন্দ্র করে দলিত ও উচ্চবর্গীয়ের বিরোধে এক দলিত মা-কে পুড়িয়ে মারা হয়। রামকুমারের গল্প এতটা নৃশংস নয়, এমন ভাবে সরাসরি আঘাতের কথা শোনায় না। তাঁর গল্পে গোপন ক্ষতকে তুলে ধরেন, অনেকটা লুসিও রডরিগসের লেখা গল্প 'এই তো হয়' বা মহাশ্বেতা দেবীর 'রুদালী' বা আখতার মহিউদদিনের' 'বরফ' গোলার খেলা' ইত্যাদির মতো।

রামকুমারের 'প্রিয়াঙ্কার ছেলেই' — এই সংকলনের গল্পগুলি অনেকটাই ভিন্ন স্বাদের, তা গল্পের পাঠ থেকেই বোঝা যায়। তবে এই গল্পের নারী চরিত্রগুলোর বেশিরভাগই তাঁর উপন্যাসের চরিত্র থেকে উঠে এসেছে, অবশ্য এ কথা গল্পকার এই সংকলনের গোড়াতেই জানিয়েছেন। গল্পকারের এই বারোটি গল্পের মধ্যে যেন আমরা তাঁর ঔপন্যাসিক সত্তার প্রকাশকে খুঁজে পাই। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'দুখে কেওড়া', 'ভবদীয় নঙ্গরচন্দ্র' বা 'ধনপতির সিংহল যাত্রা' উপন্যাসের কথা ভুললে চলবে না। এই সমস্ত উপন্যাসের কাহিনির সঙ্গে সঙ্গে এখানকার চরিত্ররাও লেখকের মূল বৃত্তের পরিচয় দিয়েছে। এক সময় লেখক নিজের আত্মকথনেই স্বীকার করেছেন একথা : ''নিজের লেখা নিয়ে বলতে আমার অন্য এক অসুবিধেও আছে। আমি গাঁয়ের ছেলে ফলে ব্যক্তির একককে সেভাবে বুঝে উঠতে পারিনি

কখনো। দু-তিন বছর পরে কোনো আত্মীয় স্বজন বা ভিনগাঁবাসী ঘরে এসে চারপাশ জরিপ করে বলতো — 'ও মা, শ্যামলিকে বগ্না দেখে গেলুম এই সেদিন, ওর আবার বাছুর হয়েছে? সজনে গাছটা সে বছর লাগালে, এর যে ডাঁটা ঝুলছে গো। কালো হাঁসছানাটি ডিম দিচ্ছে? এটা তোমার ছোটোছেলেটা না? কাছে আয় বাপ। তুই যে পুয়োল ছাতুর মতো দিনে বাড়িস রাতে বাড়িস!' গরু, হাঁস, সজনে গাছের সঙ্গে পা মিলিয়ে যে বেড়ে ওঠা তা থেকে আমি আমাকে আলাদ করি কেমন করে?"[২] লেখক সত্য থেকে পিছু-পা হননি কখনোই, যা সত্য — তাকেই তিনি স্বাচ্ছন্দ্যে ভাষাবন্ধনের আবদ্ধে লিপিবদ্ধ করেছেন। কাহিনি বা ঘটনাধারা বর্ণনার মধ্য দিয়ে নিজস্ব ঐতিহ্যকে প্রকাশ করেছেন তাঁর প্রিয়-একাত্ম পাঠককুলের সম্মুখে। এই গল্প লেখার ঐতিহ্যকে আরো স্পষ্ট করে প্রকাশ করার জন্যই গল্পকার বেছে নিয়েছিলেন বারোটি নারী কেন্দ্রিক গল্পকে। এই সংকলনকে আরো আকৃষ্ট করবার জন্য তিনি প্রথাগত নামকরণের ছক থেকে বেরিয়ে এসে অতি স্পষ্ট ভাষায় পাঠককে শোনালেন নারীর সুখ-দুঃখ হাসিকান্নার দিনলিপিকে — 'প্রিয়াঙ্কার ছেলেই' গল্প সংকলনের মাধ্যমে। আমরা আমাদের আলোচনায় খুঁজে নিতে চেষ্টা করব রামকুমারের সেই সমস্ত প্রিয়াঙ্কা বা তাদের ছেলেদের ঐতিহ্যকেই। তবে তার আগে রামকুমারের গল্প ও গল্পকার সত্তার একটু পরিচয় নিয়ে নিই।

**তিন.**

বিভূতিভূষণ, মানিক এবং মূলত তারাশঙ্কর যে লোক-ঐতিহ্য অবলম্বন করে কথাসাহিত্যের অভিনব সৃজন বিশ্বের ঠিকানা দিয়েছিলেন, সেই ধারাকে আধুনিক সাহিত্যে যাঁরা অব্যাহত রাখতেই পেরেছিলেন রামকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। অন্ত্যজ, গ্রাম-ভারতের মানুষকে নিয়ে তিনি যে গল্প-উপন্যাস রচনা করেছেন তা কথাসাহিত্যের সৃজন-বিশ্বে একেবারেই ভিন্ন স্বর-স্বরান্তরের ব্যঞ্জনা দেয়। সাম্প্রতিককালে বেশ কিছু আলোচনায় রামকুমার 'গ্রামীণ জীবনের গল্প লেখেন' বলে চিহ্নিত হয়েছেন। একথা তিনি নিজেও স্বীকার করে জানিয়েছেন : ''আমার বেড়ে ওঠা বাঁকুড়া জেলার একটি গ্রামে, রাঢ় বাংলার সংস্কৃতি ও সমাজের মধ্যে। তুসুগান, বাউল, রামায়ণ, কীর্তন এসব নিয়ে আমার শৈশব ও কৈশোরের জগৎ।"[৩] কিন্তু এভাবে লেখককে নির্দিষ্ট কোনো আবর্তে বেঁধে দেওয়া যায় না। গ্রাম তাঁর গল্পে প্রেক্ষাপট হয়ে আসে, সেই পটে যেসব চরিত্র ও ঘটনা প্রবাহ আঁকা হয়ে যায় — তাদের আবেদন তুচ্ছ দেশ-কালের সাময়িকতা অবলম্বন করেই একান্ত মানবিকতায় উত্তীর্ণ হয়ে ওঠে।

রামকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর গল্পগুলোতে গল্প কথনের একটা বিশেষ ভঙ্গির প্রবর্তন করেছেন, যা অন্যদের তুলনায় তাঁকে অনেকটা দূরত্বে দাঁড় করিয়ে দেয়। গল্পের পরতে পরতে পাঠকও যেন কখন গল্পের ভিতর থেকে রুক্ষ মাটির কথা তার নিজের মতো করে শুনতে শুরু করে। পাঠককে নিজের বৃত্তের দিকে টানার এক অদ্ভুত শক্তি রামকুমারের মধ্যে দেখা গেছে—যা তিনি অর্জন করেছেন কতকগুলি পর্যায়কে[৪] অতিক্রম করে। প্রথম পর্যায়ে 'মাদলে নতুন বোল' গল্প গ্রন্থের অন্তর্গত গল্পগুলি — যা রচিত হয়েছে ১৯৭৩ থেকে ১৯৮১- এর মধ্যে; এই পর্বের গল্পগুলি অনেক বেশি বোধগম্য, একমুখী ও সাবলীল।

কারণ এই পর্যায় তাঁর খোলোস ভাঙার পর্ব, এখানে তাঁর দেখার চোখ তখনো প্রান্তিক মানুষের মতো হয়ে ওঠেনি। 'বৌ, মেয়ে, অ্যালসেসিয়ান ও পাইপ', 'পিকনিক', 'দায়বদ্ধ', 'নিত্যগোপালের প্রত্যাবর্তন', 'ছোবল', 'একটি পেঙি কুকুরের সুখ-দুঃখ', 'রাজসভা কাহিনী', 'মাদলে নতুন বোল' এবং 'পেয়ারা বুড়ো পান্তা বুড়ি' — গল্পের শীর্ষ নাম ও বিষয় হিসেবে যে সমস্ত কাহিনি ব্যবহৃত হয়েছে তা নিতান্তই খুচরো পয়সার মতো। গদ্যও তেমন শাণিত নয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি শুধু চোখে দেখা বা কানে শোনার উপর নির্ভর করে থাকল না। লেখক নিজেও যেন গল্পের চরিত্রদের সঙ্গে একাত্ম হতে শুরু করলেন। ফলে গল্প আর নিছক ঘটনার বর্ণনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল না — তা পারিপার্শ্বিক আবর্তে ছড়িয়ে যেতে শুরু করল, প্রবেশ করতে থাকল চরিত্রের অন্তর্জগতে। তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পরিবর্তন আনলেন আখ্যান রীতিরও। এই পর্যায়ের গল্পগুলো ১৯৮১ সালে লেখা 'বাঁকুচাঁদের গেরস্থালি' থেকে শুরু করে ১৯৯৪ সালের 'পরিক্রমা' গল্পটি লেখার আগে পর্যন্ত। এখানে তিনি বিবৃতিকরে ঘটনার মধ্যে শুধু সীমাবদ্ধ থাকলেন না, শুরু করলেন একটি কথন ভঙ্গিমা। অর্থাৎ লেখক নয়, অভিজাত সমাজের কেউ নয়, যাদের গল্প তাদেরই কেউ যেন ঘটনা নয় নিজেদের রোজকার কথাগুলো অন্যকে শোনাচ্ছে, সে শোনাচ্ছে তার পরিচিত কাছের মানুষকে। কিন্তু সেই পরিচিত গণ্ডির মধ্যে কখন যেন বিনা বাধায় পাঠকও প্রবেশাধিকার লাভ করে ফেলে। তাই এই পর্বের গল্পগুলি অনেকবেশি অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। 'গোষ্ঠ', 'জ্যৈষ্ঠ ১৩৯০', 'ঘুঘু কিংবা মানুষ', 'জ্যোতিষী', 'বনমালির পৃথিবীতে ফেরা', ''বাকুচাঁদের গেরস্থালি', 'আকর্ষণ ও বিকর্ষণ' 'মৌজা ডোমপাটি', 'হাউসে', 'সখিনা', 'সম্পর্ক', 'চরৈবেতি' প্রভৃতি এই পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য গল্প।

পরবর্তী পর্যায়ের সূচনা ১৯৯৪ সালে 'বারোমাস' পত্রিকার শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত 'পরিক্রমা' গল্প দিয়ে। এই পর্বের গল্প আরো বেশি সমৃদ্ধ ও শাণিত। তিনি আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবনের মধ্যে আটকে থাকলেন না; শুরু হল তাঁর পথ চলার পরিক্রমা। ২০০০ সালের পর তিনি বিশেষ কতকগুলো মূল কাঠামোকে ধরে নিয়ে প্রসঙ্গ পাল্টাতে থাকলেন। সেগুলো এক একটা ছোটোগল্প, কিন্তু সবগুলো একত্রিত করলে উপন্যাসের রূপ পায়। হয়ে ওঠে নতুন একটা আখ্যান ভঙ্গি। যেমন — 'দুখে কেওড়ার স্বাস্থ্য ভাবনা', 'দুখে কেওড়ার বিশ্ব' গল্প = 'দুখে কেওড়া' উপন্যাস; 'প্রিয়াঙ্কার ছেলেই' গল্প = 'ভবদীয় নঙ্গরচন্দ্র' উপন্যাস; 'দা-কাটা' গল্প = 'কথার কথা' উপন্যাস। তাছাড়া এই পর্বেই তিনি রচনা করেন 'চমকাইতলা চলো', 'গুরু-তর্পণ' ইত্যাদি গল্প। এই পর্যায়ের গল্পগুলোকে পুলিৎজার পাওয়া পটোগ্রাফের সঙ্গে তুলনা করা চলে। এই ফটোটি যেমন বিশ্ব দরবারে গোটা আফ্রিকার চিত্র তুলে ধরে, তেমনি এই গল্প বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রান্তিক মানুষদের নির্ভেজাল ভাবে ফুটিয়ে তোলে। এখানে আলাদা করে বঞ্চনা বা প্রতিবাদের ভাষা গড়ে তুলতে হয় না।

**চার.**

নিম্নবর্গের জীবন ও সংস্কৃতি নিয়ে আধুনিক কথাসাহিত্যিকরা যে কথনকৌশলের উপাস্থাপন করে চলেছেন, রামকুমার মুখোপাধ্যায় নিঃসন্দেহে সেই ধারার মধ্যে এক স্বতন্ত্র নক্ষত্র।

দেশীয় ঐতিহ্যকে, লোকায়ত লৌকিক চিন্তা-চেতনার ধারাকে তিনি যেভাবে তুলে ধরেছেন, তা আঞ্চলিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এক অভিনব প্রয়াস। এই অভিনবতার কারণেই ২০০৮-এ প্রকাশ পেয়েছিল 'প্রিয়াঙ্কার ছেলেই' গল্প সংকলনটি। বারোটি ভিন্ন ধরনের গল্পের প্রথম গল্প 'পিকনিক' (গল্পগুচ্ছ, ১৯৮০),— যা শ্রেণি বৈষম্য নিয়ে লেখা। এই বৈষম্য কেবলমাত্র পাঠক ও গল্পচরিত্রের মধ্যেকার। লেখক জানিয়েছেন, পদি, সুদি, গঙ্গি—এইসব মেয়েদের কথা; যারা জীবনে একবার বই দু'বার মোটরগাড়ি দেখেনি, যার নাম তাদের ভাষায় 'কাছিম গাড়ি', 'আবার পিকনিককে তারা বলে 'মাঠ রান্না'। এই মাঠরান্নাই করতে এসেছিল শহর থেকে মাগি-মরদের দল, গ্রামের মাঠে। গ্রামের মানুষ কোনো দিন শহুরে কালচারের সঙ্গে পরিচিত নয়, তাই তেঁতুল গাছের নীচে 'মেয়েটার গায়ে ঠেস দিয়ে মরদটা কোমর ভেঙে বসে' থাকাকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক। গল্পটিতে চমক জাগায় খাওয়া-দাওয়ার পর্বে এসে। গঙ্গি তারই বয়সি একটি ছোট্ট মেয়ের খাবার পাতার দিকে তাকায় : ''পাতায় তার জন্যে একটাও মিষ্টি পড়ে নেই। একে একে ওঠে সবাই। নেড়া, গোবরা সব্বাই ছুটে যায় পাতাগুলোর দিকে। কুকুরটা এদিক ওদিক পাতা টানাটানি করে। গঙ্গির চোখের সামনে লাল দই, পোয়াতি মিষ্টি, মাংস, লালজামা, লালজুতো ভাসে। গঙ্গিকে সামনে দেখে মেয়েটা পাতাখানা ঠেলে দেয়। একেবারে সামনে পেয়ে মেয়েটাকে ভেংচে ওঠে। ... চাতালটা থেকে নেমে ছুটতে ছুটতে পালিয়ে যায় গঙ্গি। বুকের কাছে দু-হাতে জাপটিয়ে ধরে থাকে এঁটো পাতাটা।''[৫] এভাবেই গল্পটিকে শেষ করেন গল্পকার। মানুষের চাওয়া-পাওয়ার অঙ্গিকারকে মেটাতে পারেননি তিনি। তবে ইচ্ছাটাকে সবার সম্মুখে প্রকাশ করেছেন গঙ্গি চরিত্রের মধ্য দিয়ে। গ্রামের মানুষের ইচ্ছা-প্রবণতা ও পরচর্চা, পরনিন্দা ইত্যাদি সামাজিক ক্রিয়াকলাপ অতি নিপুণ হস্তে ঔপন্যাসিক রামকুমার গল্পকার সত্তার মাধ্যমে ভাষা দিয়েছেন। পাঠকও নিজ নিজ উদ্গ্রীবতার সঙ্গে গ্রাম্য পরিবেশে আয়োজিত 'পিকনিক'কে অন্য ভাবে উপভোগ করেছেন।

গল্পকারের পথিক পরানটির পরিচয় পাওয়া যায় 'জাতিস্মর' (পরিচয়, ১৯৯১) এবং 'চরৈবেতি' (কুঠার, ১৯৯৩) গল্প দুটির মধ্যে। বৈষ্ণবীয় রসের প্রকাশ লক্ষ করা গেছে উভয় গল্পে। তবে গল্প দুটি বারংবার পাঠ করলে মনে হবে 'তিলে তিলি নূতন হোয়'। বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গের প্রসঙ্গে অমর মিত্রকে সাক্ষাৎকারে গল্পকার রামকুমার একদা জানিয়েছিলেন: 'আমাদের বহু সামাজিক সংস্কার থেকে মুক্তির হদিশ বৈষ্ণব জীবনদর্শনে পাওয়া যায়। এটি আমার গল্পচর্চার দ্বিতীয় পর্ব। ছেলেবেলা থেকে বৈষ্ণব কীর্তনিয়াদের সঙ্গে বেড়ে উঠেছি, এদের জীবনবোধ আমাকে খুব স্পর্শ করে। আসলে চলার ভেতর জীবনটা যেন নতুন হয়ে ওঠে।' এভাবেই পথ চলতে চলতে মনোহরদাস ঠাকুরের টানে সংসারের মায়ার জাল ছিঁড়ে পথে নেমেছিল কিষ্ট সামুই। তারপর পথই তার ঠিকানা — এক আখড়া থেকে আরেক আখড়া। এই সূত্রেই এসে যায় মেলা-কীর্তন-যাত্রাপালার প্রসঙ্গ। এমনই এক সোনামুখীর মনোহরদাসের মেলায় রাধার বাপ কিষ্ট সামুই তথা কিষ্টদাস বাবাজীকে খুঁজতে এসেছে রাধার মা, পেয়েও যায়। প্রত্যহের যাপন সংবাদ জানিয়ে বাবাজীকে বলে : ''মুনিশের দাম বেড়েছে। তাদেরও ইউনিয়ন। আট ঘন্টা কাজ। বেতন পঁচিশ টাকা।''[৬]

আরো বলে, ''পস্তু পানাতে এবছর ডোবার এক মণ মাছ মরে গেচে। খাপুস খাপুস করতে করতে সব ভেসে উঠল গো।''[৭] সংসারের দড়ি ছেঁড়া উদাস মানুষের সঙ্গে বাবাজী তার জীবনসহচরীর অনেকদিন পর কথাবার্তা, ঘরণীর মান-অভিমান, নতুন করে সংসার আস্বাদন — এ সবই ভেসে ওঠে তার মনে। কিন্তু বাবাজী এখন জীবনের পথ চলার পথিক, তাই পথের আহ্বান তো তার কাছে আরো মধুর, আরো গভীর। ফলে বর্ধমানের বাসে রাধার মাকে তুলে দেয় বাবাজী। এরপর তাকে যেতে হবে মুসলে, তারপর লোকোশোল, তারপর বনবীরসিং — আরো অন্যত্র। আর দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে সব কীর্তনের আসরে প্রতিটি মুখে রাধার বাপকে খুঁজে — শেষ পর্যন্ত পেয়েও তাকে ধরে রাখতে পারে না। কিষ্টদাসের ঝুলিতে পরম মমতায় ঘি, মধু, নাড়ু রেখে রাধার মা-কেও ঘরে ফেরার পথ ধরতে হয়। গল্পকার এমন বর্ণনার মাধ্যমে কীর্তনের নানা বর্ণনা দিয়েছেন, পদাবলীর ঘেরা ছকে জীবনের সাধ আর দীর্ঘশ্বাস ধরে দিয়েছেন। আর রাধার মা সারা জীবন দিয়ে যা অনুভব করেছে, বুঝেছে-গল্পের সার কথাও তাই শোনায় : ''পুরুষ মানুষকে বাঁধতেই তো ঘর বাঁধা। বনের গোরু কাঁধে জোয়াল নেয় আর ঘোরা মানুষটা যে ফাঁক পেয়ে পিছলে বেরিয়ে যায়! রাধার মা ঘর বাঁধতে জানে কিন্তু পথ বাঁধবে কেমন করে গো?''[৮] গল্পের শেষে রাধার মা-র বুকের আগুনে, চোখের জলে কিষ্টদাসের পথের মায়ায় পথে চলার বিপ্রতীপে জীবনেরই এক নতুন ভাষ্য লেখা হয়ে যায় যেনবা।

'জাতিস্বর'-এ কিষ্টদাসকে যেমন সংসারের মায়া-বন্ধন বেঁধে রাখতে পারেনি, তেমনি 'চরৈবেতি'র গোপা সচ্ছল সংসারে পাট-করা ঝি, ইউনিট ট্রাস্ট আর ইন্দিরা বিকাশের প্রাচুর্য, জীবন অক্ষয়ের সম্ভাবনা কোনো কিছুই গোপাকে সংসারে বেঁধে রাখতে পারল না: ''ও বাঁশিতে ডাকে সে শুনেছি যে আজ/মোর পরান কাড়িতে চায় সে রাখালরাজ।''[৯] যে মেয়ে একদিন তার গোপন ভালোলাগার মানুষের খোলের তালে তালে নেচে বেড়িয়েছে, জামশলার যাত্রাগানে যার আগে কেউ তালাই পাততে পারেনি, মাঠের কাজে কেটেছে অনেক সময়, সে মেয়ে এখন তিনটে শ্যালো-চলা গৃহস্থের ছ-কুঠুরীর ঘরে যেন 'অশোকবনে সীতা।'' এখানেও বাবাজী আছেন, আছেন শাক্ত গুরুর শিষ্য। ঠাকুরদাস বাবাজী তাকে শোনায় 'বড় বিপদের ফল' লাউয়ের কথা। কেননা সে 'কাটলে সুর, ফাটলে অসুর'। বাখান করে বলে : ''লাউ কেটে একতারা। ... হাতে একতারা উঠলে তুমি শুধু সুরটি ধরে আছ — গান গেয়ে চলেছে পথ, নদী-বিশ্বব্রম্ভাণ্ড। ... তবে লাউ ফাটলেই গণ্ডোগোল। সুর কাটলেই অসুর। জীবনটি ফেঁসে গেল। ... মানবজীবন বড় অমূল্য ধন। সে ধন নিয়ে কজন মহাজনী কারবার করতে পারে?''[১০] কিন্তু দেখা গেল, গোপা পারো — তার রক্তের মধ্যেই যে আছে তার রাজনীতি-করা বাপের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। খাঁচার পাখির মতো তাই সব নিষেধের বেড়ি ভেঙে ফেলে ঠাকুরদাসের পথে সঙ্গিনী হয়ে চলে গেছে গোপা। কিন্তু সেখানেও সে স্থিতি পায়নি। গল্পের শেষে সেই পথের মেয়ে রাঢ়ের গেরুয়া বর্ণ বসনে আবৃত। হাতে একতারা। কপালে চন্দনের টিপ। কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি। আর গোপার ললাটে পথের নিদান। এভাবে মথুরা থেকে বৃন্দাবন, বৃন্দাবন থেকে পুরী, পুরী থেকে নবদ্বীপ, নবদ্বীপ থেকে ভিলাই — ক্রমাগত এগিয়ে চলে পথ চলা। এই পথ চলতে চলতে গল্পকারের

পথিক পরানের সঙ্গে পাঠকও কখন একাত্ম হয়ে পায়ে পা মেলায়। ভুলে যেতে হয়, কখন গল্পের পাঠ থেকে গল্পের অন্দরমহলের একটা চরিত্র রূপে আবির্ভূত হয়ে ওঠে পাঠক সত্তা। এই ঐতিহ্য-ই গল্পকার রামকুমারকে স্বতন্ত্র করে দেয়।

গল্প গ্রন্থের পরবর্তী গল্প 'সখিনা'-তে (কালান্তর, ১৯৯৩) রামকুমার প্যারাগ্রাফ থেকে প্যারাগ্রাফান্তরে কেমন করে সিচুয়েশন গোল রয়েছেন, তার পরিচয় স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে। আলোচ্য গল্পে মজিদ, বউয়ের কাছ থেকে হাত পেতে টাকা নিতে কখনো কখনো তার সম্মানে বাধলেও, তাকে এই ভাবনার নেশা পায় যে, ''সখিনা কারো খুড়ি, কারো বউদি, কারো শুধু সখিনা। তার বউয়ের একটা আলাদা ইজ্জত। ঘরের পুরুষদের এখন পোশাক বদলাচ্ছে। বউয়ের পয়সার কারো গায়ে লাল গেঞ্জি চাপচ্ছে, কারো পায়ে চটি।...''[১১] এই সখিনাকেই আবার দেখব সাংসারিক কাজকর্মে সুনিপুণা — 'ছেলেমেয়ের চর্চা, রান্নাবান্না, গোরু দেখা সবই করতে হয়' তাকে। সাংসারিক কাজকর্মের পাশাপাশি গ্রামের মানুষজনদের জন্যও সে কিছু করতে চায়; তাই রতনের বুদ্ধিকে মেনে নিয়ে হবপুকুরের ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের কাছ থেকে বাড়তি লোন করিয়ে লরিতে করে বস্তা বস্তা বেল-খোলা আনিয়েছে কলকাতা থেকে। বিশ-ত্রিশটা সংসারের মেয়েদের নিয়ে এ যেন একটা উৎসবের মহড়া তৈরি হয়। লরিটা পিচরাস্তা পেরিয়ে দিঘির গা পর্যন্ত এসে আর এগোতে না পারলে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ের দল লরির খালাসিদের সঙ্গে কাজে হাত লাগায়। গল্পের পাঠে আছে : ''মেয়ের ঝাঁক গাড়িতে ওঠে। লরির খালাসিরা হাত লাগায়। সপ্তপর্ণে নামান হয় বেল খোলার বস্তা। সখিনা সই করে দেয়। মেয়েরা এক একটা বস্তা তুলে নেয়। কেউ কোমরে, কেউ মাথায়।''[১২] গল্পকার দেখিয়েছেন, এক জেনারেশন বেলখোলার বস্তা লরিতে তোলার ঘর্মপাত করে। আর পরের প্রজন্ম 'লণ্ঠনের আলোয় পথ দেখায় বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো'।[১৩] এ গল্পেও গল্পকার যেভাবে গল্প কাহিনিকে এঁকেছেন, যা পড়তে পড়তে গল্পকারের এক ভিন্ন সত্তার পরিচয় ফুটে ওঠে — যেখানে সম্পূর্ণ নারী মনস্কতায় পরিপূর্ণ, স্বতন্ত্র রামকুমারকে খুঁজে পাওয়া যায়।

'সখিনা' গল্পের মতোই নারী-ই সমাজের মধ্যমণি বা সমাজের একটা উচ্চপদস্থ স্থান অর্জন করে রয়েছে 'শরীরের ভাঙা-গড়া' (প্রতিক্ষণ, ১৯৯৪) গল্পের পঞ্চায়েত অফিসের বিডিও ম্যাডাম। যদিও গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে গ্রামীণ রাজনীতির চিত্র। তবে সমগ্র গল্পটি যাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে, সেই ফুলমণি — যে পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্যা। তাকে পরের বাড়ির কাজ সেরে নিজের সংসার সামলাতে হয়। গল্প পাঠে ফুটে ওঠে তার পরিবারের বিভিন্ন ভাঙা-গড়ার ছবি। ফুলমণির ব্যস্ততার পরিচয় পাওয়া যায় পঞ্চায়েতের দফাদার সন্ন্যাসী ঘুঘু বিডিও দিদিমণির ইচ্ছানুযায়ী তাকে খুঁজতে বেরিয়ে, দেখা হলে সন্ন্যাসী বলে :

'বিডিও দিদিমণি এসেছেন, সভাপতি এসেছেন। মিটিং হবে।'

'আগে বলেনি তো!'

'আগে ঠিক ছিলনি। নতুন বিডিও দিদিমণি আর সভাপতি সাক্ষরতা করতে তোসলেন। তা দিদিমণির ইচ্ছে মেয়ে মেম্বারদের সঙ্গে কথা বলবেন। তোমাকে খবর দিতে এলুম।'

'তিনটে বাজতে তো দেরি আছে গো। সাতজন রুইছে। আমি যাই কেমন করে?'

'সেক্রেটারি বললে জরুরি মিটিং।'

'সবই বুঝলুম। ছেলেটা মাই খায়নি সকাল থেকে। ঘর হয়ে যেতে হবে।'

'দেরি হয়ে যাবে বাবু', সন্ন্যাসী বলে। 'মাঠ থেকে সোজা যেতে পারবেনি?'"[১৪]

ফুলমণি নির্দিষ্ট সময়ে মিটিং-এ যোগ দিতে পারেনি। দৈনন্দিন ধরাবাঁধা ছক ভেঙে বেরোতে পারেনি ফুলমণি। তাকে সব কাজকর্ম সেরে তবেই যেতে হয়েছিল অনেক পরে। গল্পকার রামকুমার এখানে ফুলমণি চরিত্রের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন নিয়মানুযায়ী কর্তব্যরতা নারীকে। আর গল্পের শেষাংশে তিনি ফুলমণির পরিবারেরই 'ভাঙা-গড়া'র চিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছেন তুলির আঁচড়ে। এখানে সেই দীর্ঘ আঁচড়ের ছোঁয়াই তুলে ধরলাম : "পরেশ বাঁ পা খানা শুইয়ে রেখেছে মাটিতে। ডান পাটা বুক বরাবর ডান পর্যন্ত সোজা উঠে গেছে। হাঁটু থেকে ভেঙে আবার নেমেছে নীচে। ডান হাতটা কনুই বরাবর ভেঙে পায়ের পাতায়। বাঁ হাতটা কনুই বরাবর ভেঙে পায়ের পাতায়। বাঁ হাতটা ছেলের মাথাতে। নিতম্বের ওপর শরীরের ভরকেন্দ্র। বহুযুগের অর্জিত এক ভঙ্গি। ঝড়ের আঘাত সারা মুখে। চোয়ালে ভাঙনের স্পষ্ট চিহ্ন। কপালে নানা ভাঁজ। বাঁ পায়ে ছোটোটি শুয়ে আছে, শরীরে এক আশ্চর্য প্রাকৃতিক প্রতিরোধ। এ রঙ গ্রীষ্ম পুড়িয়ে দিতে পারে না, বর্ষা ধুয়ে দিতে পারে না। জঙ্গলের কাঠের শরীরের মতোই এই ঘয়েরি রঙ শরীরে আটকে থাকবে চিরটা কাল। মেজোটি জানালার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। যেন এভাবেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারে বহুকাল। দাঁড়িয়ে থাকবে মোষ পালের গায়ে, জঙ্গলে শালের পাশে, রাতে জমির মাথায় ফসল রক্ষার তাগিদে। বসে আছে ফুলমণি নিতম্ব দুটি মাটির পর স্থাপন করে। পা দুখানা বুকের দিকে অনেকখানি উঠে গিয়ে আবার নেমেছে মাটিতে। দু-হাঁটুর মাঝে এক দীর্ঘ শূন্যতা। সে শূন্যতা ভরাট হয়ে এসেছে পাদমূলে। আঙুলের কাছে দুই পাতা খানিকটা সরে গেছে। দু-পাতার মাছে খানিক খাদ, বাঁদিকে স্তন বেশ খানিকটা খোলা। এখনই হয়তো ছোটোখোকা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে খাদ্যের সন্ধানে। ডানদিকের স্তন কাপড়ে ঢাকা। সমস্ত লজ্জা আচ্ছাদিত আছে সযত্নে। হাত দুটো বাহুমূল থেকে বাড়তে বাড়তে দু-হাঁটুর গা বেয়ে সামনে জড়ো হয়েছে। শরীরটাকে আগলে রেখেছে এক প্রত্যয়ী প্রাচীরে। এই সমগ্র ভঙ্গির ভেতর কোনো এক প্রাগৈতিকহাসিক ইতিহাস ধরা আছে। পরেশ, ছোটো, মেজো এবং ফুলমণি মিলে যেন একটা ছবি, ছবির মানুষগুলোর যে শরীর তা যেন এভাবেই ভাঙে, ভাঙা উচিৎ।"[১৫] গল্পকার এভাবেই গল্পের সারকথা শোনান। যে ছবি তিনি তুলে ধরেছেন গল্পের পাঠে — তা অত্যন্তই অভিনব। এভাবেই যেন ফুটে ওঠে শরীর-পরিবারের ভাঙা-গড়া।

'শাখা' (যুগান্তর, ১৯৯৪) গল্পের শুরুতে দেবী সায়ের ও অমূল্য শাঁখারি সংক্রান্ত কিংবদন্তির মধ্যে বাস্তব ও প্রকল্পনার সীমা মুছে যাওয়াতে পাঠকৃতির সূচনা হলেও ক্রমশ অমূল্যের উত্তরপুরুষ শুভ্রের উপস্থাপনায় বাস্তবতার রং বদলের ছবি ফুটে উঠেছে। অমূল্য শাঁখারি, দেবী সায়ের, দেবীকে শাঁখা পরানোর অলৌকিক ইতিবৃত্ত সময়ের পরপাঠে নির্মিত থেকে বিনির্মিত হয়ে যায়। এবং গল্পের শেষে দেবী সায়েরের পাড়ে গোহাট বসে। পুঁজিবাদ ও সামন্ততন্ত্রের গাঁটছড়ায় ব্যক্তি অস্তিত্ব কীভাবে বিধৃত, তা গল্পের নিজস্ব ভাষা-ভঙ্গিমায়

রামকুমার স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন নিজস্ব ঐতিহ্যের সংমিশ্রণে।

রামকুমারের গল্পে মানুষ নানা সংঘাত ও বিপ্রতীপ পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করেও অপরাজিত থেকে যায় জীবনের কাছে — এ ছবি তার প্রায় সমস্ত গল্পের মধ্যে উপস্থিত থেকেছে। তাই 'পরিক্রমা' (বারোমাস, ১৯৯৪) গল্পে দেখি, ময়নার মা তাঁর সব সন্তান সন্ততিদের নিয়ে একত্রে থাকতে চেয়েছিল নবীন গঞ্জে। কিন্তু যখন সাফল্যের হাতছানিতে সবাই দূরে দূরে চলে যায়; তখনো ময়নার মা সবাইকে নিয়ে একত্র থাকার দুর্দমনীয় স্বপ্নে বিভোর থেকেছে। স্বামী শ্রীনাথের মৃত্যুর পরেও নিঃসঙ্গ হয়ে যায়নি সে। কারণ তার মনের মাঝে অনুভূতিপ্রবণ নারী নিজস্ব ক্ষেত্র গড়ে নিতে পেরেছিল। তার ভগবান পাণ্ডার সঙ্গে শ্রীক্ষেত্র যাওয়ার স্বপ্ন, টিয়ে রঙের বেনারসীর স্বপ্ন কখনোই পূরণ হয়নি। তবু স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার পরেও শতবর্ষ অতিক্রান্ত ময়নার মা স্বপ্ন দেখে চলে; তার স্বামীর হাতে টিয়ে রঙের বেনারসী, সমগ্র পরিবারকে সে একত্র করছে ভারতবর্ষের এমনকি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, শ্রীনাথ চক্রবর্তীর সমগ্র পরিবার ভগবান পাণ্ডার পেছন পেছন জগন্নাথ দর্শনে যাচ্ছে। চারিদিকের এই ভাঙন, অবক্ষয়ের মাঝেও অক্ষয়ের সাধনা রামকুমারের। তাই গল্পের শেষাংশে উঠে আসে, হাতির প্রতীক — মাঙ্গল্য ও শুভবোধকে প্রতিষ্ঠিত করতে; যা বাহিত হবে পরবর্তী প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। মনে হয় এ যেন জীবনের এক অন্য ধরনের 'পরিক্রমা'।

আলোচ্য গল্প সংকলনের আরো একটি উল্লেখযোগ্য গল্প 'প্রিয়াঙ্কার ছেলেই' (প্রমা, ২০০০)। এই নামটিই অবশ্য সংকলনের শীর্ষ নাম এবং গল্পটি আগাগোড়া কতকগুলো চিঠির সমষ্টি। 'প্রিয়াঙ্কার ছেলেই' শীর্ষক চিঠিতে প্রিয়াঙ্কা গান্ধি পুত্র সন্তান সম্ভবা এই সংবাদ জেনেই পত্রপ্রেরক তার স্বভাব সুলভ পরিজন বোধে উদ্বিগ্ন হয়েছেন। আসন্ন সন্তানটির দেখা শোনার জন্য চার রকমের চিকিৎসাপদ্ধতির উল্লেখ আছে চিঠিতে। যে পরীক্ষার 'কল্যাণকৃপায়' সংবাদপত্রে ছাপা — 'প্রিয়াঙ্কার ছেলেই হবে'। তখন আজন্ম গ্রাম্যপালিত এই মানুষটি বিজ্ঞানের হাত ধরে গর্ভস্থ সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণ প্রক্রিয়াকে বোধ হয় মেনে নিতে পারেননি; আর পারেননি বলেই তার কণ্ঠে শোনা যায় : ''ভগবান যেটি দিয়েছেন সেটিই আনন্দ করে নিতে হবে। আর ছেলে কি মেয়ে তাতে কী এসে যায়? তোমার ঠাকুমার মতন মেয়ে হলে জগৎ সংসার তো আলো।''[১৬] একথা একেবারে গ্রাম্য কালচারকেই শোভা দেয়, আধুনিক প্রজন্ম এর অনেক দূরে। রামকুমারের এ গল্প সম্পূর্ণত ভিন্ন ধারণার। এ গল্প পাঠক্রিয়ায় আধুনিক প্রজন্মকে খুব সহজেই গল্পকারের বৃত্তের দিকে আকৃষ্ট করবে। তৈরি হবে রামকুমারের গল্প পাঠের নতুন শ্রেণির পাঠককুল।

রামকুমারে এ গল্প সংকলন এক অন্য ধরনের মানবী চর্চার সমাহার। যেখানে আছে বিষয় ভাবনার অভিননবত্ব, পরীক্ষামূলক আঙ্গিক, মিথ ও লোকাচার — এসবের আবরণে তিনি নারীকে নানারকম ভুষণ ও বসন পরিয়েছেন। এই সংকলন গ্রন্থের পরবর্তী শেষ চারটি গল্প — 'চমকাইতলা চলো' (প্রতিদিন, ২০০০), 'প্রেম কী : একজন গবেষকের ভাবনা' (নন্দন, ২০০০), 'দুখে কেওড়ার নারী ভাবনা' (বারোমাস, ২০০১), 'কুপিত দেবীচণ্ডী' (অনুষ্টুপ, ২০০৬)। এই চারটি গল্পই ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিক নিয়ে রচিত; একটা

গল্পের সঙ্গে আরেকটা গল্পের কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। 'চমকাইতলা চলো' গল্পে গল্পকার কতকগুলি ভাগে গল্পটি উপস্থাপনা করেছে — 'বিধিসম্মত সতর্কীকরণ', 'দেবী মূর্তি', 'দেবীর পূজা', 'দেবীর মাহাত্ম্য', 'চমকাই মায়ের ঔষধ', 'মায়ের স্বরূপ'। প্রতিটি ভাগই রচিত হয়েছে কাদড়ার গ্রামদেবী চমৎকারিনি বা চমকাই-মাকে নিয়ে। পরবর্তী গল্প 'প্রেম কী : একজন গবেষকের ভাবনা'-তে লেখক সম্পূর্ণ খোলোস পাল্টে দিয়ে একজন গবেষকের আসনে উপণিত হয়েছেন। 'মা-বাবার জীবনে প্রেমের আতিশয্য'-কে দেখে গবেষকের এই গবেষণার আসর। তবে তিনি স্বীকার করেছেন : ''অবশ্য প্রেম কী বা প্রেমের আতিশয্য কী তা বলতে পারি না।''[১৭] 'দুখে কেওড়ার নারী ভাবনা' গল্পে গল্পকার 'দুখে কেওড়া' উপন্যাসের পরাপাঠকে এখানে তুলে ধরেছেন গল্পের কাহিনিতে। আর 'কুপিত দেবীচণ্ডী' গল্পের যে কাহিনি তা আমরা পেয়ে যাই 'ধনপতির সিংহল যাত্রা' উপন্যাসের পাঠে, গল্পের শুরুতেই তার পরিচয় পাওয়া যায় : ''ধনপতি সদাগরের পায়ের আঘাতে ছিটকে যায় খড়ের বিড়া আর গড়াগড়ি যায় খুল্লার পাতা চণ্ডীর মঙ্গলঘট।''[১৮] রামকুমার মুখোপাধ্যায় এই যে উপন্যাসের পাঠ থেকে গল্প নির্মাণ বা গল্পের কাহিনিকে উপন্যাসের পাতায় স্থান দিয়েছেন — এ তাঁর নতুনতম সংযোজন বলা চলে। আসলে প্রতিটি গল্পের মূল কেন্দ্রবিন্দু যে নারী চরিত্রকে দেখানো, শুধু দেখানো নয়, তার জীবনধারাকে ফুটিয়ে তোলা — সেই কক্ষপথ থেকে তিনি কখনোই পিছু-পা হননি।

**পাঁচ.**

সাম্প্রতিক গল্পের ধারায় রামকুমার মুখোপাধ্যায় এক নবতর সংযোজন। বিষয়বৈচিত্র্য, গল্প কথনভঙ্গি, আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগ, দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ ইত্যাদি প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়কে তিনি তাঁর গল্পের সৃজনে স্থান দিয়েছিলেন। তাঁর গল্প হয়ে উঠেছে এ কালের পাঠকের মনোগ্রাহী ও সুখ প্রদানকারী। নারী কেন্দ্রিক এই বারোটি গল্প পাঠ থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, গল্পকার রামকুমার নিজেকে অনুকরণ করেন না; যে অভিজ্ঞতা একবার ব্যক্ত হয়েছে কিম্বা যে গল্প একবার লেখা হয়ে গেছে — সে গল্প তিনি দ্বিতীয়বার লেখেন না। তার সবচেয়ে বড়ো কারণ, তিনি বিষয়বস্তু নির্বাচনে অত্যন্ত মনোযোগী এবং সচেতন; তাই প্রতিটি গল্পের ক্ষেত্রেই সৃষ্টি করেন উপলব্ধির নতুন আবহ। বিশেষ করে তাঁর ভাষায়, লোক-উপাদান ব্যবহারের কৌশল, গ্রামীণজীবন সম্পৃক্ত রীতি, আচার-বিশ্বাস, আমাদের পরিচিত পুরাণ কাহিনি থেকে সেই কাহিনির ভাষার আটপৌরে অথচ সুদূরগামী কাব্যিক ভাষা বৈশিষ্ট্য — প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি স্বাতন্ত্র্যের একটি রেখাচিত্র অঙ্কন করে চলেন। তাঁর গল্পের 'পাঠ' থেকে উঠে আসে বহুমাত্রিক 'ভাবনা' — যা পাঠককে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় ভাবায়। যা থেকে খুঁজে পাই তার গল্পের ঐতিহ্য।

বিগত তিন দশক ধরে গল্পকার রামকুমার আমাদের উপহার দিয়েছেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্ররীতির গল্প। এই স্বাতন্ত্র্যতাই গল্পকারকে মিশ্র সময়ের লেখক করে তুলেছে। রামকুমার জানতেন, আমাদের জীবনে প্রথাসিদ্ধ আরম্ভ বা সমাপ্তির ধারণায় বাস্তবের কোনো সমর্থন নেই। তাই যা অনস্বীকার্য সত্য, তা হল বহমান সময়। সময়ের আবহে মানুষ অবশ্য পর্ব-পর্বান্তরে শিল্পের আকরণে জীবনকে বিন্যস্ত করতে চেয়েছে। কিন্তু এ বিন্যাসে ধ্রুব স্থিতি অসম্ভব

বলেই ছোটোগল্পের মতো সময়-শীলিত শিল্পরূপ জীবনের অন্তর্বৃত প্রবণতাকে ধরিয়ে দেয় বারবার। পাঠকৃতিতে তাই নির্দিষ্ট আরম্ভ বা সমাপ্তি থাকে না। অতি তুচ্ছ জীবিকা থেকে গড়ে উঠতে পারে জীবনের অঙ্গীকার, বাঁচা-মরার প্রান্তদেশে দাঁড়িয়ে মরিয়া মানুষ শনাক্ত করতে পারে আপাত-অপাঙ্‌ক্তেয় জীবনের উদ্বৃত্তকে, আবার রুজিরুচি আর জীবনের নিত্যকার দ্বন্দ্ব সাবেকি পুরাণ ভেঙে বানাতে পারে নতুন পুরাণ। আসলে রামকুমারের গদ্য ছবি লিখতে পারে। ছবি লিখতে পারে বলেই বিন্যাসের সেই মায়াময়তায় সাবেককেলে রূপকথা কথনের অছিলায় তিনি বলে দেন সাম্প্রতিক দীর্ণ জীবন কথাটি। এভাবেই নবতর রূপ পেয়ে যায় বারোটি নারী কেন্দ্রিক গল্প সংকলন 'প্রিয়াঙ্কার ছেলেই'। আর এই গল্প সৃজনে রামকুমার হয়ে উঠেছেন ঐতিহ্যময়তার ধারক ও বাহক।

**সূত্র নির্দেশ :**

১. রামকুমার মুখোপাধ্যায়, 'প্রিয়াঙ্কার ছেলেই' (নারী-কেন্দ্রিক বারোটি গল্প), প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, ২০০৮,অক্ষর পাবলিকেশনস্, ২৯/৩, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা - ১২, সূচনাংশ

২. 'সোমেন চন্দ স্মৃতি পুরস্কারে পঠিত', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২৬ জুলাই ২০০০, উদ্বৃত, দীপঙ্কর মল্লিক ও দেবারতি মল্লিক (সম্পাদনা), 'রামকুমার মুখোপাধ্যায় : কথাযাত্রায় তিন দশক', 'আমার লেখালেখি - ১', প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, ২০১৩, দিয়া পাবলিকেশন, ৪৪-১/এ, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৯, পৃ. - ২৫২

৩. অর্পিতা মুখোপাধ্যায় : 'সময়, জীবন ও মৃত্যুতে বারে বারে ফেরা', বারোমাস, শারদ ২০০০, উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৫৭।

৪. তাপস সাহা, 'রামকুমার দেখা জীবনে প্রত্যন্ত বাংলার গল্প', দীপঙ্কর মল্লিক ও দেবারতি মল্লিক (সম্পাদনা), পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩৪

৫. রামকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, 'পিকনিক', পৃ. ১৮

৬. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, 'জাতিস্মর' পৃ. ৩৩

৭. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩৫

৮. পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ. ৩৬

৯. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, 'চরৈবেতি', 'পৃ. ৩৭

১০. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৪৬

১১. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, 'সখিনা', 'পৃ. ৫৩

১২. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৫৭

১৩. তদেব

১৪. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, 'শরীরের ভাঙা-গড়া', পৃ. ৬২

১৫. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৬৭-৬৮

১৬. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, 'প্রিয়াঙ্কার ছেলেই', 'পৃ. ৯৯

১৭. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, 'প্রেম কী ঃ একজন গবেষকের ভাবনা', পৃ. ১০৭

১৮. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, 'কুপিত দেবীচণ্ডী', পৃ. ১২০

# বাংলায় সংগীতবিদ্যা ও ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী

**নীলাংশু অধিকারী***

সম্প্রতি সারা পৃথিবী জুড়ে *সংগীতবিদ্যা* শব্দটি নিয়ে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। অনেকের মধ্যে এই বিষয়টি নিয়ে দিনের পর দিন বিশেষ আগ্রহও দেখা যাচ্ছে। মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে এ বিষয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষাও চলছে। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীরা যেমন এ বিষয়টি নিয়ে পড়তে চাইছে, আবার সংগীত জ্ঞানপিপাসু কিছু ব্যক্তিও সঙ্গীতের খুঁটিনাটি রহস্য উন্মোচনের তাগিদে সংগীতবিদ্যার দ্বারস্থ হচ্ছে। শুধুমাত্র ইউরোপীয় দেশগুলি নয়, পাশাপাশি এশিয়া, এমনকি আমাদের এই বাংলাতেও সংগীতবিদ্যার ব্যাপক প্রচলন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাহলে প্রথমে দেখে নেওয়া যাক সংগীতবিদ্যা শব্দটির উদ্ভব রহস্য এবং অর্থ।

বাংলায় যাকে সংগীতবিদ্যা বলা হয়, ইউরোপীয় ভাষায় থাকে *Musicology* বলে— শব্দের ব্যুৎপত্তিগত দিকটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, *Musicology* শব্দটি এসেছে *Music* এবং *Logy*– এই দুটি ইংরেজি শব্দের সমন্বয় সাধনের ফলে। *Music* এর অর্থ সংগীত, আর *Logy* অর্থে বিদ্যা। অতএব, দুটি শব্দের একত্রিকরণ হল সংগীতবিদ্যা। উল্লেখ্য,, *Logy* শব্দটি এসেছে *Latin* শব্দ Logos থেকে, যার মানে হচ্ছে শাস্ত্র,বিদ্যা, বিজ্ঞান ইত্যাদি। এককথায়, Logos শব্দটি সংগীতের যুক্তিসঙ্গত দিকটি তুলে ধরে। সংগীতে তত্ত্ব এবং তথ্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ঠিকই। কিন্তু একথা স্পষ্ট যে সূক্ষ্ম বিচারের আলোকে তত্ত্বের চেয়ে তথ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। তত্ত্ব ক্ষুদ্র অর্থে ব্যবহৃত হয়, আর তথ্য বৃহৎ অর্থে। যাইহোক, তথ্যের মধ্যে তত্ত্বের আনাগোনা নিশ্চিত স্বীকার করতেই হয়। সংগীতবিদ্যা সংগীতে ব্যবহৃত তথ্যের বিজ্ঞানসম্মত এবং যুক্তিগ্রাহ্য রূপটি স্পষ্ট করে তোলে।

প্রকৃতপক্ষে এই *Musicology* শব্দটির উদ্ভব হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি সময়ে। কিন্তু তারও পূর্বে বহুবছর আগে আমাদের দেশে সংগীতবিদ্যার প্রচলন ছিল। তখন এই *সংগীতবিদ্যাকে গান্ধর্ববিদ্যা* বলা হত। মুনি ভরতের নাট্যশাস্ত্রে ও অন্যান্য গ্রন্থে এই গান্ধর্ববিদ্যার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যীশুখ্রীস্ট্রের জন্মের পরবর্তী সময়ে গান্ধর্ববিদ্যার ওপর রচিত যে-কোনো গ্রন্থকেই *গান্ধর্ববেদ* বলে আখ্যা দেওয়া হত। আবার প্রাচীন ভারতবর্ষে এই বেদকে *পঞ্চমবেদ* বলা হত। এ কথা সত্য যে, বেদের দুটি দিক থাকে। একটি বিদ্যা, অপরটি ক্রিয়াকাণ্ড। ঠিক একইভাবে গান্ধর্ববেদেরও দুটি দিক ছিল— একটি সংগীতবিদ্যা, অপরটি সংগীতের ক্রিয়াত্মক দিক। কালক্রমে যখন গুপ্তযুগের পত্তন হয়, তখন *গান্ধর্ববিদ্যা* শব্দটির পরিবর্তে *নাদবিদ্যা* শব্দটি প্রচলিত হতে থাকল। ''*ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পৌঁছে আমরা দেখছি সারা ভারতবর্ষ যখন নাদবিদ্যা পরিভাষাটি নিয়ে সন্তুষ্ট রয়েছে, তখন আমাদের এই বাংলার এক সংগীতবিদ্বান নাদবিদ্যার পরিবর্তে*

*গবেষক, সংগীতবিদ্যা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

*'সঙ্গীতবিদ্যা' পরিভাষাটি প্রচলন করলেন। তাঁর নাম হচ্ছে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী।'*[১]

১৮৬৩ সালে Friedic Chrysander নামে একজন জার্মান সংগীতজ্ঞানী সর্বপ্রথম Musikalische Wissenschaft শব্দটি ব্যবহার করেন। এই শব্দটির মানে হল Musical Science অর্থাৎ সাংগীতিক বিজ্ঞান। পরবর্তীকালে এই শব্দটি ফ্রান্সে Musicologie এবং ইংলন্ডে Musicology নামে ব্যবহৃত হয়। Musicology সংগীত সংক্রান্ত যেকোনো বিষয় যথা সাংগীতিক ধ্বনি বিজ্ঞান, সংগীতের ইতিহাস, সঙ্গীতের তত্ত্বগতদিক, সংগীতের সাহিত্যাংশ, সংগীতে দর্শনবিদ্যা, সংগীতে সৌন্দর্যবিদ্যা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে। এক কথায়, সংগীতের উপরোক্ত বিষয়গুলির উপর গবেষণামূলক পড়াশুনাই হল সংগীতবিদ্যা। সংগীতবিদ্যার একমাত্র উদ্দেশ্য হল সংগীতের নানাদিকের উপাদানগুলির বিজ্ঞানভিত্তিক, যুক্তিসঙ্গত এবং তথ্যসমৃদ্ধ ব্যাখ্যা প্রদান করা এবং সেইসঙ্গে সংগীতের যাথার্থ্য বিশ্লেষণ করা।

এখন ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব আধুনিক সংগীতবিদ্যার আলোকে কতখানি প্রাসঙ্গিক তা বিবেচনাধীন। আধুনিক সংগীতবিদ্যার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তাঁর কর্মকাণ্ডের বৈচিত্র্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলে অনেক সংগীতকোবিদ্ মনে করলেও কোনো কোনো পণ্ডিতের অভিমত সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁদের ধারণায় বর্তমান সংগীত গবেষকদের কাছে ক্ষেত্রমোহনের অনেক সাংগীতিক সিদ্ধান্ত তেমন গ্রহণযোগ্য নয়। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর যুগ থেকে ক্রমবিবর্তনের পথ ধরে আজ পর্যন্ত সংগীতের চেহারার নানারকম পরিবর্তন ঘটেছে। যুগান্তরে সব বিষয়েরই একটি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এ ঘটনা নতুন কিছু নয়। কিন্তু কিছু কিছু বিষয়ের ক্ষেত্রে তার মূল তত্ত্ব প্রায়শই অপরিবর্তিত থেকে যায়। সেক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক কিছু পরিবর্তন ঘটানো হয় মাত্র। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর কর্মকাণ্ডের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও এরকম দৃষ্টান্ত প্রণিধানযোগ্য। তাঁর সংগীত সৃষ্টি রহস্যের মূল তত্ত্ব সংগীতবিদ্যার আলোচনায় আজকের দিনেও অনেকটাই ঐতিহ্যবাহী। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর সংগীত-বিষয়ক কর্মকাণ্ড অনেকাটাই বিজ্ঞানসম্মত, গবেষণাধর্মী এবং সংগীতবিদ্যার আয়ত্ত্বাধীন। সুতরাং সংগীতবিদ্যা এবং গোস্বামী মহাশয়ের কর্মকাণ্ডের মধ্যে একটি সুসম্পর্ক বজায় থাকাটা স্বাভাবতই স্বাভাবিক ব্যাপার। তা সত্ত্বেও এ কথা মনে রাখা দরকার যে, তাঁর কাজের মধ্যে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে কিনা, যা সংগীতবিদ্যার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনে দূরত্ব বজায় রাখতে পারে। আর সেইসঙ্গে তাঁর সাংগীতিক তাৎপর্যের যাথার্থ্য বিচার করাটাও যুক্তিসঙ্গত।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় সংগীতবিদ্যা প্রসারে তাঁর প্রচেষ্টা এবং কর্মোদ্যম সর্বজন প্রশংসনীয়। তৎকালীন সময়ে শ্রী গোস্বামী মহাশয় ব্যতীত অন্য কাউকেই সংগীতবিদ্যাচর্চা করতে দেখা যায়নি। তবে পরবর্তীকালে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে এবং অন্যান্য সংগীতশাস্ত্রীদের মধ্যে পরোক্ষভাবে সংগীতবিদ্যার চর্চা করতে দেখা গেছে। সুতরাং, সংগীতবিদ্যায় গোস্বামী মহাশয়ের প্রথম হস্তক্ষেপ সংগীতের উৎকর্ষ সাধনে যেমন খ্যাতি এনেছে, তেমনি গবেষক মহলে তাঁর কর্মকাণ্ডের বিস্তৃত বিশ্লেষণ ও জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে প্রবল উৎসাহও দেখা দিয়েছে। যাইহোক্, গোস্বামী মহাশয়ের কর্মকাণ্ডের প্রাসঙ্গিকতা সংগীতবিদ্যার আলোকে কখনোই অপ্রাসঙ্গিক হবার নয়।

তাঁর সংগীততত্ত্ব-বিষয়ক আলোচনাগুলি আধুনিক সংগীতবিদ্যার নিরিখে কতটা প্রাসঙ্গিক তা বিশ্লেষণ করা একান্ত জরুরী। তিনি তাঁর রচিত সংগীতগ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু সাংগীতিক পরিভাষার উদাহরণস্বরূপ সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করেছেন। এই পরিভাষা সংক্রান্ত আলোচনা তাঁর *কণ্ঠকৌমুদী*তেও বিক্ষিপ্তভাবে রয়েছে। তিনি সেখানে উদাহরণস্বরূপ পরিভাষাগুলির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করেছেন। এই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ তিনি তাঁর নিজস্ব যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। বিশেষ করে 'সংগীতসার গ্রন্থে সংগীতের বিপুল তত্ত্ব তিনি তুলে ধরেছেন। এই সংগীত গ্রন্থটি তাঁর জীবনের এক মহামূল্যবান সৃষ্টি বলা যায়। যাইহোক্, *সংগীত* এবং *সংগীতশাস্ত্র* সম্পর্কে তাঁর ধারণা কণ্ঠকৌমুদীতে কিভাবে উল্লেখ রয়েছে তা দেখে নেওয়া যাক। তিনি সেখানে সংগীতের সংজ্ঞা এইভাবে দিয়েছেন— ''গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই তিনটি একত্র হইলে তাহাকে সঙ্গীত বা তৌর্য্যত্রিক বলা হয়।''[২] এ কথা আমরা সবাই জানি। প্রাচীনকাল থেকে সংগীতের সংজ্ঞা এইভাবে শোনা যায়। কিন্তু আধুনিক গবেষণায় সংগীত-এর সংজ্ঞা একটু ভিন্ন প্রকৃতির। এখানে গীত ও বাদ্যকে 'সংগীত' বলে স্বীকার করা হয়। এর পশ্চাতে যুক্তি রয়েছে। প্রাচীনকালে গীত, বাদ্য ও নৃত্যকে একত্রে সংগীত' বলা হত। কারণ, তখন নাটকের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে গীত, বাদ্য, নৃত্যকে সংগীত বলে আখ্যা দেওয়ার রীতি ছিল। গোস্বামী মহাশয়ের সংজ্ঞা-র সঙ্গে আধুনিককালের ধারণার অমিল খুঁজে পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে আধুনিক সংগীত-গবেষক ড. প্রদীপকুমার ঘোষের বক্তব্যটি তুলে ধরলে ঘটনাটি বিশ্বাসযোগ্য হবে বলে মনে হয়। তাঁর মতে— ''প্রাচীনকালে গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই তিনটিকে সঙ্গীত বলা হোত। কারণ তখন নাটকের অপরিহার্য অঙ্গ ছিল গীত, নৃত্য ও বাদ্য সমন্বিত সঙ্গীত। পরবর্তীকালে অবশ্য গীত ও বাদ্যকেই সঙ্গীত বলার রীতি প্রচলিত হয়।''[৩] তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, সংগীতে গীত এবং বাদ্যের প্রাধান্যই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আর, নৃত্যের স্থান থাকার অর্থ হল নাটকীয় প্রভাব। যাই হোক্, সংগীতশাস্ত্র বিষয়ে কি কি যুক্তি রয়েছে তা একবার দেখে নেওয়া যাক। গোস্বামী মহাশয় বলেছেন— ''যে শাস্ত্রদ্বারা সঙ্গীতের বিষয় বিশিষ্ট রূপে অবগত হওয়া যায়, তাহাকে সঙ্গীতশাস্ত্র কহে।''[৪] তিনি শুধু সংগীতের সংজ্ঞা দেননি, সেইসঙ্গে সংগীতের শাস্ত্র সম্পর্কেও সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন। এই সংগীত-শাস্ত্রের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে তিনি স্পষ্টতঃ বলেছেন যে, *সঙ্গীত-শাস্ত্র ঔপপত্তিক ও ক্রিয়াসিদ্ধ এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত।*'[৫] অর্থাৎ শাস্ত্র সংগীতের উভয় দিক নিয়ে আলোচনা করে। আবার শাস্ত্র বলতে শুধু থিওরি বোঝায় না, সেখানে আনুষঙ্গিক আরও অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা এসে পড়ে। বিষয়ে স্বামীপ্রজ্ঞানানন্দের উক্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন— ''*সঙ্গীতের শাস্ত্র বলতে শুধুই 'থিওরী' তথা বাঁধাধরা ব্যাকরণ নয়, সাঙ্গীতিক শাস্ত্রের পরিপূর্ণরূপ গড়ে ওঠে সঙ্গীতের ক্রমবিকাশের ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, দর্শন এই সকল কিছুকে গ্রহণ ক'রে।*''[৬] অতএব উপরোক্ত আলোচনা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর মতানুযায়ী সংগীতশাস্ত্র শুধুমাত্র ঔপপত্তিক বিষয়কে না বুঝিয়ে ক্রিয়াত্মক বিষয়কেও বোঝায়। উভয় বিষয় নিয়ে সংগীতশাস্ত্রের পরিকাঠামো গড়ে ওঠে। কিন্তু, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর সঙ্গে

এ বিষয়ে আধুনিক সংগীত-গবেষক তথা সংগীততত্ত্ববিদ্ প্রজ্ঞানানন্দজীর দৃষ্টিভঙ্গির অমিল লক্ষ্য করা যায়। এঁরা দু'জন সংগীতশাস্ত্র সম্পর্কে ভিন্ন অভিমত পোষণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, সংগীতবিদ্যা, সংগীতশাস্ত্র, সংগীতবিজ্ঞান শব্দগুলি সম্পূর্ণ সমার্থক। এই নিবন্ধ আলোচনার শুরুতেই *Musicology* শব্দটির অর্থ প্রদান করা হয়েছে। সেদিক থেকে বিচার করলে, সংগীতশাস্ত্রে ক্রিয়াত্মক দিকের প্রাধান্য সম্পূর্ণ গৌণ। শুধুমাত্র শাস্ত্ররচনার তাগিদে যতটুকু ব্যবহারিক সংগীত সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন ততটুকুই যথেষ্ট।

'নাদ' পরিভাষাটি নিয়ে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী তাঁর *কণ্ঠকৌমুদী*তে যেভাবে আলোচনা করেছেন তা খুবই অল্প পরিসরে সীমাবদ্ধ হয়েছে। তিনি নাদের ব্যাকরণগত উৎপত্তির কথা বলেছেন। সেইসঙ্গে নাদের প্রকারভেদের কথাও বলেছেন। তাঁর মতানুযায়ী— ''ব্যায়াকরণেরা ধ্বন্যার্থবোধক নদ ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে ঘণ্ প্রত্যয়দ্বারা নাদ শব্দ নিষ্পন্ন করিয়াছেন, সুতরাং নাদ শব্দে ধ্বনি সামান্যকেই বুঝায়।"[৭] তিনি নাদের বিভাজন ও তাদের সংজ্ঞা এইভাবে দিয়েছেন— ''গীত, বাদ্য ও নৃত্য প্রভৃতি সংসারের ব্যবহারোপযোগী যাবতীয় কার্য্যই প্রায় নাদের অধীন, কিন্তু সেই নাদ দ্বিবিধ, যথা- আহত ও অনাহত, মনুষ্যের কণ্ঠতাল্বাদির অভিঘাতে যে নাদ উৎপন্ন হয় তাহাকে আহত বা ব্যক্ত নাদ এবং তদ্ভিন্ন বস্তুমাত্রেই অভিঘাতে যে নাদের উৎপত্তি তাহাকে অনাহত বা অব্যক্ত নাদ কহে।"[৮] তাঁর আলোচনায় দেখা যায় সংগীতজ্ঞরা আবার দুটি নাদকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। দু'ভাগ বলতে মধুরধ্বনি এবং কঠোরধ্বনি। এই উভয়ধ্বনির সংজ্ঞা তিনি তাঁর উক্ত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন— ''কোন নিয়মিত কালের মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট ক্রমানুগত অনুরণন দ্বারা যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, অথবা যে ধ্বনি মনুষ্যকণ্ঠে অনুকরণযোগ্য অথচ স্নিগ্ধ ও রঞ্জন গুণবিশিষ্ট তাহাকেই সঙ্গীতধ্বনি বা স্বর কহে এবং যে সকল ধ্বনির উৎপাদক অনুরণন সমূহ অনিয়মিত সুতরাং তজ্জন্য যাহাদের ক্রমও নির্দ্দিষ্ট হয় না তৎসমুদায়ই কঠোরধ্বনি মাত্র বলিয়া পরিগণিত।"[৯] কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী 'নাদ' সম্পর্কে যে তথ্য দিয়েছেন তা বিস্তৃত নয়, খুবই সীমিতভাবে তিনি নাদ সম্পর্কে গতানুগতিক তথ্য দিয়েছেন। মূল সূত্র একই হলেও আধুনিক গবেষণায় তাঁর 'নাদ' সম্পর্কিত ধারণা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আধুনিক সংগীত-গবেষক তথা সংগীত-ব্যাখ্যাকার ড. প্রদীপকুমার ঘোষ তাঁর *সংগীতশাস্ত্র সমীক্ষা* (প্রথম পর্ব) এবং *শাস্ত্রীয় সঙ্গীত পরিচয়* (প্রথম পর্ব) গ্রন্থ দুটিতে নাদ সম্পর্কে যেভাবে উদাহরণসহ বিস্তৃত আলোচনা করেছেন তা অন্য আর কোনোও গ্রন্থে এত বিস্তৃতভাবে এবং বোঝবার উপযোগী করে আলোচনা করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়। নাদের ব্যাকরণগত বুৎপত্তি ড. ঘোষ এভাবে দিয়েছেন— *সঙ্গীতের উপযোগী যে-কোন ধ্বনিকেই 'নাদ' বলে। 'নাদ' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে- 'নদ্' ধাতু* + 'ঘঞ্' প্রত্যয়যোগে। প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রের গ্রন্থে লেখা আছে— 'ন'-এর অর্থ প্রাণ এবং 'দ'-এর অর্থ অগ্নি। প্রাণ এবং অগ্নির সংযোগে 'নাদ' উৎপন্ন হয়।"[১০] ড. ঘোষ নাদের বিভিন্ন রকম বিভাজনের কথা বলেছেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে নাদ দুই প্রকার— আহত নাদ ও অনাহত নাদ। প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রে নাদের আরো দুটি ভাগ আছে— প্রকৃতিগতভাবে এবং উৎপত্তিগতভাবে। প্রকৃতিগতভাবে নাদ পাঁচ প্রকার। এই পাঁচ প্রকার

নাদ কোথা থেকে উৎপন্ন হয়েছে তা তিনি আলোচনা করেছেন। তিনি পাঁচ প্রকার আহত নাদের কথা বলেছেন। এছাড়াও তিনি নাদের তিন প্রকার স্বাভাবিক *স্থান*-এর উল্লেখের পাশাপাশি নাদের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখও করেছেন। তাহলে বোঝা যাচ্ছে ক্রমবিবর্তনের পথ ধরে 'নাদ'-এর আলোচনা আধুনিক মতাবলম্বীদের কাছে আরো গভীরভাবে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সংগীতের তত্ত্ববিষয়ক আলোচনা ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী তাঁর অন্যান্য রচিত গ্রন্থের মধ্যে যত্রতত্র অল্পবিস্তর তুলে ধরলেও *সঙ্গীতসার* গ্রন্থে সে বিষয়ে অনেকটাই বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তিনি বেশিরভাগ সাংগীতিক পরিভাষার অন্য নামকরণ করেছেন। এগুলি তাঁর সৃষ্টিকর্মের এক একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এখান থেকে তাঁর পাণ্ডিত্যের গভীরতা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভ করা যায়। তাঁর সাহিত্যবোধও ভীষণ সমৃদ্ধশালী ছিল। তা না হলে সংগীতের এই পরিভাষার শ্রুতিসুখকর নামকরণ সম্ভবপর হত না। তিনি 'স্কেল'কে 'সোপান' বলে উল্লেখ করেছেন। 'আরোহন' ও 'অবরোহন'কে তিনি যথাক্রমে 'অনুলোম' ও 'বিলোম' নামে চিহ্নিত করেছেন। আবার তানপুরা জাতীয় বাদ্যযন্ত্রকে 'তাম্বুরা' বলেছেন এবং গীত-বাদ্য-নৃত্য সমন্বিত সংগীতকে 'তৌর্য্যত্রিক' আখ্যায় ভূষিত করেছেন। এ রকম বিভিন্ন পরিভাষার ভিন্ন ভিন্ন নাম তাঁর সংগীত-গ্রন্থগুলির মধ্যে যত্রতত্র ব্যবহৃত হয়েছে।

একটি বিস্ময়কর ঘটনা হল তিনি তাঁর রচিত সংগীতগ্রন্থের মধ্যে কোথাও নৃত্য ও বাদ্যের আলোচনা বিস্তৃতভাবে করেননি। শুধমাত্র *সঙ্গীতসার* ব্যতীত তাঁর অন্য কোনো গ্রন্থে নৃত্যের উল্লেখ নাই। তবে যেটুকু রয়েছে তা খুবই সামান্য। *সঙ্গীতসার*-এর প্রথমভাগ অর্থাৎ ঔপপত্তিক তৌর্য্যত্রিক পর্বের চতুর্থ পরিচ্ছেদে নৃত্যকাণ্ড বিষয়ে সামান্য আলোকপাত করেছেন মাত্র। আর দ্বিতীয় ভাগ অর্থাৎ ক্রিয়াসিদ্ধ তৌর্য্যত্রিক পর্বে নৃত্যসাধন সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি সংক্ষেপে নৃত্যের সংজ্ঞার পাশাপাশি নৃত্যের দুই প্রকার তাণ্ডব ও লাস্যের কথা বলেছেন। আবার তাণ্ডব ও লাস্যের দু'টি করে ভাগের কথাও বলেছেন। নৃত্যে নর্তক বা নর্তকীর রূপের প্রয়োজন। নৃত্য বাদ্যেরই অনুগত। নৃত্যে বিভিন্ন লয়ের প্রদর্শন, নৃত্যে বীর করুণাদি রসব্যঞ্জকে হাব, ভাব, কটাক্ষ, কটি, উরু ইত্যাদির সঞ্চালন— এই বিষয়গুলি নিয়ে তিনি একটি সাধারণ ধারণা প্রতিপন্ন করেছেন বলা যায়। তাঁর সময়ের বহু পূর্বে নৃত্যের অতিশয় আদর ছিল ধার্ম্মিক এবং যুদ্ধোৎসহ ব্যক্তিদের মধ্যে। কিন্তু আধুনিককালের নৃত্যপ্রণালীর ব্যাপারে তিনি বিরুদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন। আধুনিক যুগের জঘন্য-অশ্লীল নৃত্যের দ্বারা ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র লোকেদের তৃপ্তি মেটানো হয় মাত্র। তাঁর মতে— ''বর্ত্তমান সামাজিক কুৎসিৎ নৃত্যপ্রণালীর পোষকতা করিলে আমাদের নৃত্যবিদ্যার কখনই উন্নতি হইবে না, ইহার সারাংশ গ্রহণ করিয়া কতক কতক পরিবর্ত্তন করিতে পরিলে বোধ করি কালক্রমে ইহা বিশেষ শ্রীধারণ করিবে।''[১১]

গীত এবং বাদ্য যেমন শ্রবণযোগ্য, তেমনি দর্শনযোগ্যও বটে। কিন্তু নৃত্য শ্রবণযোগ্য নয়, শুধুমাত্র দর্শনের উপযোগী। সেই কারণে বোধহয় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী নৃত্য বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং বিস্তৃত আলোচনা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেননি। তাছাড়া, ভারতবর্ষে প্রচলিত

নৃত্য ধারা প্রসঙ্গেও তাঁর ঔদাসীন্য লক্ষণীয় এবং সেইসঙ্গে নৃত্যাভিনয়ের প্রকাশ-রীতি সম্পর্কেও বিস্তৃত আলোচনা থেকে তিনি বিরত থেকেছেন। বাদ্য বিষয়ে সামান্য আলোকপাত করলেও সে তুলনায় নৃত্য বিষয়ে আলোচনা অতি সামান্য। বস্তুত, সংগীতের স্বরলিপি দেখে প্রথম শিক্ষার্থী যন্ত্র অপেক্ষা কণ্ঠসংগীতে সহজে সুরজ্ঞান আয়ত্ত করতে পারেন না। প্রথমে যন্ত্রের পর্দ্দা অনুসরণ করে সংগীতের সুরকে বশে আনতে হয়। যন্ত্রে সুরের সাধন ঠিকমত হলে তারপর অনুভব শক্তির দ্বারা কণ্ঠে সঠিক সুরের বিচরণ হয়। কিন্তু ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী বলেছেন— ''নৃত্যপ্রণালী ইহা অপেক্ষা সহজ। তালাদির নিয়ম একটু শিক্ষা করিয়া উপদেশ সহকারে সেই তালে তালে পাদ বিক্ষেপ করিলেই নৃত্য সম্পন্ন হইবে, কিন্তু তাহার সহিত অন্যান্য আঙ্গিক ক্রিয়াদি কতকগুলি শিক্ষকের নিকট যথার্থরূপে উপদিষ্ট হইতে হয়।''[১২] তিনি নৃত্যপদ্ধতিকে গীত অপেক্ষা সহজ বলেছেন। গীতকে তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। নৃত্য বিষয়ে সামান্য আলোচনার এটি একটি কারণ হতে পারে। যাই হোক্, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী নৃত্য সম্বন্ধে যৎসামান্য তথ্য তাঁর গ্রন্থে তবুও মোটামুটি উল্লেখ করে গেছেন। কিন্তু, তাঁর কোনো শিষ্য-প্রশিষ্যের সৃষ্টিকর্মে নৃত্য বিষয়ে কোনো আলোচনাই চোখে পড়ে না। এ বিষয়ে তাঁরা কেউই কোনো চিন্তা-ভাবনা করেননি। যদি তা হত তাহলে তাঁদের রচনার মধ্যে নৃত্যের আলোচনা অবশ্যই স্থান পেত। তাছাড়া, নৃত্যের আলোচনা স্বয়ং ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী যদি বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করতেন এবং তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যের মধ্যে কারো রচনায় যদি নৃত্যের আলোচনা সম্ভবপর হত, তাহলে এক নতুন বিষয়ের বুদ্ধিদীপ্ত তথ্য সংগীতের গবেষকদের কাছে গবেষণার পথ প্রশস্ত করতে সক্ষম হত।

তাঁর 'সঙ্গীতসার' গ্রন্থের মধ্যে নৃত্য ও বাদ্য বিষয়ক যেটুকু আলোচনা রয়েছে তা খুবই অল্পবিস্তর বলা যায়। তিনি এই গ্রন্থের ঔপপত্তিক তৌর্য্যত্রিক পর্বের তৃতীয় পরিচ্ছেদে বাদ্যকাণ্ড বিষয়ে মোটামুটি ধারণা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন— ''ধ্বন্যাত্মক নাদ হইতে বাদ্যর উৎপত্তি। যাহা হইতে সেই বাদ্য উৎপন্ন হয়, তাহাকে বাদ্যযন্ত্র বলে।''[১৪] তিনি বাদ্যের উৎপত্তি এবং বাদ্যযন্ত্রের সংজ্ঞার পাশাপশি বাদ্যযন্ত্রের শ্রেণী বিভাজনও দেখিয়েছেন। আবার তালের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে তাল-ছন্দের সম্পর্ক নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করেছেন। তিনি বিভিন্ন তাল যথা পটতাল, মধ্যমান, কাওয়ালী, ঠুংরী, কাহারবা, সুর্‌ফাক্তা, চৌতাল, একতাল, দাদরা, ধামার, তেওড়া, রূপক, আড়াচৌতাল, যৎ, বীরপঞ্চ, ঝাঁপতাল, খেম্‌টা, তেওট, সওয়ারি, রুদ্র, ব্রহ্মযোগ, লক্ষ্মী ইত্যাদির ঠেকার উল্লেখ করেছেন এবং কিছু কিছু তালের যৎসামান্য পরিচয়ও দিয়েছেন। তিনি তাল প্রকরণের পাশাপাশি যন্ত্র প্রকরণেরও উল্লেখ করেছেন। সেখানে তিনি ঐকতান যন্ত্রের বিষয় তুলে ধরেছেন। এছাড়া সভ্যযন্ত্র, মাঙ্গল্যযন্ত্র, রণযন্ত্র, ঘোষযন্ত্র, গ্রাম্যযন্ত্র, সওয়ারী যন্ত্র, বাদ্যের দোষ-গুণ ইত্যাদি বিষয়ের উপর কিছুটা আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনায় বাদ্যের গঠন-প্রণালী সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নাই। বাদনবৈশিষ্টও একেবারে যৎসামান্য, দু-একটিতে লক্ষ্য করা যায়। আর বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে সামান্য কয়েকটির প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে মাত্র। কিন্তু তাঁর শিষ্য স্যার রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সংগীতের বাদ্যাংশ নিয়ে অনেক

গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। তাঁর সমস্ত গ্রন্থগুলি গবেষণামূলক এবং বিজ্ঞানসম্মত। তার 'যন্ত্রকোষ', 'যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা', 'মৃদঙ্গমঞ্জরী' ইত্যাদি গ্রন্থগুলি হল সংগীতের বাদ্য আলোচনার এক উৎকৃষ্ট প্রমাণ। এই গ্রন্থগুলি তাঁর অসাধারণ সৃষ্টি। এই গ্রন্থগুলি হল সংগীতের বাদ্য আলোচনার এক উৎকৃষ্ট প্রমাণ। এই গ্রন্থগুলি রচনার পশ্চাতে গুরু ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর অনুপ্রেরণা বা অবদান যে নিশ্চিত ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ কখনোই থাকতে পারে না। অতএব এই ঘটনা থেকে এ কথা অনুমিত হয় যে, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী নিশ্চয়ই মৃদঙ্গ বাজাতে জানতেন বা মৃদঙ্গ চর্চার সান্নিধ্যে প্রায়শই থাকতেন, তা না হলে সৌরীন্দ্রমোহন কৃত 'মৃদঙ্গমঞ্জরী' গ্রন্থটি সৃষ্টি হত না। সুতরাং, গোস্বামী মহাশয়ের প্রভাব শৌরীন্দ্রমোহনকে যে উৎসাহিত করেছিল এ কথা নিশ্চিত। তাছাড়া, গোস্বামী মহাশয় বীণা বাজাতে জানতেন বলে শৌরীন্দ্রমোহনের গ্রন্থে বীণার আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। বলাবাহুল্য, বীণাকার লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্রের কাছে সংগীত শিক্ষার সুবাদে বীণা বাজানো বা সে সম্পর্কে ধারণা থাকাটা গোস্বামী মহাশয়ের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। তাছাড়া, অখণ্ড মেদিনীপুরের রাঢ় অঞ্চলের সংগীত-ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় যে, সেখানে সংগীত চর্চার অপরিহার্য বাদ্যযন্ত্র ছিল পাখোয়াজ ও বীণা। কারণ, তৎকালে ঐ এলাকায় ধ্রুপদ গানের চর্চা হত। আর এই ধ্রুপদ গানে সহযোগী বাদ্যযন্ত্র পাখোয়াজ প্রচলিত ছিল। সুতরাং, রাঢ় অঞ্চলে পাখোয়াজের ব্যবহার তৎকালে যে ছিল তা আর সন্দেহের অপেক্ষা রাখে না। এছাড়া, তখন বীণাতে গান গাওয়ার প্রচলনও ছিল। সেদিক থেকে বিচার করলে সংগীতের সহযোগী বাদ্যযন্ত্র হিসাবে বীণাকে প্রাধান্য দিতেই হয়। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে, প্রথম বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন চর্যাপদে বীণা ও মৃদঙ্গের উল্লেখ রয়েছে। চর্যাপদে এইভাবে রাঢ় বঙ্গের অনেক তথ্য পাওয়া যায়। তখন বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, পশ্চিম মেদিনীপুরের কিছু অংশ রাঢ় বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রুক্ষ, লাল, কাঁকর মাটির দেশ বলেই রাঢ় এলাকা নামে পরিচিত। বিষ্ণুপুর, নাড়াজোল প্রভৃতি রাজবংশে তখন ধ্রুপদীসংগীত চর্চার ব্যাপক প্রচলন থাকায় সহযোগী বাদ্যযন্ত্র হিসাবে বীণা ও পাখোয়াজের যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। নাড়াজোলের রাজা শ্রীনরেন্দ্রলাল খাঁন 'পরিবাদিনী-শিক্ষা' নামে একটি বাদ্যযন্ত্রের গ্রন্থ লিখেছেন। এই গ্রন্থে সেতার বাজানোর গৎ ও স্বরলিপি মুদ্রিত আছে। তৎকালে সেতারকে সপ্ততন্ত্রী বীণা বলা হত। অতএব বীণার ব্যবহার সেকালে যে হত এ কথা সম্পূর্ণ স্পষ্ট।

আলোচনা প্রসঙ্গে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে। দৃষ্টান্তটি বিস্ময়করও বটে। গবেষণামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে অনুমান করা যায় যে, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী এস্‌রাজ বাজাতে জানতেন। তা হলে 'আশুরঞ্জনী-তত্ত্ব' রচিত হল কি করে? এ প্রশ্ন গবেষকদের ভাবনাপ্রসূত। এস্‌রাজকে তিনি 'আশুরঞ্জনী' আখ্যা দিয়েছেন। এখানেও তাঁর সাহিত্যবোধ ও শব্দচয়নের এক নান্দনিক মনোলোকের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর পাণ্ডিত্য শুধুমাত্র কণ্ঠসংগীতে ছিল না, বাদ্যযন্ত্রেও যে ছিল সেকথা আজ স্বীকার করতে দ্বিধা নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তিনি তাঁর কোনো সংগীতগ্রন্থে বাদ্য সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে কিছুই লিখে যাননি। শুধুমাত্র 'আশুরঞ্জনী তত্ত্ব' এর প্রথম পৃষ্ঠায় একটি এস্‌রাজের চিত্র দেখতে

পাওয়া যায় এবং পরে এই বাদ্যযন্ত্রটির অতি সামান্য পরিচয় ও বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। তবে তাঁর রচিত বিভিন্ন সংগীতগ্রন্থ থেকে বাদ্যযন্ত্র বিষয়ে বিস্তৃত কিছু তথ্য প্রাপ্ত হলে পরবর্তী প্রজন্মের সংগীত-জ্ঞানার্থীগণ অনেক বেশী লাভবান হতে পারতেন বিশেষত গবেষণাকর্মে। সম্ভবত, শিষ্য সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর বিস্তৃতভাবে বাদ্যের আলোচনা করেছিলেন বলে, তিনি এ বিষয়ে তেমন কোনো আগ্রহ প্রকাশ করেননি। যাইহোক, সর্বোপরি এ কথা বলা যায় যে, গীত ও বাদ্যের আলোচনা তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কম বেশি সবাই আলোচনা করলেও নৃত্যের বিষয়ে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর সামান্য আলোচনা ব্যতীত তাঁর কোনো শিষ্য-প্রশিষ্য কখনো কোথাও বিন্দুমাত্র আলোকপাত করেননি। এ বিষয়ে তাঁরা কেউই কোনো চিন্তা-ভাবনা করেননি। যদি তা হত তাহলে তাঁদের রচনাতে নৃত্যের আলোচনা স্থান পেত। তাছাড়া, নৃত্যের আলোচনা সম্ভবপর হলে সংগীতের গবেষণা আরো সম্পূর্ণরূপে সমৃদ্ধশালী হত। এক নতুন বিষয়ের বুদ্ধিদীপ্ত তথ্য গবেষকদের কাছে গবেষণার পথ প্রশস্ত করতে সক্ষম হত।

আমরা জানি ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন তাঁরই শিষ্য শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। সংগীতকে লিপিবদ্ধ করে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে তাঁর এই প্রয়াস খুবই প্রশংসনীয়। তা কখনো অস্বীকার করা যায় না। বিশিষ্ট সংগীততত্ত্ববিদ্ দেবব্রত দত্তের কথায়— ''শিক্ষাব্রতী ক্ষেত্রমোহন ভবিষ্যৎ শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে ও গানের বন্দেশকে লিপিবদ্ধ করার কল্পে দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপির উদ্ভাবন করেন।''[১৪] এই স্বরলিপির প্রভাব পরবর্তীকালে অনেকের সংগীতগ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়। স্বামী বিবেকানন্দ সামান্য সংস্কার করে তাঁর 'সঙ্গীতকল্পতরু' গ্রন্থে এই স্বরলিপির কিছু দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। এছাড়া সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সঙ্গীত-জ্ঞান-প্রবেশ' ও 'সঙ্গীতমুকুর' ইত্যাদি সংগীতগ্রন্থেও এই দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপির ব্যবহার করেছেন। আবার রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'সংগীতমঞ্জরী' এবং গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'সঙ্গীতচন্দ্রিকা' গ্রন্থ দুটিও দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি অনুযায়ী রচিত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বর্তমানে এই স্বরলিপি পদ্ধতির প্রয়োগ আর দেখাই যায় না। প্রায় অচল বললেই চলে। আজকাল শুধুমাত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবর্তিত আকারমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতির অধিক প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। আর শাস্ত্রীয়-সংগীতের ক্ষেত্রে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে প্রবর্তিত হিন্দুস্থানী স্বরলিপি পদ্ধতির প্রয়োগও আজকাল খুব একটা কম নয়। যাই হোক্, দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতির মাধ্যমে লিপিবদ্ধ থাকা যে সব গানের হদিশ আজকে আমরা পেয়েছি সেগুলি সংগীতবিদ্যা চর্চার ক্ষেত্রে অত্যন্ত উপযোগী।

বলাবহুল্য, 'গীতগোবিন্দের স্বরলিপি' (১৮৭১ খ্রি.) গ্রন্থটি ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর একটি অনবদ্য সৃষ্টি। বৈষ্ণব কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'কে কেন্দ্র করে গোস্বামী মহাশয় তাঁর এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন। 'গীতগোবিন্দ' আসলে পদাবলী। এখানে রাগ এবং তালের উল্লেখ আছে। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী এই পদাবলীর স্বরলিপি নির্মাণ করেন ১৮৭১ খ্রি.। অমল দাশশর্মার কথায়— ''উক্ত গ্রন্থে গীতগোবিন্দের ২৫টি প্রবন্ধের স্বরলিপি আছে।''[১৫] প্রবন্ধ শব্দটি বলা হচ্ছে এই কারণে যে প্রবন্ধগীতির রীতিতেই 'গীতগোবিন্দ' রচিত

হয়েছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, গীতগোবিন্দের সুর কেমন ছিল তা গোস্বামী মহাশয় লিপিবদ্ধ করে গেছেন। বর্তমানে সংগীত গবেষকরা গোস্বামী মহাশয়ের এই অবদানের ফলে যে বিশেষ উপকৃত হতে সক্ষম হয়েছেন তা সহজেই অনুমেয়।

১৮৫৮ খ্রি. 'রত্নাবলী' নাটকে প্রয়োগ করার জন্য ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম দেশী বাদ্যযন্ত্র ও ইউরোপীয় বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী 'একতান বাদন' সৃষ্টি করেন। ১৮৬৮ খ্রি. এই নাটকের গানগুলি 'ঐকতানিক স্বরলিপি' গ্রন্থ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তীকালে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর এই সৃষ্টিকর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁরই শিষ্য দক্ষিণাচরণ সেন বিভিন্ন পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্রে সমাবেশে 'ব্লু রিবন অর্কেস্ট্রা' গঠন করেন যা সেসময় স্টার থিয়েটারের অন্যতম আকর্ষণের বিষয় ছিল। শুধু তাই নয়, দক্ষিণাচরণ সেন গুরুর 'ঐকতানিক স্বরলিপি'র অনুকরণে দুটি খণ্ডে বিভক্ত 'ঐকতানিক স্বর-সংগ্রহ' রচনা করেন। কিন্তু দক্ষিণাচরণ সেন মহাশয় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর স্বরলিপি পদ্ধতির সঙ্গে অতিরিক্ত কিছু চিহ্ন যুক্ত করেছেন। যাই হোক, বর্তমানে বাংলায় আধুনিক বৃন্দাবনের প্রচলন কিন্তু গোস্বামী মহাশয়ের ঐকতান বাদনের পরিণাম বলা যায়। তাহলে বোঝা যাচ্ছে তিনিই প্রথম ভারতবর্ষে বৃন্দাবনের সূত্রপাত করেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের এই বাংলা রাঢ়বাংলা বা রাঢ়বঙ্গ নামে অভিহিত ছিল। ''রাঢ়বঙ্গে বিজ্ঞানভিত্তিক ক্রিয়াত্মক সংগীতশিক্ষার জন্য ক্ষেত্রমোহন তাঁর শিষ্য পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবারের সৌরিন্দ্রমোহনের আনুকূল্যে ১৮৭১ খ্রি. 'বঙ্গ সংগীত বিদ্যালয়' এবং ১৮৮১খ্রি. 'বেঙ্গল একাডেমি অব মিউজিক' সংগীত বিদ্যালয় দুটি স্থাপন করেন।''[১৬] এই দুটি সংগীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে অনেক শিষ্য-প্রশিষ্য যেমন তৈরি হয়েছে, তেমনি এই বাংলায় কণ্ঠসংগীত তথা যন্ত্রসংগীতের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে তাঁদের দ্বারাই। সুতরাং, এই দুটি সংগীত বিদ্যালয়ের গুরুত্ব অপরিসীম।

পরিশেষে বলা যায় যে, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর কিছু কর্মকাণ্ড আজকের দিনে অপ্রচলিত হলেও, তাঁর কর্মকাণ্ডের সূত্র ধরেই অনেক সংগীতশাস্ত্রী তথা গবেষক বর্তমানে গবেষণার পথ সুগম করতে সক্ষম হয়েছেন। কেননা, অতীতকে না জানলে বর্তমানে কোনো একটি বিষয়কে কিভাবে বিশ্লেষণ করা যায় তা অস্পষ্ট থেকেই যায়। অতীতে এই সংরক্ষণের কাজটি ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীই করে গেছেন যা আজকের দিনে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

**তথ্যসূত্র ঃ**

১. ড. গৌতম নাগ (সম্পা.), সংগীতবিদ্যা বিভাগীয় পত্রিকা, প্রথম সংখ্যা ঃ (কলকাতা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১)
২. ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, কণ্ঠকৌমুদী ঃ (কলিকাতা, বঙ্গ সঙ্গীত বিদ্যালয়, ১৮৭৫), ১
৩. ড. প্রদীপকুমার ঘোষ, শাস্ত্রীয় সংগীত পরিচয়, প্রথম পর্ব ঃ (কলকাতা, সুরধ্বনি, ১৯৮৫), ১
৪. ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, কণ্ঠকৌমুদীঃ (কলিকাতা, বঙ্গ সংগীত বিদ্যালয়, ১৮৭৫),১
৫. তদেব, পৃ. ১
৬. উমা দে, সঙ্গীত পরিচয়, ভূমিকা ঃ (কলকাতা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯)

৭. ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, কণ্ঠকৌমুদী গ্রন্থ (কলকাতা, বঙ্গ সঙ্গীত বিদ্যালয়, ১৮৭৫), ২
৮. তদেব, ঐ
৯. তদেব, ঐ
১০. ড. প্রদীপকুমার ঘোষ, শাস্ত্রীয় সংগীত পরিচয়, প্রথম পর্ব গ্রন্থ (কলকাতা, সুরধ্বনি, ১৯৮৫), পৃ. ৫
১১. ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, সঙ্গীতসার গ্রন্থ (কলকাতা, আই.সি.বোস অ্যান্ড কোং, ১৮৬৯), পৃ. ৬৪
১২. তদেব, পৃ. ৮৮
১৩. ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, সঙ্গীতসার গ্রন্থ (কলিকাতা, বঙ্গ সঙ্গীত বিদ্যালয়, ১৮৭৯), পৃ.৪২
১৪. দেবব্রত দত্ত, সঙ্গীত তত্ত্ব, প্রথম খণ্ড গ্রন্থ (কলিকাতা, ব্রতী প্রকাশনী, ২০১১), পৃ. ২৪৫
১৫. অমল দাশশর্মা, সঙ্গীত মনীষা, প্রথম খণ্ড গ্রন্থ (কলকাতা, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৮১), পৃ. ৫৮
১৬. সৌমিত্র লাহিড়ী (সম্পা.) ও কঙ্কনা ভট্টাচার্য (সম্পা.), বাংলা সংগীত মেলা স্মারক গ্রন্থ গ্রন্থ (কলকাতা, বাংলা সংগীত মেলা স্মারক গ্রন্থ উপসমিতি, ১৯৯৮), পৃ. ৪৩

**সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি**

১. খাঁন মোবারক হোসেন (সম্পা.), সংগীতসাধক অভিধান, ঢাকা, বালা একাডেমী ২০০৩
২. খাঁন, রাজা শ্রীনরেন্দ্রলাল, পরিবাদিনী-শিক্ষা, প্রথম ভাগ। নাড়াজোল গ্রন্থ নাড়াজোল রাজবাড়ি, ১৯১৮
৩. গঙ্গোপাধ্যায় সৌমেন্দ্র, সঙ্গীত কলাবিদ্ শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কলিকাতাগ্রন্থ সুবর্ণরেখা ১৯৯৪
৪. গোস্বামী প্রভাতকুমার, ভারতীয় সংগীতের কথা, কলকাতা, আদি নাথ ব্রাদার্স, ২০০৫।
৫. গোস্বামী ক্ষেত্রমোহন, আশুরঞ্জনী তত্ত্ব, কলিকাতা, নূতনবাজার চরকডাঙা লেন ৩০নং বাটি, ১৮৮৫।
৬. গোস্বামী ক্ষেত্রমোহন, কণ্ঠকৌমুদী, কলিকাতা, বঙ্গ সঙ্গীত বিদ্যালয়, ১৮৭৫।
৭. গোস্বামী ক্ষেত্রমোহন, জয়দেবের জীবন চরিত সম্বলিত গীতগোবিন্দ গীতাবলীর স্বরলিপি, কলকাতা গ্রন্থ পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ নাট্যালয়, ১৮৭১।
৮. গোস্বামী, ক্ষেত্রমোহন, সঙ্গীতসর। কলিকাতা, বঙ্গসঙ্গীত বিদ্যালয়, ১৮৭৯।
৯. ঘোষ, ড. প্রদীপকুমার, শাস্ত্রীয় সংগীত পরিচয়, প্রথম পর্ব, কলিকাতা, সুরধ্বনি ১৯৮৫।
১০. দাশশর্মা, অমল, সঙ্গীত মনীষা, প্রথম খণ্ড, কলকাতা গ্রন্থ কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৮১।
১১. বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যকিঙ্কর, সঙ্গীত-মুকুর, কলিকাতা গ্রন্থ সংগীত প্রেস, ১৯৬০
১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যকিঙ্কর, সঙ্গীত-জ্ঞান-প্রবেশ, কলিকাতা, দি নিউ ইন্ডিয়া প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৪৯।
১৩. মুখোপাধ্যায়, দিলীপকুমার, বাঙ্গালীর রাগ-সঙ্গীত চর্চা, কলিকাতা গ্রন্থ ফার্মা কে এল এম প্রা.লি., ১৯৭৬।
১৪. মুখোপাধ্যায়, দিলীপকুমার, ভারতের সঙ্গীতগুণী, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা গ্রন্থ এ. মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রা. লি., ১৯৭৭।
১৫. সেনগুপ্ত, সুবোধচন্দ্র (প্রথান সম্পা.), ও বসু, অঞ্জলি (সম্পা.), সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, ২০১০।

# শুভবিবাহ : অন্তঃপুর ও অন্তঃপুরিকাগণের জীবন্ত আলেখ্য

**মৌমিতা তালুকদার***

বাংলা সাহিত্যে নারীর অবদান অবিস্মরণীয়, তা সাহিত্যের কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবেই হোক কিংবা স্রষ্টা হিসেবেই হোক। উভয় ক্ষেত্রেই নারী স্ব-মহিমায় বিরাজিত। চর্যাপদ থেকে শুরু করে আধুনিক সাহিত্য— সকল ক্ষেত্রেই নারী আপন স্বরূপে বিরাজমান। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম নিদর্শন চর্যাপদে প্রতিফলিত সমাজচিত্র থেকে তৎকালীন বঙ্গসমাজে নারীর ভূমিকা কীরূপ ছিল তার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। সে সময় পুরুষের পাশাপাশি নারীও অর্থোপার্জনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করত। শুধু অর্থোপার্জনই নয়, সংগীত-নৃত্যচর্চাতেও পুরুষের সঙ্গে নারীরাও অংশগ্রহণ করত। যেমন ১৭ সংখ্যক চর্যায় পাওয়া যায় :

নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী।
বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই।।[১]

তবে একথা অনস্বীকার্য যে, মধ্যযুগের তুলনায় চর্যার নারীরা অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করেছে। দিনের বেলায় যে বধূ নিজ ছায়া দেখে ভীত সন্ত্রস্ত থাকে, সেই বধূ রাতের বেলা শ্বশুরের নিদ্রা অবকাশের সুযোগ নিয়ে কামাভিসারে যাত্রা করে। চর্যার ২ সংখ্যক পদে বর্ণিত আছে :

দিবসই বহুড়ী কাউই ডরে ভাঅ।
রাতি ভইলেঁ কামরু জাঅ।।[২]

পঞ্চদশ শতকে রচিত বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের নায়িকার মধ্যে দিয়ে তৎকালীন নারী সমাজের পরিচয় পাওয়া যায়। সে সময় সমাজে বাল্যবিবাহের প্রচলন ছিল। তাই রাধার বয়ঃসন্ধির সময় অনতিক্রান্ত অথচ কৌলিন্য রক্ষা হেতু এক নপুংসক গোয়ালার সাথে রাধার বিবাহ ঘটে। ফলত, দাম্পত্য জীবনের কোনো স্বপ্নই তাঁর পূর্ণ হয়নি। তার ওপর ছিল শাশুড়ি ননদের গঞ্জনা। মূলত এখানে রাধার মধ্য দিয়ে নারী সমাজের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, অসহায়তার চিত্রকেই তুলে ধরা হয়েছে।

মঙ্গলকাব্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে, সেখানে মনসা, চণ্ডীর আত্মপ্রতিষ্ঠার পেছনে রয়েছে দুটি ভিন্ন প্রেক্ষাপট। মনসার উগ্র স্বভাবের পশ্চাতে রয়েছে আজন্ম পিতা-মাতার স্নেহরস থেকে বঞ্চিত হওয়ার যন্ত্রণা, স্বামী সুখ বঞ্চিত হওয়ার বেদনা। অন্যত্র চণ্ডীর আত্মপ্রতিষ্ঠার পেছনে রয়েছে সংসারের অভাব অনটন, দারিদ্র্য, মহাদেবের সংসার বিমুখ উদাসীনতা।

আবার পদাবলী সাহিত্যের রাধার মধ্যেও নারী জীবনের অসহায়তা, যন্ত্রণাক্লিষ্ট জীবনের চিত্রই প্রতিফলিত হয়েছে। আসলে মধ্যযুগ থেকেই বাংলা সাহিত্যের কেন্দ্রীয়

*গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

বিষয় হয়ে এসেছে নারী। কিন্তু নারীকে প্রথম স্রষ্টার ভূমিকায় পাওয়া যায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে। এর পূর্বে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, নবীনচন্দ্র সেন, ঈশ্বর গুপ্ত, বিহারীলাল চক্রবর্তী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ নারীকে কেন্দ্র করে বহু সাহিত্য রচনা করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে নারী সাহিত্যের বিষয় হিসাবে গৃহীত হলেও, নারী রচিত সাহিত্যের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। যদিও মধ্যযুগে 'চন্দ্রাবতী রামায়ণ' নামে প্রচলিত গ্রন্থটি একজন মহিলার রচিত। কিন্তু প্রকৃতই সেটি কোনো মহিলার রচনা কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত সাহিত্যে পুরুষের কলমেই নারীর জীবনের নানা দিক শিল্পরূপ লাভ করেছে। প্রসঙ্গত মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যটির উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানে এগারো জন নায়িকা তারা তাদের প্রেমাস্পদের কাছে নিজেদের অভাব অভিযোগের কথা জানিয়েছেন। কিন্তু এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, এগারো জন নায়িকা নিজের কথা নিজেরা লেখেননি। এগারো জন নায়িকার সপক্ষে মধুসূদন নিজে কলম ধারণ করেছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে রেনেসাঁসের পর সাহিত্যের পাশাপাশি সমাজ জীবনেও নারীকে তার যোগ্য স্থান দেওয়ার জন্য নানা আন্দোলন শুরু হয়। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামমোহন রায় প্রমুখ। স্ত্রী শিক্ষার প্রসার, সতীদাহ প্রথা রোধ, বাল্যবিবাহ রোধ, বিধবা বিবাহের প্রস্তাব প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আন্দোলন হয় এবং আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এই সকল প্রথা রোধ করা হয়। মনে রাখতে হবে উনিশ শতকে বাংলায় রাজত্ব করছিল ইংরেজরা। ফলত, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে এদেশেও শিক্ষা সংস্কৃতিতে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে। শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারে নারীদের অন্তঃপুরের ভেতরেই শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এ সময় শিক্ষা-দীক্ষায় নারীরা অনেক বেশি মাত্রায় মার্জিত ও আধুনিক ধ্যান-ধারণায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে শুরু করল। যার ফলস্বরূপ ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্যে ঘটল এক যুগান্তকারী পট পরিবর্তন। বাংলা সাহিত্যে মহিলা সাহিত্যিকদের আবির্ভাব ঘটল। শুধু আবির্ভাব নয়, বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী সাহিত্যিক রূপেই তাদের আবির্ভাব ঘটে। কেউ কবি রূপে, কেউ বা ঔপন্যাসিক রূপে, আবার কেউ প্রাবন্ধিক রূপে সাহিত্য জগতে আত্মপ্রকাশ করলেন।

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে যে সকল মহিলা কবি আবির্ভাব ঘটে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন প্রসন্নময়ী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, মানকুমারী বসু, কামিনী রায়, প্রিয়ংবদা দেবী, সরলাবালা সরকার প্রমুখ। এঁদের সকলেরই কাব্যের প্রধান বিষয় ছিল পারিবারিক জীবন, স্বামী ভক্তি ও বৈধব্য যন্ত্রণা। উনিশ শতকের মহিলা কবিদের নিয়ে পূর্বেই অনেক চর্চা হয়েছে। কাজেই সে বিষয়ে বিশেষ আলোচনা না করে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের একজন প্রতিভাবান অথচ বিস্মৃত-প্রায় রবীন্দ্র সমসাময়িক মহিলা ঔপন্যাসিকের রচনাশৈলীর প্রতি আলোকপাত করা যাক।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম বাঙালি মহিলা ঔপন্যাসিক নিঃসন্দেহে স্বর্ণকুমারী দেবী। স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রথম উপন্যাস 'দীপনির্বাণ' ১৮৭৬ খ্রি. প্রকাশিত হয়। স্বর্ণকুমারী দেবীর পরেই মহিলা ঔপন্যাসিক হিসাবে যাঁর নাম স্মরণ করতেই হয় তিনি হলেন শরৎকুমারী চৌধুরানী। ১৮৬০ খ্রি. ১৫ জুলাই ব্যারাকপুরের চাণকে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিত্রালয় ছিল কলকাতার চোরবাগান পল্লিতে। পিতা শশীভূষণ বসু চাকরি নিয়ে লাহোরে চলে যাওয়ার পর দু'বছর বয়সী শরৎকুমারীও পিতার কাছে চলে যান। তিন বছর বয়সে তিনি লাহোরের বঙ্গ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। বঙ্গ বিদ্যালয়ে তিন বছর শিক্ষা লাভের পর শরৎকুমারী ইউরোপীয়ান স্কুলে ভর্তি হন। পরবর্তীকালে কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর আন্দুলের বিখ্যাত চৌধুরী পরিবারের কনিষ্ঠ পুত্র অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর সাথে তাঁর বিবাহ হয়। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর সূত্র ধরেই শরৎকুমারী জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সাথে পরিচিত হন। ঠাকুরবাড়িতে তিনি 'লাহোরিনী' বা 'লাহোরানী' নামে পরিচিত ছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁকে সখিত্বে বরণ করে নেন এবং নাম দেন 'বিহঙ্গনী' সই। এমনকি স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর গীতিনাট্য 'বসন্ত উৎসব' 'বিহঙ্গিনী' সইকে উৎসর্গ করেছিলেন। শরৎকুমারী কখনো প্রচারের আলোয় নিজেকে নিয়ে আসতে চাননি। প্রসঙ্গত জানানো দরকার যে, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হওয়ার সুবাদে ঠাকুরবাড়ির রবিবারের সন্ধ্যাকালীন আসরে শরৎকুমারী প্রবেশের অধিকার পান। এমনকি মাঝে মাঝে রবিবার সকালে তাঁর বাড়িতেই 'ভারতী' পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে নানা আলোচনা হত। 'ভারতী' পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে শরৎকুমারীর উৎসাহের সীমা ছিল প্রচুর। কিন্তু তিনি নিজে পত্রিকাতে লেখার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখাননি। যদিও পরবর্তীকালে বন্ধুদের অনুরোধ অগ্রাহ্য করতে না পেরে তিনি একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেটি-ই ছিল তাঁর প্রথম রচনা। ১২৮৮ (১৮৮১ খ্রি.) বঙ্গাব্দে ভাদ্র ও কার্তিক সংখ্যায় ছাপা হয় তাঁর প্রথম প্রবন্ধ 'কলিকাতার স্ত্রী সমাজ'। বলাবাহুল্য প্রবন্ধটি তিনি স্বনামে লেখেননি। এখানে তাঁর সই স্বর্ণকুমারী দেবীর সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কারণ স্বর্ণকুমারী দেবীও তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশের সময় নিজের নাম ব্যবহার করেননি।

শরৎকুমারীর প্রথম ও যুগান্তকারী সৃষ্টি হল 'শুভবিবাহ'। উপন্যাসটি ১৩১২ বঙ্গাব্দে মজুমদার লাইব্রেরি থেকে লেখিকার নাম ছাড়াই প্রকাশিত হয়। কথিত আছে রবীন্দ্রনাথ শরৎকুমারীর কাছ থেকে লেখাটি নিয়ে 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পীড়াপীড়ি করেন। যদিও তিনি ব্যর্থ হন। তবুও শেষপর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের আগ্রহেই 'শুভবিবাহ' উপন্যাসটি শরৎকুমারী দেবী নিজের নাম ছাড়াই গ্রন্থাকারে প্রকাশের অনুমতি দেন। 'শুভবিবাহ' উপন্যাস অবলম্বনে শরৎকুমারী দেবীর রচনাশৈলী নিয়ে আমরা বর্তমান আলোচনায় অগ্রসর হব। উপন্যাসের মূল কেন্দ্রে রয়েছে অন্তঃপুর ও অন্তঃপুরিকাগণের জীবনের চিত্র। অন্তঃপুরের একটি স্বতন্ত্র জীবন আছে। সেই জীবনের রহস্য অন্তঃপুরের বাইরে অবস্থিত মানুষের চোখে সম্পূর্ণরূপে ধরা পড়ে না। আমাদের দেশে আত্মীয়স্বজন, পরিচারিকা পরিবৃত্ত বৃহৎ যৌথ পরিবার কীভাবে

পরিচালিত হয়, তারই চিত্র উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে। এ চিত্র সম্পূর্ণভাবে অন্দরমহলের। উপন্যাসের আঙ্গিকেও ঔপন্যাসিক অভিনবত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। নাটকের আঙ্গিকে সংলাপধর্মী কাহিনি বয়ন করেছেন তিনি। তবে কাহিনিতে কোনোরূপ জটিলতা পরিলক্ষিত হয় না। উপন্যাসের কাহিনিতে রয়েছে দুটি কায়স্থ পরিবারের অন্দরমহলের চিত্র। একটিতে রয়েছে সাবেকিয়ানার ছোঁয়া, অপরটিতে রয়েছে আধুনিক কালের ছোঁয়া।

উপন্যাসে বর্ণিত দুটি কায়স্থ পরিবারের একটি হল ভুবনেশ্বরীর দিদির পরিবার। ভুবনেশ্বরীর দিদি ছিলেন প্রাচীন মতাদর্শী। উচ্চপদস্থ ছেলেদের উপার্জিত অর্থের অহংকারে অহংকৃত। কিন্তু তাঁর অন্তরে যে স্নেহরস সঞ্চিত ছিল তা কখনোই বিকৃত হয়নি। তাই তো বহুদিন বাদে বিদেশ থেকে ফিরে আসা নিজের বিধবা বোনকে দেখে সে চোখ মুছতে মুছতে বলে—

> তুই ত আমার বোনের মতন নস্, আমার পেটের সন্তানের মতন, বুকের দুধ দিয়ে তোকেও মানুষ করেছি, তোর এ দশাও আমাকে দেখতে হল।[৩]

তৎকালীন সমাজে ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারে মানুষের মধ্যে একপ্রকার অন্ধ সংস্কার কাজ করত। সেই সংস্কারের প্রভাব ভুবনের দিদির মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। তাই তো শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে ছোঁয়াছুঁয়ির ভয়ে সকলকে বারণ করে দিয়েছিলেন যে—

> আমার মুখে কেহ পেসাদ দিতে এস না।[৪]

ভুবনের দিদির বিধবা কন্যা রানীর কল্যাণময়ী, স্নেহশীলা ও কর্তব্য পরায়ণ। বৈধব্যের পর দাদার সংসারেই সে আশ্রয় নেয়। দাদাদের সেবাযত্ন করা, বৌ-দের কাজকর্ম শেখানো— বলতে গেলে বিশাল সংসারের কর্মকাণ্ডের তদারকি তাকেই করতে হয়। শ্রীক্ষেত্রে প্রসাদ গ্রহণের ব্যাপারে রানীর সঙ্গে তার মায়ের মতের পার্থক্য রয়েছে। সে বলে—

> মাসিমা, সেখানে গেলে মন এমন পবিত্র হয় যে, ঘৃণা চলে যায়। আমি মাসিমা, সকলের হাতে খেয়েছি। ... আহা, পেসাদ মুখে দিতে যে আমোদ, শরীর রোমাঞ্চি হয়ে উঠে। সকলে এক পাত্রে খাচ্ছি, তুমি আমার মুখে দিলে আমি তোমার মুখে দিলুম, ব্রাহ্মণ কায়স্থ ভেদ নাই, এই ত সেখানকার আমোদ---সবাই বিশ্ব জননীর সন্তান, আপনার ভাই বোন্।[৫]

শ্রীক্ষেত্রের যথার্থ মহিমা উপলব্ধি করতে পেরেছিল রানী। তার প্রসাদ গ্রহণের সাথে মিশ্রিত হয়েছিল হৃদয়ের ভক্তি। তাই সে সহজেই জাতপাতের ভেদাভেদকে উপেক্ষা করে সকলকে আপন করে নিতে পেরেছিল। এখানেই রানী উপন্যাসে এক স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করে নিয়ে স্বমহিমায় বিরাজ করেছে।

মেজ কাকিমার মেয়ের বিয়েতে গিয়ে বিয়ের সকল কাজ নিজের কাঁধে তুলে নেওয়া থেকে শুরু করে নীরদকে ভ্রাতৃবাৎসল্যের সঙ্গে অন্ন পরিবেশন করা, অথিতিদের

আপ্যায়ন করা— সকল কার্য সম্পাদন করেছে এক দায়িত্ববান কর্ত্রীর ন্যায়।

পাশ্চাত্যের অভিঘাতে এদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ঘটলেও ভুবনের দিদি মেয়েদের শিক্ষা লাভে পক্ষপাতী ছিলেন না। শুধুমাত্র কন্যাকে পাত্রস্থ করার জন্য পুথিগত বিদ্যা অর্জনকেই যথেষ্ট বলে মনে করতেন। তাই ভুবন দিদির কাছে মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর বিষয়ে জানতে চাইলে তার দিদির স্পষ্ট উত্তর—

> না বোন্, ছি— মেয়েগুলোর স্কুলে যাওয়া আমার দু'চক্ষের বিষ। এখনকার যে দিনকাল পড়েছে একটু পড়াশুনা জানা না থাকলে বিয়ে হবার জো নেই, তাই বাড়িতে পণ্ডিত রেখে দিয়েছি, লেখাপড়া করে। কনে দেখতে এসেই মিন্‌সেরা পড়ার কথা জিজ্ঞাসা করে, যেমন আপনারা সাহেব হচ্ছে, তেমনি ঘরের মেয়েছেলেদের মেম করতে চায়।[৬]

বৃহৎ পরিবার সামলানোর বাইরে আধুনিক ধ্যান ধারণাকে গ্রহণ করার মতো উদার মানসিকতা ভুবনের দিদির ছিল না। কন্যার বিবাহের ব্যাপারে ভুবনের দিদি শিক্ষা অপেক্ষা রূপকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এমনকি পণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তার মতে—

> তুমিও যেমন, পয়সার কাছে কেউ নয়। আজকালের বাজারে মেয়ে রূপসী হোন আর গুণবতীই হোন, বাপ একছালা টাকা না ঢালতে পারলে তার আর পারাপার নেই। থাক্ থাক্ দশ দিন থাক্ সব জানবি।[৭]

অর্থাৎ বিবাহের নামে বরপক্ষকে পণ দানের মতো ঘৃণ্য অপরাধের প্রতিও ঔপন্যাসিক আলোকপাত করেছেন। সে সময়ে মেয়েরা শুধুমাত্র বিক্রয় পণ্য হিসাবেই পরিগণিত হত। মেয়েদেরও যে একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, তা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে গণ্য হত না। কিন্তু বিদেশে থাকা ভুবনের মেয়েদের সম্পর্কে ধারণা সম্পূর্ণ আলাদা। সে মনে করে মেয়েদেরও শিক্ষা লাভের অধিকার আছে। তাই নিজের পুত্র গণেশের বিবাহের জন্য সে এমন পাত্রীর সন্ধান করেছে যে নিজে শিক্ষিত ও ভদ্র ঘরের কন্যা হবে। উপন্যাসে ভুবনকে বলতে শোনা যায়—

> দিদি, গণেশের একটি বিয়ের সম্বন্ধ কর না। মেয়েটি সুশ্রী হয়, একটু লেখাপড়াও জানে, আর ভদ্র ঘরের মেয়ে হয়।[৮]

উপন্যাসে বর্ণিত অপর একটি পরিবার হল ভুবনের দিদির মেজ জা'র পরিবার অর্থাৎ নীরদচন্দ্রের পরিবার। এই পরিবারের মেয়েরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত রুচিসম্মত ও মার্জিত। নীরদের মেয়ের বিয়ের উপলক্ষ্যে মেজ জা'র অর্থাৎ দ্বিতীয় কায়স্থ পরিবারের অন্দরমহলের চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। নীরদের পরিবারের মেয়েরা লেখাপড়া শেখার পাশাপাশি মেমদের কাছে গানবাজনা, সেলাই সবকিছুই শেখে। নীরদের মার বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় তাদের পরিবারের মেয়েরা কতটা উন্নত চিন্তাধারার অধিকারী। নীরুর মা ভুবনকে বলে—

> কি করি, আমি দেখলুম— নীরু তো সাহেব হয়েছে, মেয়েদের বৌদের ইংরাজী শেখার জন্য একজন মেম রেখে দিয়েছে, হপ্তায় তিন দিন ক'রে মেম এসে তাদের শেলাই, ইংরাজী আর হারমোনিয়াম শেখায়। আমিও হপ্তায় তিন দিন তাদের ঘরকন্না শেখাবার ব্যবস্থা করলুম। ... কি দিয়ে কি রাঁধতে হবে আমাদের জিজ্ঞাসা করে, আবার রান্নার বইগুলো কিনে দিয়েছি, তাতেই কাজ চলে যায়।[৯]

নীরদের পরিবারের মেয়েরা পাশ্চাত্য শিক্ষার পাশাপাশি এদেশের আচার-আচরণ পালনেও অত্যন্ত সাবলীল। আসলে ঔপন্যাসিক খুব সুন্দরভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। আর এই মেলবন্ধন ঘটানোর সেতু হিসাবে তিনি নির্বাচন করেছেন অন্তঃপুরিকাগণকে, যা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক দুর্লভ ঘটনা।

সাজপোশাকের ক্ষেত্রেও নীরদচন্দ্রের পরিবার অনেক বেশি আধুনিক রুচি সম্মত। নীরুর ছোটো ভাইয়ের স্ত্রীর ঘরের বর্ণনা দিলেই বিষয়টি অনেকখানি স্পষ্ট হবে—

> ঘরে এক জোড়া খাট, কড়িকাট হইতে মশারি ঝুলিতেছে; মশারির ভিতর পাখা। পরিষ্কার বিছানা প্রস্তুই আছে। একটি আয়না টেবিল, তাহাতে নানাপ্রকার গন্ধদ্রব্য- একটি আনলাতে কয়েকখানি শাড়ি কোঁচান আছে, জ্যাকেট ও সেমিজ ২/১টি ঝুলিতেছে, গোটা দুই কামিজও ঝুলিতেছে— একটি বড় আলমারি ঝক্‌ঝক্ করিতেছে— একটি গ্লাসকেসে দেশী বিলাতী খেল্‌না সাজান—[১০]

আবার বধূর হাতে একই সঙ্গে ঢ্যাপা ঢ্যাপা সিকলি চুড়ি ও চমৎকার গড়নের বেলোয়ারী চুড়ি যেন এই দুই সমাজেরই বিচিত্র সহাবস্থানের প্রতীক।

উপন্যাসের দুই কায়স্থ পরিবারের অন্তঃপুরের জীবনযাত্রার পরিচয়ের প্রদান প্রধান বিষয় হলেও, বিধবা পিসিমার চরিত্র উপন্যাসের কাহিনিতে এক আলাদা মাত্রা দান করেছে। নিঃসন্তান অনাথা বিধবা পিসিমা জনশূন্য বৃহৎ বাড়িতে বিপুল ঐশ্বর্যের মধ্যে শ্যামসুন্দরের বিগ্রহকে বুকে আঁকড়ে ধরে একাকী জীবন অতিবাহিত করছেন। হঠাৎ পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রকে কাছে পেয়ে তার অন্তরের সুপ্ত স্নেহরসের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। গণেশকে কাছে পেয়ে যখন তার চোখ থেকে অশ্রুজল বিগলিত হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই পাঠকের হৃদয়ও বোধ হয় তাতে সুস্নিগ্ধ হয়ে ওঠে।

'শুভবিবাহ' উপন্যাসে শুধুমাত্র স্ত্রী সমাজের সংলাপ ও চিত্র-ই নেই, আছে তাদের জীবনের সমস্যার কথাও। ভুবনের দিদির মেয়েদের ধনী পরিবারে বিবাহ হলেও, তাদের প্রত্যেকের সমস্যা স্বতন্ত্র। ঔপন্যাসিক শরৎকুমারী দেবী দেখাতে চেয়েছেন ধনী ও সুপাত্রের হাতে কন্যাকে সমর্পণ করলেই নারী জীবনের সকল সমস্যার সমাধান হয় না। যেখানে নারীর নিজস্ব কোনো মূল্য নেই সেখানে সুখের অন্বেষণ করাই ভিত্তিহীন।

সেকালের কলকাতার অন্তঃপুরের প্রয়োজনীয় তথ্য অন্বেষণ করতে হলে শরৎকুমারী চৌধুরানীর 'শুভবিবাহ' উপন্যাসটি অবশ্যই পাঠ করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ

স্বয়ং যে উপন্যাস পড়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন—

> 'এই গ্রন্থকে আমরা সাহিত্যের একটি বিশেষ লাভ বলিয়া গণ্য করিলাম।'[১১]

বাস্তবিকই 'শুভবিবাহ' গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের জগতে এক দুর্লভ সংযোজন— তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

**তথ্যপঞ্জি :**


১. ড. নির্মল দাশ, 'চর্যাগীতি পরিক্রমা', দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৫, পৃ. ১৫৯
২. ড. নির্মল দাশ, 'চর্যাগীতি পরিক্রমা', দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৫, পৃ. ১১৫
৩. শরৎকুমারী চৌধুরানী, 'শুভবিবাহ', মজুমদার লাইব্রেরি, ১৩১২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ০৪
৪. ঐ, পৃ. ১৮
৫. ঐ, পৃ. ১৮
৬. ঐ, পৃ. ২২
৭. ঐ, পৃ. ২৩
৮. ঐ, পৃ. ২৬
৯. ঐ, পৃ. ৬৭
১০. ঐ, পৃ. ৬৩
১১. রুবি চৌধুরানী, 'বাণীসেবায় বাংলার নারী', পুস্তক বিপণি, জানুয়ারি ২০০৩, পৃ. ৪৮


**সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :**


১. ড. সত্যবতী গিরি ও ড. সমরেশ মজুমদার (সম্পা.), 'প্রবন্ধ সঞ্চয়ন', রত্নাবলী, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৫ এপ্রিল ২০০৯
২. ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্য পরিচয়', তুলসী প্রকাশনী, ষষ্ঠ পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ : আগস্ট, ২০১১



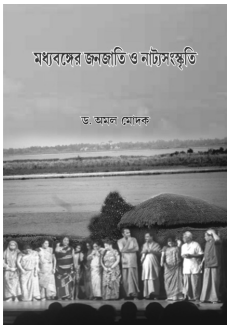


**এবং প্রান্তিকের বই-**

**মধ্যবঙ্গের জনজাতি ও নাট্যসংস্কৃতি**
**ড. অমল মোদক**
**মূল্য : ১৬০ টাকা**

# অপূর্ব্ব সতী : এক বিস্মৃত মহিলা নাট্যকারের নাটক

**শুভশ্রী পাত্র***

১৮৭২ সালের ন্যশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাংলার রঙ্গমঞ্চ বাঙালীর নাট্যরস পিপাসাকে অনেকটাই চরিতার্থ করতে পেরেছিল। এরপরই এলো বেঙ্গল থিয়েটার। যারা পুরুষ নয়, মহিলাদের দিয়েই মহিলাদের ভূমিকার অভিনয় শুরু করলেন। মধুসূদন দত্ত, উপেন্দ্রনাথ দাস একে সমর্থন করলেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখরা রঙ্গমঞ্চে বারাঙ্গনাদের প্রবেশকে মেনে নিতে পারেন নি। ''গোলাপ সুন্দরী (সুকুমার দত্ত), এলোকেশী, শ্রীমতী, জগৎত্তারিণী ও শ্যামানাম্নী চারটি অভিনেত্রী লইয়া বেঙ্গল থিয়েটার (১লা ভাদ্র, ১৮২০ সাল) খুলিয়া ছিল।''[১] সোমপ্রকশ পত্রিকা, মধ্যস্থ পত্রিকা, ভারত সংস্কার পত্রিকা, সুলভ সমাচার, সাধারণী পত্রিকায় বারাঙ্গনাদের মঞ্চে অভিনয় তীব্র ভাষায় নিন্দিত হয়েছিল। তবুও ভদ্রঘরের নারী না হলেও এইসব বারাঙ্গনারা বাংলা নাট্য জগৎকে অনেকটাই অভিনয়ের দিক থেকে এগিয়ে দিতে পেরেছিলেন।

এদের মধ্যে গোলাপ সুন্দরী (সুকুমারী দত্ত) অভিনয়কে আশ্রয় করেই নাট্য রচনায় হাত দিয়েছিলেন। বাংলার নাট্য সাহিত্যের তিনিই প্রথম মহিলা নাট্যকার। শ্রীরামপুরের মাহেশের বারাঙ্গনা মায়ের কন্যা গোলাপ উপেন্দ্রনাথ দাসের হাত ধরেই বেঙ্গল থিয়েটারে এসেছিলেন।

উপেন্দ্রনাথ দাস তাঁর দলের গোষ্টবিহারী দাসের সঙ্গে সুকুমারীর বিবাহ দেন ১৮৭৪, ১২ ফেব্রুয়ারিতে। এই বিবাহকে কেন্দ্র করে কলকাতা শহর উত্তাল হয়েছিল এক সময়। এমনকি ব্যঙ্গবিদ্রুপ করে লেখা হয়েছিল নানা ছড়া-

আমি সখের নারী সুকুমারী
স্ত্রী পুরুষে অ্যাক্টো করি
দুনিয়ার লোক দেখে যারে।''[২]

বিবাহ হলেও গোলাপের এ জীবন অবশ্য সুখের হয়নি। সুকুমারীকে পরিত্যাগ করে কিছুদিন পর গোষ্ঠবিহারী জাহাজের খালাসীর কাজ নিয়ে বিদেশে পাড়ি দেন এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। সুকুমারী কন্যাকে নিয়ে চরম বিপদে পড়েছিলেন, সেই কারণে পরবর্তীকালে জীবনে বেঁচে থাকার লড়াইকে সামনে রেখে অভিনয় জগতে ফিরে আসতে হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর দিনটিও কেউ লিখে রাখেন নি, তাই জন্ম, মৃত্যু দুটি দিনই আমাদের অজানা।

সুকুমারী দত্তর প্রথম মঞ্চে আর্বিভাব ১লা ভাদ্র, ১২৮০ সাল, মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা নাটকের শর্মিষ্ঠার চরিত্রে মধ্য দিয়ে। দুর্গেশনন্দিনীর বিমলা, পুরুবিক্রমের ঐলাবিলা, অশ্রুসতীর

*অংশকালীন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মাইকেল মধুসূদন মেমোরিয়াল কলেজ।

মলিনা চরিত্রে তার অভিনয় জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। অবনীন্দ্রনাথ তার মলিনা চরিত্রে অভিনয় প্রসঙ্গে বলেছেন ''পৃথ্বিরাজ ও মলিনার গান, এখনও কানে বাজছে সে সুর''।[৩]

১৮৭৪ এর শেষ দিকে সুকুমারী যোগ দেন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে। এই গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে তার শিক্ষক ছিলেন নটশ্রেষ্ঠ অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী। তার সুপ্ত প্রতিভা শতধারায় উৎসারিত হয়েছিল অভিনয় দক্ষতায় অধেন্দুশেখরের নাট্যশিক্ষার ফলে।

এমারেল্ড থিয়েটারেও সুকুমারী বেশ কিছু নাটকের অভিনয় করেন। এখানে তাঁর অভিনয় শিক্ষার গুরু ছিলেন পরিচালক মহেন্দ্রলাল বসু। সুকুমারী বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস অভিনয় করে জনপ্রিয়তার শিখরে উঠেছিলেন। সুকুমারী দত্তের বিমলা, গিরিজায়ার অভিনয় দেখে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলেছিলেন ''আজ বিমলা গিরিজয়াকে জীবন্ত দেখিলাম...''[৪] সুগায়িকা, সুঅভিনেত্রী সুকুমারীর অভিব্যক্তি, সুকণ্ঠ, গীতিকুশলতা তাঁকে সেযুগের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী করেছিল।

গোষ্ঠবিহারী দাস যখন তাঁকে ছেড়ে চলে যান তখন সুকুমারী ঠিক করেন নাটক লিখেই জীবিকা নির্বাহ করবেন। কিন্তু আমরা সুকুমারীর একটি নাটকই আজ পর্যন্ত পাই তা হল 'অপূর্ব্বসতী'। বাংলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম মহিলা নাট্যকার। যদিও তার নাটকটি তার সম্পূর্ণ নিজের লেখা কিনা সে সম্বন্ধে সুকুমার সেন বলেছিলেন তিনি ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির ক্যাটালগে পেয়েছেন আশুতোষ দাস ও সুকুমারী দত্তের রচনা 'অপূর্ব্বসতী' নাটক। কিন্তু 'অপূর্ব্বসতী' নাটকের টাইটেল পেজে ও নাটকটি সমাপ্তির পরও স্পষ্ট লেখা ''শ্রীমতী সুকুমারী দত্তের দ্বারা প্রণীত ও প্রকাশিত।''

'অপূর্ব্বসতী' নাটকটি সুকুমারী দত্ত স্বর্ণকুমারীকে উৎসর্গ করেন। 'অপূর্ব্বসতী' নাটকটিতে মোট ৫টি অঙ্ক, ১৪ গর্ভাঙ্ক। 'অপূর্ব্বসতী' নাটকে ৮টি পুরুষ চরিত্র, এটি অপ্রধান পুরুষ চরিত্র এবং ১০টি নারী চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই। পুরুষ চরিত্রগুলি সমাজের নানা স্তর থেকে উঠে এসেছে আর নারী চরিত্রগুলির মধ্যে ভদ্র চরিত্র ১টি রাধারানী আর বাকী নারী চরিত্রগুলির মধ্যে সবই প্রায় দাসী বা বারাঙ্গনা চরিত্র। নানা চরিত্রের ভিড়ে নাটকটি আর্কষণীয় হয়ে উঠেছে।

'অপূর্ব্বসতী' নাটকটি বারাঙ্গনা নলিনীর জীবনকথা। মা হরমণি তাকে পড়াশুনা শিখিয়েছিলেন শিক্ষিত বারাঙ্গনা হিসেবে বেশী অর্থ উপার্জন করবে বলে। কিন্তু নলিনীর কাছে এ জীবন কাম্য নয়। এ জীবন সে চায় না - ''পাপিনীর গর্ভজাত অভাগিনী কন্যা আমাকেও কি দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ সেই ব্রতে ব্রতী হতে হবে?''[৫] বিয়ের স্বপ্ন দেখলেও তাঁর যে উচ্চবংশে বিয়ে সম্ভব নয় তা সে জানত। তবু সে মনের মত একজন শিক্ষিত প্রণয়ী পতির চরণে সেবা করে জীবন কাটাতে চায়, এ কামনা উঠে এসেছে স্বয়ং সুকুমারীর হৃদয় থেকে; যে বারাঙ্গনা হয়েও স্বামীসঙ্গ-সুখ কিছুদিনের জন্য পেয়েছিলেন। সুকুমারীর

আত্মজীবনের ছায়া পড়েছে নলিনী চরিত্রে। নলিনীর সঙ্গে তরলার (একজন বারাঙ্গনা) কথোপকথনের মধ্য দিয়ে সুকুমারী দেখালেন নলিনীর অসামান্য বিদ্যাবুদ্ধিকে। সে রচনা লিখেছে যা তার হৃদয়ের যন্ত্রণাকে প্রকাশ করেছে। মা'র বৃত্তিকে সে ভালোভাবে নেয় না ঠিকই কিন্তু এর জন্য দুঃখ পায়। নিজের বিবাহ না হলে সে ঈশ্বরের ব্রত অবলম্বন করে জীবন কাটাবে ভেবেছিল। মা হরমণি এক শিক্ষিত বালক চন্দ্রকেতুকে নলিনীর কাছে আনে। চন্দ্রকেতু নলিনীকে ভালোবাসলেও চন্দ্রকেতুর পিতা তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। নলিনী আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে তার বারাঙ্গনার প্রেমকে যথার্থ প্রেম করে তোলে। সুকুমারীর মনের আশা ছিল স্বামী সংসার নিয়ে সুখের সংসার জীবন। তাই অভিনয় জীবনও তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সুকুমারীর সে স্বপ্ন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি স্বামী পরিত্যাগ করে চলে যাবার কারণে। সেই স্বপ্নই রূপ পায় নলিনীর মধ্যে। তাই অপূর্ব্বসতী'র নলিনীতে সুকুমারীর আত্মজীবনের ছায়া পড়েছে।

বারাঙ্গনা জীবনের কথা এই প্রথম নাটকে চিত্রায়িত হল। সে যুগের বারাঙ্গনাদের জীবনের সুখ-দুঃখের বাস্তব দলিল 'অপূর্বসতী'। এই নাটক বারাঙ্গনার লেখা প্রথম নাটক; যা মঞ্চে অভিনীতও হয়েছিল। নাটকটির নাট্যমূল্য যাই হোক, ঐতিহাসিক দিক থেকে এ নাটকে মহিলা নাট্যকার সুকুমারী দত্ত চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

**তথ্যসূত্র:**

১। রঙ্গালয়ের রঙ্গকথা : পৃষ্ঠা ৬৮, অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়। ১ম সংস্করণ।
২। বাংলার নটনটী : পৃষ্ঠা ৭৬, দেবনারায়ণ গুপ্ত, ১ম সংস্করণ।
৩। ঘরোয়া : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাণীচন্দ অনুলিখিত, বিশ্বভারতী প্রকাশন, ২য় সংস্করণ।
৪। রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর : পৃষ্ঠা ১১০, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, স্বপন মজুমদার সম্পাদিত, ১ম প্রকাশ, ১৯১২।
৫। প্রসঙ্গ : সুকুমারী দত্ত : বিজিতকুমার দত্ত, বিভাগীয় পত্রিকা, সপ্তম সংখ্যা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

সহায়ক গ্রন্থ :

১। রঙ্গালয়ের রঙ্গকথা - অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়। ১ম সংস্করণ।
২। উনিশ শতকের নাট্য বিষয় - দর্শন চৌধুরী, ১ম সংস্করণ (পুস্তক বিপণী)
৩। বাংলার নটনটী - দেবনারায়ণ গুপ্ত, ১ম সংস্করণ।
৪। রঙ্গালয়ের ত্রিশ বৎসর - অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, স্বপন মজুমদার সম্পাদিত। প্রথম প্রকাশ, ১৯৭২।
৫। প্রসঙ্গ - সুকুমারী দত্ত, বিভাগীয় পত্রিকা, সপ্তম সংখ্যা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

# শেষ খেয়া ঃ পূর্ণাঙ্গ পাঠভিত্তিক বিবেচনা

ড. দেবকুমার ঘোষ*

'নৈবেদ্য'-র পাঁচ বছর পরের কাব্য 'খেয়া' (১৯০৬)। রবীন্দ্রকবিজীবনের অধ্যাত্মরসঘন আত্মনিবেদনের গীতসাধনার যুগের প্রবেশমুখে স্থাপিত হতে পারে এই কাব্য (কাব্যলোচনায় রবীন্দ্রনাথ ড. সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়)। এদিক থেকে খেয়া নতুন পর্বের কাব্য। এই সময় থেকেই কবির কাজ কবির দেখা এবং কবির দেওয়া / কবির দেখা দেখানোর পথে চলতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ (অজিত চক্রবর্তীকে লেখা চিঠি ঃ বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ)। 'শেষের লেখা'য় তার সঙ্গের অবস্থার প্রকৃত প্রকাশ ঃ ঘরেও নহে পারেও নহে'। ঘাটের কিনারায়'— মাঝখানে দাঁড়িয়ে দিনশেষে গোধূলিতে তিনি আপন দেশের নায়ের মেয়েকে ডাকছেনঃ আমায় নিয়ে যাবি কে রে দিনশেষে শেষ খেয়ায়।

জীবনরেখার প্রায় মাঝখানে দাঁড়িয়ে এই ডাক। ১৮৬১ থেকে ১৮৯৬ এবং ১৯০৬ থেকে ১৯৪১— এই দুই ভাগে রবীন্দ্রজীবনকে ভাগ করলে প্রায় মাঝামাঝিই রয়েছে খেয়া-কাব্য (প্রকাশ ১৯০৬); শেষখেয়া লেখা সম্ভবত ১৫-১৬ জুন ১৯০৫ (রবিজীবনী ৫ ড. প্রশান্তকুমার পাল) তারিখে।

বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবন অভিলেখ্যাগারের ১১০.১ নং পাণ্ডুলিপিতে খেয়া-কাব্যের ১ম খসড়া পাঠ রয়ে গেছে এবং তা কবির হাতেই লেখা। সেই পর্বের সঙ্গে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত এবং কাব্যগ্রন্থেও অন্যান্য সংকলনে মুদ্রিত 'শেষ খেয়া'র পাঠ মিলিয়ে পড়তে পারলে তবেই শেষ খেয়ার পূর্ণাঙ্গ পাঠ পড়া সম্ভব হয়ে ওঠে। কবিতার পূর্ণাঙ্গ পাঠ পাঠান্তর অনুধ্যান ছাড়া কবি ও কবিতার ভিতর ও বাহিরের আস্বাদন সম্ভব হয় না। কবিরই গান বলছে— 'বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছ কেমনে দিই ফাঁকি/আধেক ধরা পড়েছি গো, আধেক আছে বাকি'। আমাদের লক্ষ্য ধরা-পড়া আধেক এবং বাকি 'আর্ধেককে একই সঙ্গে ধরে পূর্ণপ্রাণ লাবণ্য পেয়ে যাওয়া— কবিতার ও কবির।

খেয়া কাব্যের প্রথম কবিতা 'শেষখেয়া'। রবিজীবনীর রচয়িতার কথায় এটি লেখা ১-২ আষাঢ় ১৩১২ তারিখের মধ্যে। ৪ আষাঢ় ১৩১২-র বঙ্গদর্শনে এটি প্রথম ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত। বিখ্যাত এই কবিতা এবং সংগীত-শিল্পী পঙ্কজকুমার মল্লিকের দেওয়া সুরের পাখায় ভর করে রবীন্দ্রসংগীতের মর্যাদা পেয়ে যাওয়া এই গানের শুরুটা 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা-পরা ওই ছায়া'।

রবীন্দ্রভবন অভিলেখ্যাগারে (বিশ্বভারতী) সুরক্ষিত এর পাণ্ডুলিপি পর্যবেক্ষণে বোঝা যায় সেখানে শিরোনামহীন এই কবিতা কবি শুরু করেছিলেন বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত

---

*অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়।

এবং রবীন্দ্রনাথের যে কোনো কাব্যগ্রন্থ কাব্যসংকলন গ্রন্থ বা রচনাবলীর 'শেষখেয়া' কবিতার ২য় স্তবক দিয়ে। তবে হুবহু এক তার পাঠ নয়, ভিন্নতর অথচ ২য় স্তবকের সঙ্গে মিল-মুখ্য হয়ে ওঠা পাঠ। পাণ্ডুলিপিতে কবি প্রথমে লিখেছিলেন—

দিনের বেলা ভাঁটার স্রোতে ওপার হতে একটানা
একটি-দুটি যায় যে তরী ভেসে!
কেমন করে চিনতে পারি ওদের মাঝে কোন্‌খানা
আমার ঘাটে ছিল আমার দেশে!

বঙ্গদর্শনে এবং যে-কোনো সংকলনে ছাপানো এই কবিতার ২য় স্তবকের শেষে ছিল যে দুটি ছত্র এবং প্রায়-ধ্রুবপদের মতোই কবিতার স্তবক থেকে স্তবকের শেষে প্রায় একই পাঠ নিয়ে বাঁধা পড়েছিল, সেই 'আমায় নিয়ে যাবি কে রে/ দিনশেষের শেষ খেয়ায়'— ছত্র দু-টি (পাণ্ডুলিপিতে) প্রথম লেখার সময়ে ছিল না। বানান পরিবর্তন পরিমার্জন করলেও এই ছত্র দুটিকে পাণ্ডুলিপিতে কবি ফিরিয়ে আনেন নি, এনেছেন বঙ্গদর্শনের পাঠে।

পাণ্ডুলিপির পূর্বোক্ত পাঠে (৯টি ছত্র) কবি শুরু করেছেন দিনের কথায়। ৫ম ছত্রে বলেছেন দিনের আঁধার ও সময় প্রবাহের কথা (আঁধার নামে-অংশ সময় যাত্রার পরিচায়ক)। কালো ছায়ার বর্ণালিম্পনের স্বভাব-ক্রিয়ায় ভরে ওঠা প্রকৃতিপটে রহস্যলোক গড়ে তোলার কাজ করে যান কবি-শিল্পী। কিন্তু দৃশ্যমান সেই রহস্যলোক ছাপিয়ে এক অন্তর্লীন রহস্য উঁকি দিয়ে যায় বড়ো হয়ে নাড়া দেয় পাঠককে এবং তা হল— 'দিনের যত আঁধার নামে...'।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন নিয়ে কবিমনের পীড়া বোধ, ব্যক্তিগত জীবনের দীর্ঘদিন ধরে একাধিক আপনজনের অকাল বিয়োগবেদনা। আত্মদীপের প্রজ্জ্বলন-সাধনার পথের নানান বাধার মধ্যেই হয়তো বা হদিশ মেলা সম্ভব পূর্বোক্ত দিনের যত আঁধার'-এর। কবি সরে গেছেন কর্মমুখরতার জগত থেকে।

খেয়ার পাণ্ডুলিপিতে মুদ্রিত খেয়ার ২য় স্তবকের পরে কবি লিখেছেন (বা রচনা করেছেন) ১ম স্তবক। ফলে 'শেষখেয়া'র মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি কবিতাপাঠ পাণ্ডুলিপির পাঠ থেকে ছাপা গ্রন্থপাঠে যেমনভাবে হয়, সেভাবে কেবল ছাপা গ্রন্থপাঠ থেকে হয়না. অথচ কবিতার পূর্ণাঙ্গ পাঠ পাণ্ডুলিপি পাঠ থেকে কবির জীবিতাবস্থায় প্রকাশিত সর্ব শেষ ছাপা পাঠ। রবীন্দ্রজীবনীকারের এই কথা মেনে শেষ খেয়া-র পাণ্ডুলিপিতে প্রথম ঝোঁকে বা স্রষ্টার সৃষ্টির আবেগের প্রথম প্রকাশে ছাপা-কবিতার ২য় স্তবকই হল পাণ্ডুলিপির কবিতার ২য় স্তবক। পাণ্ডুলিপিতে প্রথমে সেটি ছিল পূর্বোক্ত স্তবকের (দিনের বেলা ভাঁটার স্রোতে.... ওরে আয়!)

তবে পাণ্ডুলিলির কবিতার ৩য় স্তবক এবং ছাপা কবিতার ৩য় স্তবকের ক্ষেত্রে এমনটা হয়নি। দুটি ক্ষেত্রেই স্তবকটি প্রথমাবধি একইভাবে থেকে গেছে। পাণ্ডুলিপিতে প্রথমবারে লেখা ২য় স্তবক (ছাপা পাঠ ১ম স্তবক) লেখার পরে ৩য় স্তবকে (ছাপা পাঠ

৩য় স্তবক) কবি লিখেছেন—

ঘরে যারা যাবার তারা চলে গেছে ঘর পানে,
পারা যারা যাবার গেছে পারে!...
ঘরে না রে পাড়েও না রে আছে যেজন মাঝখানে
সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তারে!

কবিতা লিখতে শিখবেই কবি হয়ে যান কবিতার পাঠক— প্রথম পাঠক এবং একই সঙ্গে প্রথম সমালোচক ও সংস্কারক। এই প্রক্রিয়া যেকোনো কবিতা রচনার সময়েই দেখা যায়। তাই লিখতে লিখতেই পাণ্ডুলিপিতেই (প্রথমে লেখা ২য় স্তবক ২য় ছত্রে) 'ভুলাল রে ভুলাল রে, মোর প্রাণ ভুলাল রে।'-তে তিন-তিনবার 'ভুলাল রে' ব্যবহারে আবেগের মাত্রাতিরিক্তায় লঘু ও শিথিল হয়ে পড়া ভালবাসাকে উপযুক্ত ভাষারূপ দিয়েছেন কবি-সংস্কারক। কেটে দিয়ে বর্জন করেছেন শেষবারে লেখা 'ভুলাল রে' অংশটি। এতে পাঠ দাঁড়িয়েছে— 'ভুলাল রে ভুলাল রে মোর প্রাণ।'

পাণ্ডুলিপির প্রথমে-লেখা কবিতায় ১ম স্তবকে দিন ও দিন গড়িয়ে, আঁধারের অবতরণ চলে; ২য় স্তবকে দিনের শেষে স্বর্ণ গোধুলি ৩য় স্তবকে ঃ 'দিনের আলো সেও ফুরাল, সাঁজের আলো জ্বলল না'। ৩ম স্তবকের শেষবেলার নায়' কিংবা বেলাশেষের শেষখেয়া' বা ও-রকম কিছু নেই; ২য় স্তবকে আছে 'শেষবেলার নায়' এবং '৩য় স্তবকে 'বেলাশেষের শেষখেয়ায়'।

২য় স্তবক স্থানানন্তরে পর পাণ্ডুলিপিতে— ১ম স্তবকে দিনের শেষে স্বর্ণগোধুলি; প্রথমে লেখা ১ম স্তবক ২য় স্তবক হওয়ায় 'দিনের বেলা' ভাঁটার স্রোতে-র পরিবর্তন এবং 'সাঁজের বেলা'র উপস্থিতি, 'দিনের মত আঁধার নামে' বর্জন করে 'আস্তাবলের তীরের তলের' অভ্যর্থনা; ৩য় স্তবকে পাঠ ছিল আগের মতোই 'দিনের আলো সেও ফুরাল, সাঁজের আলো জ্বলল না'।

এই প্রেক্ষা নিয়েই কবি-পাঠক থেকে কবি-রসিক পাঠক ও কবি সমালোচক পাঠক সত্তার অনুবর্তনে পরিবর্তন হয়ে যায় পাণ্ডুলিপিতে লেখা কবিতার পাঠ। স্থানান্তরণের ফলে ২য় স্তবকের ১ম স্তবক হয়ে ওঠায় 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে'-র প্রাণ ভোলানো অনুভব গুরুতর হয়ে ওঠে বলেই 'সন্ধ্যা আসে দিন যে চলে যায়'- অভিব্যক্তিবাহী কবির (ব্যক্তিসাপেক্ষ সমাজসাপেক্ষ দেশকালসাপেক্ষ জীবন ও জীবনবোধসাপেক্ষ সত্তার পরস্পর অবিচ্ছিন্ন সত্তারূপ বা) ব্যক্তিক কবিসত্তার আকুলতা ও অন্তরঙ্গ কামনা। (আমায় নিয়ে যাবি কেরে/শেষবেলার নায়!) অনুপাতে ১ম থেকে ২য় স্তবক হয়ে যাওয়া পাঠের পরিবর্তন হয়—

(ক)দিনের কাব্যগ্রন্থ সাঁজের
খ) চিনতে পারি > চিনব ওরে
গ) দিনের যত আঁধার নামে > অস্তাচলে তাঁরের তলে

ঘ) কালো ছায়ায় নিজে ভবে > ছায়ায় যেন ছায়ার মত

ঙ) আমার ডাকে সাড়া দিয়ে > ডাকলে আমি ক্ষণেক থামি প্রথম পাঠ কেটে দিয়ে নতুন পাঠ লিখেছেন কবি। বঙ্গদর্শনে এবং কাব্যগ্রন্থে বা সংকলনের ছাপা-পাঠেও একই পাঠ রক্ষিত হয়েছে। কেবল পাণ্ডুলিপি থেকে বঙ্গদর্শন-পাঠ থেকে কাব্যগ্রন্থ পাঠে পৌঁছাতে গিয়ে অন্য দুটি স্তবকের শেষে পাণ্ডুলিপিতে যেমন ধ্রুবপদ-তুল্য ছত্রগুলি ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনি এখানেও ব্যবহার করেছেন। থেকে গেছে— ''ওরে আয়''। পরিত্যক্ত হয়েছে ভাবযতি, পরে এসেছে দুটি ছত্র— 'আমায় নিয়ে যাবি কে রে/দিনশেষে শেষখেয়ায়।'

লক্ষণীয়, কবিতার ভাবগত-প্রেক্ষিত থেকেই ক-নং পরিবর্তন। খ-নং পরিবর্তন ১ম স্তবকের 'দিনের শেষে'-র প্রসঙ্গটি মনে রেখে। (ফেলে আশা দিনের কল্পনা করার অবকাশে মাত্রা সৌষম্য ভাষমাধুর্য ছন্দ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ভাবনিবিড়তার প্রতীতি সঞ্চার করার জন্য সাধারণ ভবিষ্যতের সঙ্গে নৈকট্যসূচক পদবন্ধ (চিনব ওরে) ব্যবহার। গ-নং পরিবর্তনে চিত্র ও প্রসঙ্গে পরিবর্তনসূত্রে যেমন দিনের শেষের খেয়াকে মুখ্য করে তোলা, তেমনি ঘ-নং পরিবর্তনে দিনশেষের আবেদনকে খেয়ার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে দিনশেষ থেকে সন্ধ্যাকালের ক্ষণে বা ঘুমের দেশের যতির মধ্যে অপসৃয়মান সময়ের পরিচয় তুলে ধরা, রমণীসুলভ প্রতীতি সঞ্চারিত করে দেওয়া। নইলে 'ঘোমটা পরা ওই ছায়ায়' গুরুত্ব হারায়, সৌন্দর্য মাধুর্য স্নিগ্ধতা হারায়। ঙ-নং পরিবর্তনে 'আমার ঘাটে', 'আমার দেশে' থাকা তরীর মেয়েকে এপারের নিঃসঙ্গ ও নির্জনতায় নির্জিত মানুষটি ডাকলে (রমনীসুলভ ভঙ্গি ও অভ্যাস নিয়ে ঘোমটা পরা ছায়ায় ঢাকা ভেসে আশা খেয়ার মেয়েকে 'ডাকলে আমি ক্ষণেক থামি হেথায় পাড়ি ধরবে সে। ক্ষণেক থামার মধ্যেও রয়ে গেছে পূর্বোক্ত 'যতি'র আয়োজন। অবশ্য 'আস্তাবলে' ও 'ডাকলে'-র মধ্যে/চল/ধ্বনিগত মিল গড়ে তোলার সচেতন প্রচেষ্টা থেকেই যায় এর মধ্যে।

পাণ্ডুলিপিতে ২য় স্তবক থেকে ১ম স্তবক হয়ে উঠে কবিতা (উত্তরপর্বে কাব্যসংগীত) রূপে বিখ্যাত হয়ে ওঠে কবিতা (উত্তরপর্বে কাব্যসংগীত)রূপে বিখ্যাত হয়ে ওঠা 'শেষখেয়া'র ১ম স্তবকের পাঠে একাধিক পরিবর্তন করেছেন কবি এবং সেসব কবি পাঠক সমালোচক ও কবিপাঠক-রসিক সত্তার অনুবর্তন এবং ব্যক্তিক কবিসত্তার সক্রিয়তা থেকেই সম্ভাবিত হয়ে থাকে। সেইসব পাঠের সূত্রে এবং অপরিবর্তিত পাঠের সঙ্গে সেইসব পাঠের সম্পর্ক বিবেচনার সূত্রে কবির এবং কবিতার অন্তর্লোকের উদ্ঘাটন সম্ভব হয়ে ওঠে। প্রাসঙ্গিক পরিবর্তনগুলি—

ক) প্রদীপখানি জ্বালালো কোন্ ঘরে! > গেয়ে গেল কাজ ভাঙানো গান।

খ) অবনত বাক্য হত যাবার মুখে যায় যারা > নামিয়ে মুখ চুকিয়ে সুখ যাবার মুখে যায় যারা

গ) ফেরার পথে চায় না যারা ফিরে > ফেরার পথে ফিরেও নাহি চায়,

ঘ) শেষবেলার নয়! বেলা শেষের শেখ খেয়ায়! (> কাব্যগ্রন্থ পাঠে ঃ দিন শেষের শেষ খেয়ায়।)

গোধূলির সোনালি সময়ে ছায়াবৃতা খেয়া পারাপারের ছবি এঁকে কবি-শিল্পী কবি-স্রষ্টার চিন্তাশোকে ব্যক্তিক-কবি সত্তার আত্মদীপের আত্মায় আলোকিত করে নির্জনতায় চলে এসে কান-ভাঙানো গান শুনেছেন কবি।

এরপরে পাণ্ডুলিপির চূড়ান্ত পাঠে এবং বঙ্গদর্শন ও কাব্যগ্রন্থ-পাঠে ঘরছাড়া কবি কথকে ভাঁটার টানে যেতে চাওয়া এবং দিনের যাওয়া সন্ধ্যার আসার কালপ্রবাহ-বিজড়িত আকুতি। ঘ-নং পরিবর্তনে দিনশেষ বা অস্তাচলকে বোঝাতে-চাওয়া 'শেষবেলার' এবং আত্মোপলব্ধির রহস্যলোকে বা আপনদেশে-আপন ঘরে যেতে চাওয়া নিঃসঙ্গ কবি কথকের 'জায়' পরিবর্তিত হয়েছে আবেগী মাধুর্য ও ললিত গভীর ধ্বনিপ্রবাহ এবং সুরসঞ্চারের প্রয়োজনে প্রথমে হয়েছে 'বেলা শেষের খেয়ায়'। তাই হয়েছে— 'দিন শেষের শেষ খেয়ায়'।

পাণ্ডুলিপিতে স্থানান্তরণের মধ্য দিয়ে ২য় স্তবক ১ম স্তবক হয়ে ওঠার পরে ১ম ও ২য় স্তবকানুসারে ৩য় স্তবকের পাঠপরিবর্তন একান্তই অপরিহার্য হয়ে ওঠে। কবি-পাঠকের (রসিক ও সমালোচক/বিশ্লেষক) সক্রিয়তার ব্যক্তিক কবিসত্তার প্রণোদনায় সক্রিয় হয়ে ওঠা কবি-স্রষ্টা ও কবি-শিল্পীর সাহায্যে সেই পরিবর্তন সাধিত হয়। নিঃসঙ্গ কবিকৃত পরিবর্তনগুলি—

ক) ঘরে যারা যাবার তারা (চলে) গেছে ঘর পানে,
(বঙ্গদর্শন) ঘরেই যারা যাবার তারা গিয়েছে বলে ঘর পানে
/(কাব্যগ্রন্থ) ঘরেই যারা যাবার তারা কখন গেছে ঘর পানে/

খ) ঘরে (না রে) পারেও না রে আছে যে জন মাঝখানে >
> (বঙ্গদর্শন) ঘরেও নয় পারেও নয়, যে জন আছে মাঝখানে >
(কাব্যগ্রন্থ) ঘরে নহে পারেও নহে, যে জন আছে মাঝখানে

এখানে, ক-নং ও খ-নং পরিবর্তন-ভাষার ভঙ্গির ও ভাবের রূপটিকে স্তরে স্তরে সম্পূর্ণ ঘণীভূত করে তোলার জন্য এবং তার পাণ্ডুলিপির পরিবর্তনে; বঙ্গদর্শন ও কাব্যগ্রন্থ পাঠে এই পরিবর্তন পাণ্ডুলিপিতে কবি শেষ পরিবর্তন করেছেন স্থানান্তরণ চিহ্নের সাহায্যে। এই পরিবর্তনে ঘরছাড়া কবি-কথকের অবস্থানটি আবার চিহ্নিত করা যেমন হয়েছে, তেমনি তার > যার পরিবর্তনের তাৎপর্যে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গকে সরিয়ে নির্বিশেষ প্রসঙ্গকে স্থান করে দিয়ে নিজের থেকে নিজেকে দূরে রেখে উপলব্ধি ও বীক্ষণ-দুই অবকাশই তৈরি করে নেওয়া হয়েছে। তাই ঘর ও পারের মধ্যবর্তী স্থান, দিন ও রাত্রির মধ্যবর্তী সময়, বৈষম্য ও উপযুক্ত প্রাপ্তিহীনতায় বেদনাশ্রুমোচনে পরিবর্তে মুক্তির হাসি নিয়ে ক্রমশ বিজনতা নির্জনতা ও অন্ধকারে পৌঁছানো 'পারেও নহে'বলেই ঘাটের কিনারায় বসে ছায়ার ঘোমটাবৃত আপন দেশের আপনঘরের নায় ও মেয়েকে সংগীতময় আহ্বান

ওরে আয় / আমায় নিয়ে যাবি কেরে / বেলাশেষের শেষ খেয়ায়।

# বাণী বসুর গল্পে বাঙালি দাম্পত্যের রূপ

**রূপশ্রী ঘোষ***

বাণী বসুর লেখায় একটা বড় অংশ অধিকার করে আছে গত শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিশ্বায়ন-পরবর্তী বাঙালি মধ্যবিত্তজীবন। বিশ্বায়ন-পরবর্তী সময়ে বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবন যখন অনেক পাল্টে গেছে, বদলে গেছে সাজ-পোশাক, চালচলন। গোটা বিশ্ব এসে গেছে হাতের মুঠোয়। সেই সময় তিনি ঐতিহাসিক বৌদ্ধযুগের কথাও যেমন লিখেছেন তেমন বাদ দেননি সমসময়ের জীবনকেও। তাঁর লেখায় এন.আর.আইদের কথা যেমন এসেছে তেমনভাবেই এসেছে সদ্য একুশে পা দেওয়া যুবক-যুবতীরাও। আবার অষ্টমগর্ভের মতো পরীক্ষামূলক লেখার কথা তো উল্লেখ করতেই হয়।

তাঁর লেখার অনেকটা অংশ জুড়ে আছে যুগের সার্বিক উন্নয়নের নানান প্রতিমূর্তি। যেমন গোটা শহর জুড়ে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা শপিং মল, ভিডিও পার্লার, ফের-আইনক্স এর মতো সিনেমা হল থেকে শুরু করে শহরে জালের মতো বিছিয়ে থাকা ফ্লাইওভারগুলোও। একই সঙ্গে বেড়ে গেছে আজকের প্রজন্মের ইঁদুর দৌড়ের প্রতিযোগিতা। আর সন্তানদের সেই প্রতিযেগিতায় শামিল করার জন্য প্রকট রূপে বেড়ে চলেছে পূর্ববর্তী প্রজন্মের প্রাণান্ত প্রয়াস। যার অনিবার্য ফল হয়ে দাঁড়িয়েছে অল্পবয়সীদের ওপর প্রবল মানসিক চাপ, ছাত্র বা কর্মজীবনে ব্যর্থতা মানতে পারার অক্ষমতা এবং তাকে কেন্দ্র করে আত্মহননের প্রবণতা। এছাড়াও দেখা দিয়েছে সাফল্য-সূত্রে আত্মকেন্দ্রিকতা, বিদেশে যাওয়ার প্রবণতা যার অনিবার্য ফলশ্রুতি মা বাবার সঙ্গে ব্যবধান, মা-বাবার একা হয়ে যাওয়া। এইভাবেই সাফল্যের সমানুপাতিক হারে পূর্ববর্তী প্রজন্মের সঙ্গে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে মানসিক দূরত্ব। বাইরের চাকচিক্যের সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে বেড়েছে সম্পর্ক ভাঙার প্রবণতা, যা একটা রীতিতে পরিণত হয়েছে। সেই সঙ্গে আছে আধুনিক পরিবর্তিত মানসিকতার দম্পতির শিথিল, অসুখী, অখুশি দাম্পত্য সম্পর্ক।

দাম্পত্য মানে উভয়ে উভয়ের প্রতি একটা দায়িত্ব, একটা অঙ্গীকার, একটা জীবন যেটা নতুন করে শুরু করা, একটা অন্যরকম ভলোলাগা। অন্যদিকে বিবাহ মানে মেয়েদের সামাজিক নিরাপত্তা। তবে এই বিবাহ নামক সামাজিকতার মধ্য দিয়ে দাম্পত্য-নৈকট্যও যেমন সৃষ্টি হয় তেমনি সমহারেই সৃষ্টি হয় দাম্পত্য জীবনের নানান সমস্যা ও জটিলতা। আজ মানুষ বিবাহিত-জীবনের বা দাম্পত্যজীবনের সুখানুভূতি কতটা অনুভব বা উপভোগ করে বা আদৌ পায় কিনা তা একটা সামাজিক প্রথা। বাণী বসুর গল্প যা বাস্তবের আয়না তাতে দেখা যায় কোথাও স্বামী স্ত্রীকে প্রবঞ্চনা করে অফিস কলিগের সঙ্গে হোটেলে দিন

*গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

কাটান। যার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাই 'স্মার্ট গাই' গল্পে। গল্পের নায়ক সত্যেন চ্যাটার্জি স্ত্রী মণিমালাকে প্রবঞ্চনা করে অফিসের রিসেপশনিস্ট লিজ গ্লোর সঙ্গে প্রেম করত এবং তাকে নিয়ে বর্ধমান বেড়াতে গিয়েছিল। সেখান থেকে ফেরার সময় সত্যেন নিজের কলঙ্ক গোপন করতে লিজ গ্লোকে উদ্দেশ্যমূলকভাবেই গাড়ি থেকে ফেলে খুন করে। ''যদি বলি, ওটা একটা নিছক দুর্ঘটনা নয়, সুপরিকল্পিত মার্ডার! আপনি ক্রমশই মেয়েটির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছিলেন, ছাড়া পেতে চাইছিলেন, পারিবারিক শান্তি মানসম্মান বিপন্ন হবার ভয় পাচ্ছিলেন, সুযোগ খুঁজছিলেন, গাঁ-গাঁ করে লরিটাকে ছুটে আসতে দেখে আপনি ওস্তাদ ড্রাইভার, নিজের দিকে জানলা খুলে লাফ মারেন। গাড়িটা আপনার অস্বস্তি, আপনার লজ্জা সমেত গুঁড়িয়ে যায়!'' (বাণী-৩য়, পৃ. ১৩১)। একজন পুরুষ কীভাবে একটি মেয়ের জীবন নষ্ট করল। তার পরিচয় আছে গল্পটিতে। মেয়েটির সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে দোষ নেই, কিন্তু সমাজের চোখে ধরা পড়ায় দোষ আছে। শুধু তাই নয় বিবাহিতা স্ত্রীর কাছেও নিজের ইমেজটা বজায় রাখা দরকার। সমাজ বা পরিবারের কাছে তার ইমেজটা তুলে ধরার মতো একমাত্র সাক্ষীকে তাই হত্যা করে লোপাট করে দিতেও সে ওস্তাদ। দ্বিচারী পুরুষের সঙ্গ দিয়েই একটি মেয়ের বিবাহিত জীবন অতিবাহিত হচ্ছে আর সে ঘুণাক্ষরেও টের পাচ্ছে না। মেয়েদের দায়ই যেন সংসার আর সন্তান সামলোনো। আর স্বামীরা যা খুশি তাই করে বেড়ানোর স্বাধীনতাতেই অভ্যস্ত। আর একই ঘটনা যদি কোনও নারী করে? বিবাহিত হয়ে অন্য পুরুষের সঙ্গ নেয়। তাহলে সমাজ তাকে কী ফিরিয়ে দেয় সে তো কারোরই অজানা নয়। একজন বিবাহিত পুরুষ অন্য নারীর সংসর্গ লাভ করতে পারে, প্রয়োজনে তাকে হত্যা অবধি করতে পারে কিন্তু একজন নারী কখনও এই স্বাধীনতা পাবে না। এমনকি স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর সম্পর্ক যদি তৃপ্তিদায়কও না হয় তখনও নয়। দাঁতে দাঁত চেপে তাকে তার স্বামীর অত্যাচারই সহ্য করতে হবে। অথবা অন্য পুরুষের সঙ্গে যদি কোনো বিবাহিতার সম্পর্ক হয়েও যায় তাহলে মেয়েটি তার পরিবার, পাড়া-প্রতিবেশী থেকে শুরু করে পরিচিত সমাজ কারোরই গঞ্জনার হাত থেকে রেহাই পাবে না। তখন তার গায়ে লেবেল হিসেবে সাঁটা থাকবে সামাজিক কুৎসা বা কলঙ্ক। এটাই চরম বাস্তব। পরস্ত্রীতে আসক্ত অনেক পুরুষ আনাচ-কানাচে থাকে, আর পরপুরুষে আসক্ত নারী হলেই সেটা খবর হয়ে ছাপা হয়ে যায়।

আবার কোথাও স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েই নিজেদেরকে প্রবঞ্চনা করে কাটিয়ে দেয় সারাটা জীবন। যেমনটি দেখা যায় 'পঁচিশ বছর' গল্পে। এই গল্পে মণীশ তার বিবাহবার্ষিকীর দিন বন্ধুদের অনুরোধে চিঠি লেখে তার স্ত্রী ইন্দ্রাণীকে। লিখতে গিয়ে প্রথম লাইন শুরু করে এইভাবে— ''ডিয়ার লাবণি, মেনি মেনি হাপি রিটার্নস অব দ্য ডে ফর ইউ...হ্যাঁ লাবণি, তুমিই একমাত্র, যার জন্য আমি দিওয়ানা ছিলাম। যদি তুচ্ছ কারণে রাগারাগি ইগোক্ল্যাশ আর তারপর কথা না বার্তা না সুমিতচন্দরকে বিয়ে করে তুমি কেটে না পড়তে

তাহলে আর আমাকে ইন্দ্রাণীর খপ্পরে পড়তে হত না। কী দিয়েছে আমাকে সারাজীবন?" (বাণী-৩য়, পৃ. ১৮১) দাম্পত্য সম্পর্কের এই আর এক নমুনা। পঁচিশ বছর দুজনে একসঙ্গে কাটানোর পর সুযোগ পেয়েই উভয়ে উভয়ের মনের গোপন কথাকে প্রকাশ করার চেষ্টা করছে। অথচ এতদিন সংসার করছে দুজন দুজনকে ঠকিয়েই। কেউই কাউকে মনের অতৃপ্তি না জানিয়ে। দাম্পত্যের সংজ্ঞা কী তাহলে বদলে গেল? দাম্পত্য মানে কী তাহলে দুজনের মনের নিবিড় বন্ধন নয়? দাম্পত্য মানে কী তাহলে একে-অপরের মনের কথা চেপে অতিকষ্টে, মানসিক কষ্ট, যন্ত্রণা, অতৃপ্তি সহ্য করে কয়েকটা বছর কাটিয়ে দেওয়া? হয়তো তাই। বিভিন্ন দিক থেকেই দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকটি দাম্পত্যই কোনও না কোনও দিক থেকে অখুশি, শিথিল। মানবিক বন্ধন সেখানে অনুপস্থিত। গল্পে শান্তা, সীতা, রিনার যে পরিণতি বাস্তবের শান্তা, সীতা, রিণার পরিস্থিতিও তাই।

কখনও দেখা যায় দুঃখ দারিদ্র্যকে সঙ্গী করে, বাচ্চার জন্ম দিতে দিতে অতিবাহিত হয় বিবাহিত জীবন। ''পাঞ্চজন্য' গল্পে সীতার যে পরিণতি তা দেখে তো সুখি দাম্পত্য বলা যায় না। এইরকম একটা জীবনকে সঙ্গী করেই সীতারা জীবন অতিবাহিত করতে অভ্যস্ত। ''সীতার স্বামীর আজ দেড় বচ্ছর কাজ নেই বেকার, সাতটি সন্তানের চারটি মারা গেছে। এখনও কোলে যমজ। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছিস না ও কোন্ খাদের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।" (বাণী, ১ম, পৃ. ১৯২)। বিশ্বায়ন ঘটে গেলেও অভাব তো দূর হয়নি। শুধু তাই নয় পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে যেখানে যেতো বিজ্ঞাপন চালু হয়ে গেছে বা সরকার নিজে উদ্যোগ নিয়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত টিপ্স দিচ্ছে সেখানে এখনো একজন মহিলাকে সাত থেকে ন'টি সন্তানের মা হতে হচ্ছে। যতই শিক্ষার হার বাড়ুক না কেন এই অজ্ঞতা থেকে তো মানুষ বেরিয়ে আসতে পারেনি।

এমন খাদের কিনারা থেকে তুলে বাঁচার জন্যই তার অন্য বন্ধুরা তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, যারা একইভাবে তাদের স্বামীদের কাছে বঞ্চিত বা অবহেলিত। বা এমনও দেখা যায় যে কাজে ব্যস্ত না থেকেও স্বামী স্বাভাবিক সান্নিধ্য বা সাহচর্যটুকু দেয়না স্ত্রীকে। 'চারপর্ব' গল্পের নায়িকারও আক্ষেপ ''আমার বর কিরকম আড়ো আড়ো, ছাড়ো-ছাড়ো। কাজের কথা ছাড়া কথা নেই। মন বা হৃদয় যে ওর দেহের কোন্খানটায় থাকে আমি খুঁজে পাইনি। অথচ মানুষটা দেখতে ভাল, হাসে, হাসাতে পারে, মিশুক। সবই। তবু তবু কেমন যেন।" (বাণী-১ম, পৃ. ২৪২)। এই মেয়েটি চেয়েছে তার বরের সান্নিধ্য। একজন স্ত্রীর ক্ষেত্রে সারাদিন সংসার ও সন্তান সামলে অবসর সময়ে বরের সাহচর্যটুকু স্বাভাবিকভাবেই কাম্য। কিন্তু সেটাও যদি সে না পায়, তাহলে এর চেয়ে হতাশার আর কীইবা হতে পারে। আর স্বামীর সাহচর্য চাওয়াটা কোনও অপরাধ নয়। এটা তার পাওনা। সেটা স্বামীকে মনে করিয়ে দেওয়াটাই অপরাধ। একজন নারীকে যদি দায়িত্ব-জ্ঞানহীন স্বামী নিয়ে সংসার করতে হয় তার থেকে কষ্টের আর কী থাকতে পারে এমনই বা হবে

কেন যে, একজন স্ত্রীকে স্বামীর সাহচর্য ভিক্ষা করতে হচ্ছে? পুরুষদের টনক কেন কখনই নড়ানো যায় না। তারা কেবল নিজের ভালোমন্দটাই বোঝে। নিজের স্ত্রী সংসর্গে তৃপ্তি না পেলে তৃপ্তির অন্য পথ খুঁজতে আসক্ত হয় অন্য নারীতে, কিন্তু স্ত্রী কোনো অতৃপ্তি ভোগ করছে কিনা সেটা ভেবে দেখার মতো সংবেদনশীলতা তাদের থাকে না। বা ব্যাপারটা বুঝলেও তা নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন তারা বোধ করে না। এটা যে একটা বড় বড় মানসিক ব্যাপার সেই বোধই তাদের নেই।

হতাশা, প্রবঞ্চনা, আত্মপ্রবঞ্চনা আজকের দাম্পত্য জীবনের পরিচিত সঙ্গী। দাম্পত্যের আর একটি নমুনা হল স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে বাড়িতেই অন্য মেয়েতে লিপ্ত থাকা।"... এই সময়ে এদিকে কি হচ্ছে জানবার জন্যে মোটা গলায় হেঁকে উঠলেন ভদ্রলোক। চিত্রাও মুখ ফেরালো। দেখলাম মেয়েটা চিত্রা নয়। কিন্তু পুরুষটি? চিত্রলেখার বিয়েতে একে আমি ভালো করেই দেখেছি। হতে পারে বয়স বেড়েছে ভুঁড়ি হয়েছে, চুল কমেছে কিন্তু এ যে সেই টোপর-মালা-চন্দন-পরা একদা দোহারা শুভেন্দুশেখর যার সঙ্গে চিত্রার মালা বদল হয়েছিল তাতে কোনও ভুল নেই। দাসীটি দরজা ভেজাতে ভেজাতে নিচু গলায় বলল ''মেমসাব মা কী পাস যানে সে ঘরমেই আয়সা চলতা। বেশরম'। ঘটার দিকে সঘৃণায় ইঙ্গিত করলে সে।" (বাণী-১ম, পৃ. ১৮৭)। নারী সমস্ত কিছুকে মানিয়ে নিতে আজ অভ্যস্ত, তাই চিড় ধরেনি একমন দাম্পত্যেও। বিশ্বায়নের ফলে নারী-পুরুষ সম্পর্কে উভয়ের চাহিদা অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু বেড়ে যাওয়া চাহিদা পূরণে উভয়েই অক্ষম, এবং তার ফলেই দেখা দিয়েছে পারিবারিক সম্পর্কে শিথিলতা। তবে এই ধরনের আত্মকেন্দ্রিক, শিথিল সম্পর্কের জন্য গল্পে বা সমাজে পুরুষরা যতটা দায়ী নারীরা ততটা নয়। তাই নারীরা দাম্পত্য সুখের আশাটুকু ভুলে, সামাজিক সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে, নিজেদের গৌরব বজায় রেখে যে যার নিজের মতো করে বাঁচার পথ খুঁজে নিয়েছে।

'শতাব্দী এক্সপ্রেস' গল্পের প্রোটাগনিস্ট শাওনি ও স্বরূপ। তারাও উভয়ে উভয়কে পছন্দ করেছিল নিজেদের জীবনসঙ্গী রূপে। দুজনে দুজনকে সারাজীবন প্রেম দিয়ে যাবে এই প্রতিশ্রুতিতে তারা গাঁটছড়াও বেঁধেছিল। শাওনির মা'র স্বরূপকে ততটা পছন্দ না হওয়ায় শাওনি তার মায়ের উপর মর্মান্তিক ক্রুদ্ধও হয়েছিল। কিন্তু আজ তাদের ভালোবাসার পরিণতি এমনই যে শাওনি স্মৃতিচারণ করে যাবে, বারো বছর আগে যখন তারা গাঁটছড়া বেঁধেছিল তখন ''কত কোমল ছিল তার চাউনি। কত আদর ছিল দু হাতে। সুবিচার ছিল ব্যবহারে। স্বরূপ তখন শাওনিকে তার প্রিয় বন্ধু ভাবত। এখন? এখন ভাবে না। শাওনির সম্পর্কে তার ভাববার সময় নেই। যদি বা ভাবে তাহলে শাওনি এখন তার স্ত্রী। ঘরণী-গৃহিণী।" (বাণী-২য়, পৃ. ১৮)। শাওনির ধারণা হয়তো স্বরূপ এখন তাকে ভাবে তার মেয়েমানুষ হিসেবে। টিকে থাকা দাম্পত্য মানে কী তার পরিণতি এমনই হতে

হয়? টিকে থাকা মানে কী নাম কা ওয়াস্তে বেঁচে থাকা? ''শাওনি দিয়েছে পুষ্টিকর, রুচিকর, নিত্য নতুন খাদ্য, ধবধবে জামাকাপড় হাতের কাছে, মুখের কাচে চা, কফি, মশলা, চকচকে জুতো, বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনের জন্য আপ্যায়ন, ইদানীং দিচ্ছে ড্রিংকস নরম ও কড়া। দিচ্ছে না শুধু যান্ত্রিকভাবে নিজেকে। স্বরূপ বুঝতে চায় না প্রাণের টানে, প্রেমের টানে যে চাওয়া, সে চাওয়া চাইতে পারলেই শাওনি আছে। আছে নিবিড়, ভরাট অথৈ দিঘির জলের মতো, আছে উর্মীর মৃত্তিকার পেলব অভ্যন্তরের মতো, অনন্ত কুয়োর জলে পড়ে-থাকা চাঁদের মতো।'' (বাণী- ২য়, পৃ. ১৮-১৯)।

এখন রাতে শুতে যাওয়ার সময় ইচ্ছে করে দেরি করে শাওনি, পত্রপত্রিকা পড়ে, ডায়েরির পাতায় দু-চার কথা লিখে। কিন্তু অনেক রাতে দুজনের একান্ত শোবার ঘরে যখন সে শুতে যায়, গিয়ে দেখে ''সবুজ আলোয় মাখামাখি স্বরূপ ঘুমোচ্ছে। স্বল্প পরিসরের মধ্যেও এইভাবেই প্রথম বিচ্ছেদ সম্ভব করল শাওনি। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল কোটি-কোটি দম্পতি হয়তো এভাবেই থাকে, এভাবেই সম্ভব করে এসব। অনন্ত এতোকাল করেছে ভারতের মতো দেশে। সম্প্রতি আর করতে চাইছে না। উপায় বেরিয়েছে কিছু। একবিংশতিতে হয়তো আর কেউই এসব সহ্য করতে চাইবে না। বিশেষত সন্তানের দায় না থাকলে''। (বাণী- ২।, পৃ. ২১)।

শাওনি ভাবতে থাকে ''স্বরূপ বদলে গেছে। খুব বদলে গেছে। আগেকার প্রতিজ্ঞা সংকল্প এসব আর তাকে মনে করিয়ে কোনো লাভ নেই। সেভাবে আর ওর মনে পড়বেও না। কতকগুলো কথা মনে পড়াই তো আর মনে-পড়া নয়। তার পেছনে বা তার সঙ্গে যে আবেগ থাকে, অনুভূতির যে জটিল ঐশ্বর্য থাকে সেগুলোও মনে পড়তে হবে। নইলে নিতান্ত নিছক কতকগুলো কথার স্মৃতিতে বিশেষ কিছু নেই।'' (বাণী- ২য়, পৃ. ২১)।

স্বরূপ তাকে আদর করে যে নাম ধরে ডাকত, সেইভবে যদি এখন ডাকে সেটাকে তার ন্যাকা ন্যাকা মনে হবে। কারণ আজকাল তাকে ওই নামেই খুব রূঢ়ভাবে ডাকে। সম্পর্কের জটিলতা আজ এমন জায়গায় এসে ঠেক খেয়েছে যে তার জন্য শাওনি অফিসের বদলিটাকেও মেনে নিল। প্রস্তুত হল দিল্লি যাওয়ার জন্য। স্বরূপকে তার বদলির কথা শোনাল। শাওনি ভেবেছিল স্বরূপ এতে হয়তো একটা জোরালো প্রতিবাদ করবে, কিন্তু না স্বরূপের দিক থেকে তেমন কোনো আভাস সে পায়নি। স্বরূপ হয়তো ভেবেছিল এটা একটা সাময়িক ব্যাপার তাই, ''চুপচাপ টি.ভি. দেখা। এ.টি.এম। অবিশ্রান্ত উদরী নাচ, নিতম্ব নাচ, অবিশ্রান্ত তাল-হ্যাঁচকা খিছুড়ি গান। স্বরূপ দেখছে।'' (বাণী-২য়, পৃ. ২৪)। এরপরও শাওনি আশ্বস্ত করেছিল যে স্বরূপ অন্তত একবার বলুক ''-নি, নি তুমি কেন যাচ্ছ? কেন রাজি হলে? কেন? নি, তুমি হারিয়ে যাচ্ছ, তুমি যাবে না, যেয়ো না শাওনি, যেয়ো না নাঃ'' (বাণী-২য়, পৃ. ২৪)। না এসব কিচ্ছু হয়নি, স্বরূপ অঘোরে ঘুমিয়ে গেছে, বিয়ার-ঘুম কিংবা হুইস্কি ঘুম।

প্রেমজ বিয়ে হলেও, বিবাহ পরবর্তী স্বামী-স্ত্রীর প্রেম বাস্তবেও আজ দুর্লভ দাম্পত্যে উত্তররাগ, রোমান্টিকতা এসব কথাগুলো আজ দম্পতির দিকে তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। শব্দগুলোয় আজ অস্তিত্বের সংকট।

অবাক হই আমরা 'গৃধ্রকূট' গল্প পড়েও। সেখানে কোনও পার্থক্য নেই আড়াই হাজার বছর আগের ভদ্রা-সন্তুকের সঙ্গে আজকের বুলা-কুমারেশের। বুলাকে ভদ্রার মতো শাস্তি পেতে হয়নি কারণ সে ভদ্রার পরিস্থিতি আগে থেকেই জানত, তাই সে খুব সতর্ক ছিল। কুমারেশ চেয়েছিল গৃধ্রকূট থেকে বুলাকে ফেলে দিতে। ''নির্জন গিরিপ্রান্ত। গাছের আড়াল। কোথাও কেউ নেই। চোখে মোহ নিয়ে কুমারেশ ডাকে— ''এসো, এসো বুলা। এসো।' বুলা ঝাঁপিয়ে পড়তে যায় কুমারেশের বুকে। পরক্ষণেই একটা আর্ত চিৎকার গিলে নেয় গৃধ্রকূট। পাথরের ধাক্কা খেতে, খেতে, বাতাসে ওলট পালট হতে হতে নিচে পড়তে থাকে কুমারে। নিচে পড়তে থাকে।" (বাণী-১ম, পৃ. ১৭৬)। কিন্তু বুলা খুব সতর্ক মেয়ে তাই বেঁচে গেছে। ''বুলা তার ওড়না কোমরে গুঁজে নেয়। একবারও পিছন ফিরে তাকায় না। ও ভেবেছিল বুলা ওর বুকে ঝাঁপাতে গেলেই ও সরে যাবে। ও জানে না বুলা কত সতর্ক খেলোয়াড়।" (বাণী-১ম, পৃ. ১৭৬)। বুলা এখন উপলব্ধি করতে পারে উশ্রীতে যে বোল্ডারটার দিকে তাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল তার কারণটা কী? ওই পিচ্ছিল বোল্ডারটায় একবার পা দিলে আর রেহাই ছিল না। বুলা এখন এটাও বুঝতে পারে যে ট্রেন যখন হু হু করে ছুটছিল, তখন বারবার কেন খোলা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছিল লোকটা। স্রেফ তাকে লোভ দেখাবার জন্যে। যাতে ওর দেখাদেখি সে-ও গিয়ে দাঁড়ায়, তারপর সেই আকস্মিক দুর্ঘটনাটি ঘটে।" (বাণী-১ম, পৃ. ১৭৬)- ''চলন্ত ট্রেন থেকে দুঃসাহসিনী যাত্রিণীর পতন ও মৃত্যু" (বাণী-১ম, পৃ. ১৭৬)

বিদেশি ইলেট্রনিক্স গুডস এর লোক্যাল এজেন্ট কুমারেশ বিয়ে করেছিল খুব ধনী পরিবারের মেয়ে বুলাকে। এতোটাই ধনী যে তার বিয়ের বাজার করা হয়েছিল হংকং বাজার-নগরী থেকে। ওখান থেকে কেনা হয়েছিল বরের জন্য নাইকন ক্যামেরা, লেটেস্ট মডেলের রোলেক্স ঘড়ি, আমরস্টারডামের হিরের আংটি, সার্জিও ভ্যালেনটাইনোর শেভিং কিট, ম্যানিকিওর সেট প্রভৃতি। আর যৌতুক হিসেবে দেওয়া হয়েছিল ল্যান্সডাউনের শো রুম। ধনীর দুলালীকে বিয়ে করে সব হাতিয়ে নেওয়াটাই ছিল লোকটার উদ্দেশ্য। বুলার মনে হয় এ ক'মাসে তার বাব-মা'র স্নেহ ভালবাসা ভালই আদর করেছে লোকটা ''না হলে বাবা বিশাল খরচ করে ল্যান্সডাউনের শো-রুমটা এত তাড়াতাড়ি..." (বাণী-১ম, পৃ. ১৭৬)। শুধু তাই নয় তার উদ্দেশ্য সফল হবে ভেবে আগে-ভাগে একটা চালও খেলে রাখতে চেয়েছিল কুমারেশ। দানাপুর জংশন থেকে শান্তিনিকেতনে থাকা বাবা-মাকে যখন বুলা এসটিডি করে বলেছিলঃ্ম ''চমৎকার আছি মা। দারুণ এনজয় করছি। একদম ভাববে না।" (বাণী-১ম, পৃ. ১৭৬)। তখন ওর হাত থেকে রিসিভার কেড়ে নিয়ে কুমারেশ

বলেছিল— ''চমৎকার ঠিকই। তবে মেয়েকে সামলাবার জন্যে আপনাদের আসা উচিত ছিল মা। ট্রেনের খোলা দরজায় গিয়ে দাঁড়ানো চাই, উশ্রীর জলে কেউ চান করে না, ওর করা চাই-ই।'' (বাণী-১ম, পৃ. ১৭৬)। এটাই তার চাল।

মগধ রাজ্যের কোষাধ্যাক্ষের একমাত্র আদুরে-আবদারে সুন্দরী মেয়ে ভদ্রা। সেও এক সুন্দর চোরের মোহে পড়ে, বাবা-মা'র সম্মতি আদায় করে তাকে বিয়ে করেছিল। আর পা থেকে মাথা পর্যন্ত অলংকার ঢাকা ভদ্রার অলংকারগুলো খুলে নিয়ে তাকে গৃধ্রকূট থেকে ফেলে হত্যা করতে চেয়েছিল সম্বুক। কিন্তু ভদ্রা বুদ্ধিবলে শেষবারের মতো আলিঙ্গনের অছিলায় দুর্বৃত্ত স্বামীকে ঠেলে ফেলে প্রাণে বেঁচেছিল।

আড়াই হাজার বছরের আগেকার সম্বুকের সঙ্গে আজকের লম্পট কুমারেশের কোনও অংশে পার্থক্য নেই। লেখিকা ইতিহাসের সঙ্গে বর্তমানের কোথাও একটা মিল খুঁজে পেয়েছেন, তাই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিহাস ও বর্তমান এক হয়ে গেছে। এই ঐতিহাসিক গল্পই বুলাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। আড়াই হাজার বছর। অনেকটা সময়। তারপর বদলে গেছে অনেক কিছুই, বদলায়নি শুধু লোকটির স্বভাব।

লেখিকা এ বিষয়ে তাঁর একটা অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছেন। কলকাতার এক বিখ্যাত কলেজের অধ্যক্ষার মেয়ের বিবাহিত জীবনের কাহিনি। মেয়েটি নিজেও অধ্যাপিকা ছিলেন। প্রথমবার বিয়েটা তাঁর ডিভোর্স হয়ে যায়। দ্বিতীয়বার একজন অধ্যাপককে বিয়ে করেন এবং তাঁর পরামর্শে অসুস্থ বোনের গলায় বিষ ঢেলে হত্যা করেন, সবটাই সম্পত্তির জন্য। তার জন্য অবশ্য মেয়েটি জেল খাটছেন মুক্তি পাবেন না কোনো দিন, ছেলেটি মুক্তি পেয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার তো কিছুই হল না। সে এখন সমস্ত সম্পত্তি ভোগ করছে। এই হল পুরুষ চরিত্র। (ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার)।

'নাগিনা' গল্পের নাগিনাও অনেক চেষ্টা করে বাঁচিয়ে রাখতে পারল না তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতাকে। নাগিনা তার স্বামী সনাতনের দুঃখ-দারিদ্র্যের সংসারকে সুন্দর করে সাজিয়ে তুলে সেখানে নতুন প্রাণের হিল্লোল এনেছিল। কিন্তু পাড়া-প্রতিবেশী ও তার স্বামী সনাতনের বন্ধুরা এই সুখ সহ্য করতে পারেনি। তারা সনাতনের মনকে বিষিয়ে দেয় তার স্ত্রী সম্পর্কে নানান কুপ্রসঙ্গে শুনিয়ে। আর সনাতন নিজের স্ত্রীকে বিশ্বাস না করে সেই প্ররোচনায় পা দিল। এবং দিনের পর দিন চালালো স্ত্রীর উপর অত্যাচার। স্ত্রী বহু সহ্য করার পর অবশেষে প্রতিবাদী হয়ে ভয়ঙ্কর নাগিনা রূপ ধারণ করল।

নাগিনা একজন নিম্নবর্ণের মহিলা। তার সঙ্গে উচ্চবর্ণের মহিলারা কোনো পার্থক্য পাওয়া গেল না। এখানেও সেই কোনো না কোনো ভাবে তৈরি হল দাম্পত্য দূরত্ব। নাগিনা যে উল বুনে সৎ পথে পয়সা উপার্জন করত সেটা তার নিন্দুক সমাজ মেনে নিতে পারল না। এখানে একটা আত্মসম্মান বোধের হানির কথাও উল্লেখ করেছেন লেখিকা। একজন পুরুষ কীভাবে সহ্য করবে যে তার স্ত্রী পয়সা রোজগার করে সংসারে উন্নতি করছে?

এই অপমান তাদের কাছে অসহনীয়। পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি যাই হোক না কেন আসলে যেটা ঘটল সেটা তো দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে ফাটল। এখানে 'শতাব্দী এক্সপ্রেস'-এর নায়িকার সঙ্গে নাগিনার কোনো তফাৎই নেই।

আমাদের রোজকার জীবনে নারীদের অনেক কাহিনী শোনা যায়। তার মধ্যে থাকে তাদের অসুখী দাম্পত্যের কথা। খবরের কাগজেও যা আজ অতি পরিচিত ছবি। এইসব কিছুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাণী বসুও তাঁর গল্পের চরিত্রের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন নানানরকম অসুখী দাম্পত্য, যা সমসাময়িক বাঙালি সমজেরই প্রতিচ্ছবি।

**সহায়ক গ্রন্থাবলী ঃ**


১. বঙ্গনারী, আধুনিকতার অভিমুখে বঙ্গনারী, ডঃ সুনীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ (প্রকাশন বিভাগ), অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, জুলাই ২০০৫।

২. ১ম বাণী, গল্প সমগ্র, প্রথম খণ্ড, বাণী বসু, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., দ্বিতীয় মুদ্রণ জানুয়ারী ২০০৮।

৩. ২য় বাণী, গল্প সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, বাণী বসু, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০৫

৪. ৩য় বাণী, গল্প সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, বাণী বসু, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ২০০৭

৫. যখন- বাণী, বাণী বসু, আনন্দ, তৃতীয় মুদ্রণ জানুয়ারি, যখন চাঁদ এবং ২০০৮

৬. ভারতবর্ষ স্বাধীনতার, আদিত্য মুখার্জি, আশীষ, মৃদুলা মুখার্জী (অনু.), বিপানচন্দ্র লাহিড়ী, ২০০০, পরে, ১৯৪৭, প্রথম আনন্দ সংস্করণ ২০০৬

৭. সাত দশক, সমকাল ও আনন্দবাজার, আনন্দবাজার পত্রিকা সংকলন। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা-৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০০৫

৮. নারী, হুমায়ুন আজাদ, আগামী প্রকাশনী, তৃতীয় সংস্করণ নারী, পঞ্চদশ মুদ্রণ আগস্ট, ২০০৮।


**সহায়ক পত্রপত্রিকা ঃ**


১. 15/06/09 The Times: The Times of India, June 15, 2009. http://timesofindia.indiatimes.com/cities/shiney-Ahuja-detained-on-rape-charges-/articleshow/4656185.com

২. আনন্দ অনুঃ/০৬/১৬, ১৬ জুন ২০০৯। আনন্দবাজার পত্রিকা। দেশ। http://www.anandabazar.com/archive/1090616/16desh5.htm

৩. আনন্দ অনঃ/১১/৩ ৩ নভেম্বর ২০০৯। আনন্দবাজার পত্রিকা। উত্তরবঙ্গ। http://www.anandabazar.com/archive/1091103/3uttar2htm

৪. আনন্দ অনঃ/১১/৭ ৭ নভেম্বর ২০০৯। আনন্দবাজার পত্রিকা। কলকাতা। http://www.anandabazar.com/archive/1091107/7cal3htm

৫. ১০ আনন্দ অনঃ১/৮ ৮ জানুয়ারী ২০০৭। আনন্দবাজার পত্রিকা। দক্ষিণবঙ্গ। http://www.anandabazar.com/india/Dress-code-cannot-be-forced-upon-women-teachers-HC/articleshow/
৬. ৭আনন্দ অনঃ/১/৯ ৯ জানুয়ারী ২০০৭। আনন্দবাজার পত্রিকা। প্রথম পাতা। http://www.anandabazar.com/archive/1070109/9raj.htm
৭. ৩ আনন্দ/৩/২২ ক্রোড়পত্র। শেষ দশক। আনন্দবাজার পত্রিকা। ২২ মার্চ ২০০৩।
৮. এবং মুশায়েরাঞ্জ সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা। শারদীয় ১৪১৩। গল্প ও গল্পকার সংখ্যা। সম্পা. সুবল সামন্ত।
৯. গর্ভধারিণী। প্রতিদিন। রোববার, ৭ মার্চ ২০১০।
১০. চালচলনের পালাবদল ঞ্জ দেশ। ৪ মে-২০০১।
১১. জাগো মহিলা ঞ্জ সৌমিত্র চক্রবর্তী, জাগো মহিলা। বাণী ছোট গল্পে বাণী বসু, বাণী বসু সংখ্যা। দ্বিতীয় বর্ষ। দ্বিতীয় সংখ্যা, শারদীয়া ১৪০৪, সম্পা. যূথিকা চট্টোপাধ্যায়
১২. নতুন বাঙালি, একুশ আনন্দবাজার পত্রিকা, জানুয়ারি ২০০১
১৩. শতকের বাংলার মুখ, বাঙালির মনঃ নতুন সহস্রাব্দঞ্জ বার্ষিক সংখ্যা। দেশ। 'নতুন সহস্রাব্দে বাঙালির জীবনযাত্রা ১৮ ডিসেম্বর ২০০২।
১৪. ভগ্নমুখ সমাজ, দেশ, ৭ মার্চ ১৯৯৮
১৫. শেকড়ছেঁড়া মন ঞ্জ সানন্দা ঞ্জ পার্বণী বিশেষ রচনা ৪। গল্প লেখার গল্প। সানন্দা। বার্ষিক সংখ্যা। ২০০৭।

**বাংলার মুখ প্রকাশিত**

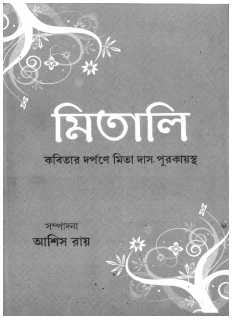


**মিতালি**
**কবিতার দর্পণে**
**মিতা দাস পুরকায়স্থ**
**সম্পাদনা - আশিস রায়**
**মূল্য : ২০০ টাকা**

সৃষ্টিসুখের কোনো উল্লসিত প্রভাতে নিষাদের হাতে ক্রৌঞ্চের নিহত হওয়ার খবরে আদি ঋষির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ প্রাচ্য বাণীমন্দিরে আনল প্রথম কবিতার আভাস। তারপর তার যাত্রা কেবলই এগিয়েছে উত্তর কালের দিকে। কেউ পেয়েছে বাণীভারতীর বরমাল্য, সমৃদ্ধি এসেছে দ্বারে। কেউ হারিয়ে গেছে কালচক্রের নিচে, বিস্মৃতির অন্ধকারে। তবু যাত্রা থামেনি। সেই যাত্রা পথে আমরা পেয়েছি মিতা দাসপুরকায়স্থর মতো এক নিভৃত সাধনার কবিকে। আমরা মগ্ন হয়েছি তাঁর কবিতায়। এখন সম্পাদক আশিস রায় ২৪টি প্রবন্ধের সমৃদ্ধ বাসর বুনে দিলেন দু'মলাটের মাঝে, যার সবকটি আরও ব্যাপক ভাবে, আরও নিবিড় ভাবে চিনিয়ে দেয় মিতার কাব্যলোককে। আপামর বাঙালি পাঠকের কাছে এও এক নতুন পাওয়া। সময়ের বিচারে কিছুটা আলাদ পথ ধরে হাঁটা এই গ্রন্থ।

# ‘তালনবমী’ : এক স্বপ্নভঙ্গের আখ্যান

**সুশান্ত মণ্ডল***

‘‘রুটি যখন অনেক দূর, নীল আকাশের চাঁদ
সোনা, তুই জন্মালি এই দেশে।
ওরে মানিক, পরান ভরে রুটির জন্য কাঁদ।’’

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘রুটি যখন অনেক দূর’ কবিতাটিতে জননীর কণ্ঠে ব্যক্ত হয়েছে এই অশ্রুঝরা উক্তিটি। এর থেকে ভারতবর্ষের হত দরিদ্রের চিত্রটি উঠে আসে আমাদের মানসপটে। আসলে ভারতবাসী একে একে দেখলো দুই বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দুর্ভিক্ষ ও দেশ বিভাগ। ফলে ভারতবর্ষের মধ্যবিত্ত থেকে দরিদ্রদের জন্য রইল অনাহার, স্বপ্নভঙ্গ আর স্বপ্নভঙ্গ জনিত অশ্রুজল। এই সমস্ত বিষয়গুলি লেখকের রচনায় উপাদান হয়ে বারবার উঠে এসেছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও তার ব্যতিক্রম নন। তাঁর লেখাতে দক্ষিণ বাংলার নদীমাতৃক দেশের গ্রাম্য জীবনের গরীব মানুষের সরল দারিদ্র্য পীড়িত জীবন ফুটে উঠেছে। তাঁর ‘‘তালনবমী’’ এমনই একটি গল্প। যেখানে গ্রামের মানুষগুলি ক্ষুধার যন্ত্রণায় ‘পূর্ণিমার চাঁদ’ ‘ঝলসানো রুটি’ দেখে। আর ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে গুলি স্বপ্ন দেখে - অন্য কিছু নয়, পেট ভরে খাওয়ার স্বপ্ন। এতো আমাদের দরিদ্রের ঘরের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

এ প্রসঙ্গে কামাক্ষী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের একটি কবিতার কথা মনে পড়ে -

‘‘আশাভঙ্গের রঙ ভাদ্র শেষ পশ্চিমের আকাশে
সব শূন্য একাকার।
বুদ্বুদের মতো শুধু ভাসে
নানান চোখের স্মৃতি।
জল ভরা টলটলে
বৈশাখের বুক খাঁ খাঁ।’’

-(কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় / ‘মহুয়ার রাত’)

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘তালনবমী’ গল্পটি ১৯৪৪ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে রচিত। গল্পটির শুরুতে আমরা ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যকে পাই। তার দুই ছেলে বারো বছরের নেপাল ও দশ বছরের গোপাল এবং স্ত্রীকে নিয়ে, সামান্য জমিজমা আর দু-চার ঘর শিষ্যের বাড়িতে পুজো-আচ্চা করে তিনি কোনরকমে দিন যাপন করেন। ভাদ্র মাসের বর্ষায় পনেরো দিন ধরে অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছে। তাই তারা অনাহারে কখনো

*ছাত্র, এম. এড., রামকৃষ্ণ মিশণ শিক্ষণমন্দির।

আধপেটা খেয়ে দিনকাটাচ্ছে। কিন্তু স্বপ্ন দেখে-

> ''ভাদ্রের শেষে আউশ ধান চাষীদের ঘরে উঠলে তবে আবার কিছু ধান ঘরে আসবে, ছেলেপুলেরা দুবেলা পেট পুরে খেতে পাবে।[১]

কিন্তু নেপাল গোপালের পেট মানে না তারা 'অন্ন চায় প্রাণ চায়'। এক মুঠো ভাত খেয়ে বাঁচতে চায়। তাই একটি ছিপ চাঁচতে চাঁচতে গোপাল নেপালকে মায়ের কাছে থেকে খাবার চাইতে বলে, কিন্তু নেপাল রাজি হয় না কারণ সে জানে তাদের ঘরের অবস্থা। এমন সময় তাদের দেখা হয় অবস্থাপন্ন শিবু বাঁড়ুজ্যের ছেলে চুনির সঙ্গে। তার কাছ থেকে তারা জানতে পারে - আসন্ন মঙ্গলবার তালনবমীর ব্রত উপলক্ষ্যে তার মা গেছে জটিপিসিমার বাড়িতে। এ খবর শুনে নেপাল -গোপাল খুব খুশি হয়। কারণ তারা ভাবে চুনিদের মতো তারাও নিমন্ত্রিত হবে। এই বিষয়ে নিয়ে দুই ভাই এর মধ্যে নানা জল্পনা কল্পনা চলে। দুই ভাইয়ে যুক্ত করে জটিপিসিমাকে তালদীঘি থেকে তাল এনে দেওয়ার কথা ভাবে যাতে তালনবমীতে নিমন্ত্রিত হয়। তবে গোপালের ধারণা, দাদা যদি জটিপিসিমার কাছ থেকে তালের দাম নেয় তাহলে তালনবমীতে নিমন্ত্রিত নাও পেতে পারে। তাই তালনবমীর আগের দিন - ''খুব ভোরবেলা উঠে গোপাল দেখলে বাড়ীর সবাই ঘুমিয়ে। কেউ তখনো ওঠে নি। রাত্রের বৃষ্টি থেমে গিয়েচে, - সামান্য একটু টিপ টিপ বৃষ্টি পড়চে। গোপাল একছুটে চলে গেল গ্রামের পাশে সেই তালদীঘির ধারে। মাঠে এক হাটু জল আর কাদা।''[২]

গ্রামের উত্তর পাড়ার চাষি গণেশ কাওরা তাকে দেখে সাবধান করে দিয়ে জানায় দিঘির পাড়ে সাপের ভয়ের কথা। তা সত্ত্বেও গোপাল দুটি তাল কুড়িয়ে সকাল সকাল হাজির হয় জটিপিসিমার বাড়িতে। সে বিনা পয়সাতে তাল দিয়ে বাড়ি ফিরে আসে, তাই তার দাদা শুনে অসন্তোষ হয়। কারণ একটা পয়সা পেলে দুজনে মুড়ি কিনে খেতে পারতো।

পরদিন মঙ্গলবার গোপালের উত্তেজনায় রাতে ঘুম আসে না। সে জানলা দিয়ে বাইরে বড় বকুল গাছটার দিকে চেয়ে কত কি ভাবতে থাকে - তালনবমীর নিমন্ত্রণে জটিপিসিমার বাড়িতে সে কত কি খাচ্ছে। কাঁকুড়ের ডালনা, মুগের ডাল, তিল পিটুলি ভাজা, পায়েস, আর তার দেওয়া তালের তালবড়া আরও কত কী। এশুধু স্বপ্ন নয়, প্রতীক্ষাও। তার প্রতীক্ষা, তার উৎকণ্ঠা, সব কিছু ছাপিয়ে গল্পটিতে সারাক্ষণ বেজে যাচ্ছে বর্ষার দিনের ঝমঝম শব্দ। সকালে মায়ের কাছে থেকে গোপাল জানতে পারে জটিপিসিমা সবাইকে বলেনি, বেছে বেছে গ্রামের অবস্থাপন্ন মানুষদের বলেছে। তাই গোপালদের নিমন্ত্রণ হয় নি। গোপাল তখন ঝাপসা চোখে দেখে পাড়ার হারু-হিতেন-দেবেন জটিপিসিমার বাড়ি চলে যেতে। সেই সঙ্গে গোপালের স্বপ্নও যেন কোথায় বর্ষার জলে হারিয়ে যায়। এই দুঃখের কি তুলনা আছে?

একটি গ্রামের সাধারণ পরিবারের মধ্যে দিয়ে বিভূতিভূষণ আমাদের ভারতবর্ষের সেই চিত্রটি তুলে ধরেছেন। যেখানে আজও বহু মানুষ খালি পেটে শুধু স্বপ্ন দেখে, দু'মুঠো খেয়ে

পরে বাঁচার। এই স্বপ্ন দেখা কি তাদের অন্যায়? তারা শুধু গরীব বলে তাদের আছে বুকভরা ভালোবাসা, আর আছে স্বপ্ন ভঙ্গের অশ্রুজল। তাই গোপাল আর কেউ নয় আমাদেরই ঘরের ছেলে।

এ প্রসঙ্গে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আমার ভারতবর্ষ' কবিতাটিতে স্বরণীয়-

''আমার ভারতবর্ষ
পঞ্চাশ কোটি নগ্ন মানুষের
যারা সারাদিন রৌদ্রে খাটে, সারারাত ঘুমুতে পারে না
ক্ষুধার জ্বালায়, শীতে।''

-(বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় / 'আমার ভারতবর্ষ)

প্রাবন্ধিক দিগন্ত মল্লিক তাঁর 'ছোটোগল্পকার বিভূতিভূষণ' প্রবন্ধে লিখেছেন-

''আদিম জৈবতার গল্প লেখেননি বিভূতিভূষণ। বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনপটে আপাত তুচ্ছের মধ্যে গভীর জীবনসত্যকে তিনি আবিষ্কার করেছেন। দরিদ্র, দুঃখ ও তুচ্ছতার মধ্যে যাদের জীবন চালিত হয়েছে বিভূতিভূষণ তাদেরকেই তুলে এনেছেন তাঁর গল্পে।''[৩]

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাধারণ ভাবে 'প্রকৃতির শিল্পী' বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। কারণ তাঁর রচনায় প্রকৃতি একটা বড় ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর এর ফলে গ্রাম বাংলার মানুষকে গ্রাস করে নিয়েছিল। তাদের পেটের জ্বালা বিভূতিভূষণকে অস্থির করে তুলেছিল। তাই প্রভৃতি প্রেমিক হয়েও দারিদ্র্য ও স্বপ্ন ভঙ্গ তাঁর কলমে চলে এসেছে ঘুরেফিরে। তাঁর 'পথের পাঁচালী' (১৯২৯) তে পিতা হরিহরকে উঞ্ছবৃত্তি করতে দেখি। অপু-দুর্গার জীবনের সামান্যতম আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্তি ঘটেনি। সর্বজয়া পুত্র কন্যার জন্য কোনো স্বপ্নও দেখতে পারেননি এবং বিনা চিকিৎসায় দুর্গার মৃত্যু হয়। এই ধারাবাহিকতা চলে' অপরাজিতা' (১৯৩২) উপন্যাসেও। সেখানে তিরিশের দশকের অর্থনৈতিক সংকট, বিশ্বব্যাপী মন্দা, নৈতিকবোধের অবক্ষয় ফুটে উঠেছে। তাঁর বহু ছোট গল্পে দরিদ্র ও স্বপ্নভঙ্গ রামধনুর সাত রঙের মতো মিলেমিশে আছে। কি 'মৌরিফুল' কি 'শান্তিরাম' কি 'পুঁইমাঁচা' প্রভৃতি গল্পের কথা উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে। 'তালনবমী' ও আর একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্তর। এ প্রসঙ্গে বন্দনা মিত্র লেখেন-

''তার গল্প সাধারণ পথচলিত জীবনকে অনুসরণ করে চলে, গল্পগুলির পরতে পরতে অসহায়, সাধারণ, দুর্বল মানবজাতির প্রতি অগাধ ভালোবাসা ন্যস্ত হয়ে আছে। বিশেষ করে করুণ অসহায় স্নেহ ভালোবাসাকে কি যে মমতার সঙ্গে, কি যে সংক্ষিপ্ত কটি রেখাচিত্রে, কি যে 'ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট' নৈর্ব্যক্তিকতায় ফুটিয়ে তুলেছেন - এই গল্পগুলি একান্ত ভাবে বাঙালি, আবহমান বাংলার গ্রামচিত্র।''[৪]

আসলে বিভূতিভূষণ গ্রাম বাংলার সহজ সরল জীবনকে তুলে ধরেছেন রঙ তুলির সাহায্যে। সেই কারণে মানবিক সত্যের উন্মোচন ঘটে তাঁর বেশিরভাগ গল্পেই। সরোজ

বন্দ্যোপাধ্যায় এর মতে-

''বিভূতিভূষণের গল্পের বিষয় প্রধানত সাধারণ মানুষ। তাদের নিয়ে যে 'গল্প' হয় সেটা অভাবনীয়। কিন্তু বিভূতিভূষণের হাতে পড়লে শুধু যে গল্পের বিষয় হয়ে ওঠে তাই নয়, তারা জীবন ভাষ্যেরও বিষয় হয়ে ওঠে।....

বিভূতিভূষণ তাঁর বিস্তৃত গ্রামীণ অভিজ্ঞতার সাহায্যে এই সাধারণেও এনেছেন বহুধা বৈচিত্র্য। আমরা ভুলতে পারিনা 'তালনবমী'-র সেই ছেলেটিকে (গোপালকে)।''[৫]

গোপাল স্বপ্ন দেখতে জানে। পেট ভরে খাওয়ার স্বপ্ন। স্বপ্ন ভঙ্গের ব্যথা পায়। কিন্তু সে স্বপ্ন দেখতে কি ভুলে যাবে? তার পেট কি তাকে ভুলতে দেবে? আমাদের তা মনে হয় না।

**তথ্যসূত্র :**


১. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থ বিভূতি গল্প সমগ্র, (প্রথম খণ্ড)। সুন্দর প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১লা বৈশাখ, ১৪২১, পৃ. ৪৯৭

২. তদেব, পৃ. ৪৯৯

৩. তবু একলব্য পত্রিকা, দিগন্ত মল্লিক, ছোটোগল্পকার বিভূতিভূষণ গ্রন্থ সামান্যের মধ্যেই অসামান্যের চিত্রকর, ষষ্ঠ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৪১৭, পৃ. ৫৩

৪. দিবারাত্রির কাব্য, দ্বাবিংশ বর্ষ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, ২০১৪, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা, বন্দনা মিত্র : বাংলা ছোটোগল্পে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৩৮০।

৫. দিবারাত্রির কাব্য, দ্বাবিংশ বর্ষ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, ২০১৪, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : গল্পকার বিভূতিভূষণ, পৃ. ৩২৯।



## এবং প্রান্তিকের বই-

### না প্রেমের কবিতা

**সুজয় সরকার**

আদবখেকো বেড়ালের মত যে কবিতা জন্মায় তারা বড্ড বেশি কোলকাতুরে, পাতিকাক ভোরে কুয়াশায় ভেজা প্রেম গায়ে মেখে টুপটাপ ঝরে পড়ে যে অক্ষরেরা, তারা কোনদিনই আগুন অক্ষর নয়। কিন্তু সময়ের খড়কুটো দিয়ে নিজস্ব বসত গড়ে তুলেছে যে 'আগুন পাখি' তার নাম 'না প্রেমের কবিতা' বিশ্বাসহন্তা পৃথিবীর চোখে চোখ রেখে প্রশ্নের পসরা সাজিয়েছেন সুজয় সরকার আর সেই প্রশ্ন প্রতিপ্রশ্নের এক অনন্য সৃষ্টি 'না প্রেমের কবিতা'।

**মূল্য : ৪০ টাকা**

# জীবনানন্দ দাশ এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কাব্যভাবনায় ঐক্য ও বৈপরীত্য

**সন্দীপকুমার মণ্ডল***

> 'সুধীন্দ্রনাথ আজকাল কবিতা লেখা একদম ছেড়ে দিয়েছেন। এই কবির প্রতিভা এবং আন্তরিকতা এঁর নিজের জিনিস।... তিনি আধুনিক বাংলাকাব্যের সবচেয়ে বেশি নিরাশাকরোজ্জ্বল চেতনা। ... এ সব কবিতা ('উত্তরফাল্গুনী') হঠাৎ পড়লে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে অন্তর্যামী শিষ্যের লেখা, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে জোর করে এড়িয়ে যাওয়ার ঝোনো তাগিদ নেই সুধীন্দ্রনাথের( তাঁর কবিতা এত সহজভাবে বাংলা কবিতার ঐতিহ্যপথে চলেছে যে, খুব স্বাভাবিকভাবেই তা কবিসার্বভৌমের পরিধি অতিত্র(ম করে সুধীন্দ্রীয় কাব্য---নৈর্ব্যক্তি(ক ও ব্যক্তি(কেন্দ্রিক।'
>
> ----উত্তররৈবিক বাংলা কাব্য
> কবিতার কথা/জীবনানন্দ দাশ

সুধীন্দ্রনাথ তাঁর '*স্বগত*' (১৯৩৮) প্রবন্ধ গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছিলেন 'তৎসত্ত্বেও আমার কাব্যজিজ্ঞাসা আপাতত দেহাত্মবাদী( এবং সে-দেহাত্মবাদে অন্যায় আস্ফালন নেই বটে, কিন্তু তার প( পাত আমার নিজের কাছেও সুপরিস্ফুট। অথচ মত পরিবর্তনে অপারগ। কারণ মন আনুমানিক সামগ্রী( তার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ যেমন দুষ্কর, তার অতনু সত্তাও তেমন কষ্টকল্পনা( এবং মানুষমাত্রেই যদিচ কালেভদ্রে সঙ্কল্পের আভাস দেয়, তবু সে সঙ্কল্পের অনন্য প্রকাশ অঙ্গ সঞ্চালনে।'[১] সাহিত্য বিচারে স্পষ্ট দু'টি যে ধারার পরিচয় লাভকরা যায় নিঃসন্দেহে দেহাত্মবাদী সমালোচনা (Objective Criticism) ধারা তার অন্যতম— সুধীন্দ্রনাথ কাব্যালোচনায় সেই ধারাকে মান্য করেন। অপর ধারা ভাবাত্মাবাদী (Subjective Criticism)। দু'টি ধারার মধ্যে প্রকট বৈপরীত্য থাকলেও নিবিড় সম্পর্কও অনস্বীকার্য। সুধীন্দ্রনাথের দাবি যতটাই তাঁর কাব্যভাবনাকে 'দেহাত্মবাদী' বলে ঘোষণা ক(কনা কেন—তিনিই '*স্বগত*' গ্রন্থের ভূমিকায় আবার এ কথাও ঘোষণা

*বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়।

করেছেন

> 'কাব্যে তথা বৈদগ্ধ্যে, উভয়ই, কীটস্ প্রশংসিত নিরাসক্তি( বা নেগেটিভ কেপেবলিটি ত্রি(য়াশীল( এবং এই ঐক্য সত্ত্বেও, উত্ত( শক্তি( যে কালে নিষেধাত্মক, তখন হৃদয়বান কবি স্বকীয়ভাববিলাস হারিয়ে স্বাভাবিক বস্তুনিষ্ঠায় পৌঁছান, আর বুদ্ধিমান সমালোচক নিজের বিদ্যাভিমান ভুলে সংত্র(ামক চিত্তপ্রসাদে তলান।'[২]

তখন বুঝতে পারা যায় কাব্যের বিষয় তাঁর কাছে অনাদৃত থাকেনি। এখানে কাব্যভাবনা তথা কাব্যালোচনায় সুধীন্দ্রনাথের স্ববিরোধিতা ল(ণীয় হয়ে ওঠে। দেহাত্মবাদী ধারণায় আলোড়িত থাকলেও সুধীন্দ্রনাথের কাছে—কাব্য কবির পূর্বপু(ষ এবং কবি কাব্যের জন্মদাতাও নয়। ফলত তিনি এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, 'প্রথম কবিতার আর্বিভাব হয়েছিল কোনো ব্যক্তি( বিশেষের মনে নয়, একটা মানব গোষ্ঠীর মনে, প্রথম কবিতার প্রসার শুধু একটি মানুষের উপর নয়, সমগ্র জীবনের উপরে( প্রাথমিক কবিতার উদ্দেশ্য শুধু বিকলন নয়, সঙ্কলন।'[৩] সুধীন্দ্রনাথের এমন ধারণা বা মতের সঙ্গে তথাকথিত আধুনিক কবিতার উৎসগত ধারণার সঙ্গতি সন্ধান আপাত দু(হ সন্দেহ নেই। যদিও সুধীন্দ্রনাথ স্বীকার করেন যে এই ধরনের ধারণায় একটা পূর্ণচ্ছেদ পড়েছে। সুধীন্দ্রনাথ কাব্যের 'বি(ম্বের মূর্তি'র এই পরিবর্তনে যা 'অধঃপতনের' দিকে অগ্রসর—সেখানে আধুনিক কবিদের ভূমিকাকে তিনি দায়ী করেন না। বরঞ্চ তাঁর কাছে শ্রদ্ধালাভ করেছে আধুনিক কবিতা ও কবি। সময়ের সাথে সাথে সভ্যতার যে ত্র(মোন্নতি ঘটে চলেছে সেখানেও তাঁর বি(্বাস—একরকম দুঃসাহসে ভর করে আধুনিক কবিরা 'সৌন্দর্যের দরজা আগলে' আছেন। এখান থেকেও মনে করা যেতে পারে তিনি কবিতার কাছে আদিকাল থেকে আধুনিক সময় পর্যন্ত সৌন্দর্যকে প্রত্যাশা করেছেন।

সুধীন্দ্রনাথের '*কাব্যের মুক্তি(*'* (১৯৩০) প্রবন্ধটি তাঁর কাব্যভাবনার বিশেষ কতকগুলোদিককে সুস্পষ্ট করে। কবিতা সৃষ্টিতে কল্পনাশক্তি(র ভূমিকা কতটা কিংবা কল্পনাশক্তি( কি এ বিষয়ে যদিও সবিস্তার আলোচনায় তিনি প্রবৃত্ত হননি ঠিকই কিন্তু 'কল্পনাশক্তি(' যে কবিতা সৃষ্টিতে প্রাসঙ্গিক তা তিনি মান্য করেছেন। এই প্রবন্ধে উল্লিখিত সুধীন্দ্রনাথের কতকগুলি উক্তি(তে তাঁর কাব্যভাবনার রূপরেখা লাভ করা যাবে।

> ১. 'অবশ্য তার মানে এ নয় যে সকল কবিই মহাকালের ত্রী(তদাস। কিন্তু অতঃপর এ-কথা নিশ্চয়ই বলা চলে যে

শুধু উন্মুল কবিতাই জাগতিক আকর্ষণের অবাধ্য( এবং সে-রকম কাব্য হয়তো বা পিরামিডের আওয়াতায় মৃত্যুকে ফাঁকি দেয়, তার সাহায্যে মানুষের কৌতূহল যদিও বা মেটে, তবু আত্মার অব্যক্ত( জিজ্ঞাসা তার কাছে কোনো সদুত্তর পায় না।'

২. 'কবির কর্তব্য তার প্রতিদিনের বিশৃঙ্খল অভিজ্ঞতায় একটা পরম উপলব্ধির মাল্যরচনা। কবির উদ্দেশ্য তার চারপাশের অবিচ্ছিন্ন জীবনের সঙ্গে প্রবহমান জীবনের সমীকরণ। কবির ব্রত তার স্বকীয় চৈতন্যের রসায়নে শুদ্ধ চৈতন্যের উদ্ভাবন। বৈরাগ্যের দ্বারা, ত্যাগের সাহায্যে, আভিজাতিক মর্যাদাবোধের নির্দেশে এ সাধনায় সিদ্ধি পাওয়া যায় না—কাব্যের মুক্তি( পরিগ্রহণে( এবং কবি যদি মহাকালের প্রসাদ চায়, তবে শূচিবায়ূ তার অবশ্য বর্জনীয়, তবে ভুক্ত(াবশিষ্টের সন্ধানে ভি( াপাত্র হাতে নগর পরিত্র(মা ভিন্ন তার গত্যন্তর নেই।'

৩. 'কাব্যের পথে উল্লঙ্ঘন চলে না সেখানকার প্রত্যেকটি খাত পদব্রজে তরনীয়, প্রত্যেকটি ধূলিকণা শিরোধার্য, প্রত্যেকটি কন্টক রক্ত(পিপাসু( সেখানে পলায়নের উপায় নেই, বিরতির পরিণাম মৃত্যু, বিমুখমাত্রেই অনুগামীর চরণাহত।'

৪. 'সাহিত্যে অকৃত্রিমতার মানে প্রত্য( দর্শনের সঙ্গে প্রচ্ছন্ন অভিভাবের পরিণয়। এই কথাকেই আরও সহজে বলা যেতে পারে যে কবি যখন কোনও দুষ্টবস্তু বা অনুভূত ভাবের মুখপাত্র, তখন তার কবিতা শুধু সেই বস্তু বা সেই মনোভাবের আধারে আবদ্ধ থাকবে, লোকাচার হিসাবে তাদের দাম জানতে চাইবে না।...কাব্যে অকপটতার এই ব্যাখ্যা যাঁদের কাছে আধ্যাত্মিক ঠেকবে, তাঁরা যেন ভুলে না যান যে একটা লোকোত্তর পটভূমি না জুটলে, কবি তো কবি, খুব স্থূল অনুভূতির মানুষও বাঁচে না।'

৫. 'কবি ঘটকের মতো পাত্রী-পাত্রীর মিলনেই তার উপকারিতার শেষ( তার পরে তার নাম করেও স্মরণে রইল বা না রইল, তা নিয়ে মাথা ঘামানো হাস্যকর। কিন্তু এ-মিলনসাধনের জন্যে অসাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনা চাই, এমন কি

খানিক বোধও হয়তো অনাবশ্যক নয়।'

৬. 'ভাষা, ভাব আর ছন্দ, এই তিনের সন্নিপাতে কাব্য গড়ে ওঠে। ভাষা ও ভাব সম্বন্ধে কোনও রকম পূর্বসংস্কার পোষণীয় নয়( এবং আধুনিক ত(ণদের মতো তারাও মিলন ব্যাপারে কর্তৃপ(ের হিতোপদেশ মানে না বলে আবেগসৃষ্টিই যখন তাদের ধর্ম, তখন স্বয়ংবর প্রথার পুনঃপ্রচলন অত্যাবশ্যক।'

৭. '....ছন্দ আর মিল এক জিনিস নয়( মিল কাব্যের অপে(াকৃত নতূন অলঙ্কার, ছন্দ অনাদি। কাব্যের জন্ম বৃত্তান্তের তদন্তে নেমে আমরা বুঝেছিলুম যে আবেগের সঙ্গে ছন্দের সংমিশ্রণেই কাব্যের উৎপত্তি।

৮. 'ছন্দ আর আবেগ যমজ, তাদের টান নাড়ির টান( আবেগ আর বেগ বিষমার্থবাচক, আবেগের মধ্যে বেগের চেয়ে বিরামই বেশি।... ধ্বনি ও যতির এই সুব্যবস্থিত নক্সাই বোধহয় ছন্দ( এবং ছন্দের এই সংজ্ঞা সমীচীন হলে, গদ্য-পদ্যের সীমাসন্ধি অনিশ্চিত।'

৯. 'বস্তুত আলঙ্কারিক যাকে ছন্দ বলে, সে একটা যান্ত্রিক কৌশল মাত্র( সেই নাগরদোলায় ঘূর্ণি লেগেই আমাদের মন অনেক সময়ে কবিতা বিশেষের মধ্যে ভাব ও আবেগের অভাব দেখতে পায় না।'

১০. 'কাব্য কেবল তখনই অমর-পদবাচ্য, যখন তার সন্ধান প্রতর্ক ছাড়িয়ে পৌঁছায় প্রমিতিতে।'

সুধীন্দ্রনাথের কাছে আর্টে ব্যক্তি(বাদ অচল। কেননা, 'ব্যক্তি( যখন বি(ে-মানবের মধ্যে নিঃশেষে ডুবে যায়, তখনই পিঞ্জরিত ব্যক্তি( স্বরূপ পায় মুক্তি(।'[৫] তিনি মনে করতেন যে, নিরাসক্ত(আত্মবিলোপই---আর্টের কাঙি(ত, কবির কাছে কাঙি(ত। যখন তিনি ঘোষণা করেন 'কাব্য সমুদ্রের মতো, এবং কবি নদীমাত্র।' তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, কবিকে বিশেষ একটি দিকে অগ্রবর্তী হতে হয় এবং 'নদীর মতো আত্মনিমজ্জন' ঘটলে কাব্য সৃষ্টি হতে পারে। যদিও এই আত্মবিলোপের প্রসঙ্গে তিনি অত্যন্ত সচেতনভাবে স্মরণ করিয়ে দেন যে, আমাদের মহাকাব্যের আরম্ভ সেইখানে যেখানে ব্যক্তি(গত সুখ-দুঃখের অবসান ঘটে। এতত সত্ত্বেও তাঁর কাছে কবিকে কবিতে প্রভেদ আছে।

...২...

সুধীন্দ্রনাথের ভাবনায় গদ্য ও পদ্যের স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত। তিনি গদ্য ও পদ্যের সমীকরণে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। তাঁর কাছেও গদ্যের ভাষা ও পদ্যের ভাষার মধ্যে পার্থক্য আছে। এখানে ল( ণীয় যে তিনি পদ্য ও কাব্যকে ভিন্ন করে দেখেছেন। গদ্যের অবলম্বন বিজ্ঞান আর কাব্যের মধ্যে অন্বিষ্ঠ আছে প্রজ্ঞান। তাঁর কাছে, 'গদ্য চলে যুক্তি(র সঙ্গে পা মিলিয়ে, আর কাব্যনাচে ভাবের তালে তালে( গদ্য চায় আমাদের স্বীকৃতি, আর কাব্য খোঁজে আমাদের নিষ্ঠা('[৬] এ আর কিছু নয়—কাব্যের ভাষার মধ্যে বিশিষ্ট অর্থগত ব্যঞ্জনা-অভিব্যক্তি( আছে তাকেই যেন তিনি ধ্বনিত করতে চান। কাব্যের ভাষার সঙ্গে দৈনন্দিন ভাষার প্রভেদ আছে সুধীন্দ্রনাথ সে কথাই জানাতে চাইছেন। প্রাচীন ভারতীয় কাব্য-তাত্ত্বিক তথা ধ্বনিবাদী ও রসবাদীদের কাব্য সম্পর্কীয় ব্যাখ্যার আভাস অল্প-বিস্তর সুধীন্দ্রনাথের কাব্যভাবনায় ল( ত হয়। যখন তিনি এমন কথা ঘোষণা করেন

> 'শব্দমাত্রেরই দুটো দিক আছে( একটা তার অর্থের দিক, অন্যটা তার রসনিষ্পত্তির দিক। গদ্যের সঙ্গে শব্দের সম্পর্ক ওই প্রথম দিকটার খাতিরে( গদ্যের শব্দগুলো চিন্তার আধার। কিন্তু কাব্য শব্দের শরণ দেয় ওই দ্বিতীয়গুণের লোভে( কাব্যের শব্দ আবেগবাহী।'

তখন বুঝতে পারা যায়, 'রসনিষ্পত্তি'র মতো প্রসঙ্গকে তিনি মানেন। 'রসনিষ্পত্তি' ব্যাপারটি নিঃসন্দেহে বিশেষ প্রাচীন ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রের বিশেষ প্রস্থানের কথা আমাদের স্মরণে আনে। শুধু তাই নয়, কাব্য যে অনির্বচনীয়তার কথা বলে সে কথাও তিনি মান্য করেন। কাব্য অনির্বচনীয় হয়ে উঠলে তাঁর কাছে শব্দের কোনো অর্থ থাকে না—শব্দ তখন অন্তঃশীল আবেগ, সমাবেশ ও ধ্বনি বৈচিত্র্য এবং ছন্দের শোভনতারূপে গ্রাহ্য হয়।

সুধীন্দ্রনাথ মনে করতেন রূপ আর প্রসঙ্গের পরিপূর্ণ সঙ্গমেই কাব্যের জন্ম হয়। অর্থাৎ কিনা রূপ বা দেহ কাব্যে অপরিহার্য। সুধীন্দ্রনাথ ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'বাগাড়ম্বর' প্রসঙ্গকে কাব্যের (( ত্রে প্রয়োজনীয় মনে করেছিলেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ্ কাব্যের কৃত্রিমতা ঘোচাতে 'বাগাড়ম্বর' ছাড়ার কথা বলেছিলেন। ভাষা হল সুধীন্দ্রনাথের কাছে রূপের উপকরণমাত্র— ফলত ভাষার বাগাড়ম্বর তাঁর মনে হয়েছে ভাষার উপকরণ। ভাষার উপকরণ কাব্যের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্পর্কিত বলে তাঁর বিশ্বাস। আধুনিক কবিদের কাছে, 'নিষ্কলুষ কাব্যের রূপ রূপাজীবা নয়, রূপের সঙ্গে প্রসঙ্গের সম্পর্ক বৈধ ও

স্থায়ী'[৭] বলেও তিনি মনে করতেন। কাব্যের মধ্যে ব্যবহৃত শব্দ যে অভিধানের মুখাপে(ী নয় এমন কথাও ঘোষিত হতে দেখা যায় সুধীন্দ্রনাথের কাব্যভাবনায়, এমনকি তিনি মনে করতেন না যে— 'লেখক ও পাঠকের মধ্যে অনুকম্পার সেতুবন্ধই হবে কাব্যের উদ্দেশ্য।'

কাব্যে ব্যবহৃত 'শব্দ' নিয়ে সুধীন্দ্রনাথের গভীরতর ভাবনায় ভাবিত হতে দেখা যায়। তিনি মনে করতেন, বহু ব্যবহারে শব্দের (য় অর্থাৎ অর্থগত সীমাবদ্ধতা এসে যায়, আবার অপ্রচলিত শব্দ অবস্থা বিশেষ গ্রহণীয় ওঠে। যথার্থ শিল্পী বা রূপদ(ের কাছে পুরনো শব্দ কাব্যে কোনো বাধ সাধে না। ফলত, সুধীন্দ্রনাথের মতে, 'বিশিষ্ট ভাবানুষঙ্গের খাতিরে আধুনিক কবি সাধু অসাধু, নবীন-প্রবীন, দেশি-বিদেশি, সকল শব্দকে সমান প্রশ্রয় দেন।'[৮] কবিতায় কোন শব্দ ব্যবহৃত হবে তা প্রাসঙ্গিকতা নির্ভর— তাঁর কাছে। কেননা, ভাষা তাঁর কাছে রূপের উপাদান। আর এ-কারণেই তিনি ভাষা সম্বন্ধে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের বিপ-ববাদকে উপে(া ছাড়া গত্যন্তর নেই বলে মানতেন।

কাব্যের ছন্দ সুধীন্দ্রনাথের কাছে বিশেষ গু(ত্বলাভ করেছে। এক-সময় ছন্দকে কাব্যের অপরিহার্য উপাদান মনে করলেও তিনি শেষ পর্যন্ত কোনো ছন্দকে জ্যেষ্ঠের আসন দিতে চাননি। ছন্দের প্রাসঙ্গিকতা স্বীকার করলেও তিনি ছন্দকে 'যান্ত্রিক কৌশলমাত্র' মনে করেছিলেন। তাঁর কাছে, 'কাব্যের ভাষা যেমন অকৃত্রিমতার কণ্ঠস্বর, কাব্যের ছন্দ তেমনই অকৃত্রিমতার পদধ্বনি' বলে বিবেচিত।[৯] আর মনে হওয়া অসঙ্গত হবে না যে, সুধীন্দ্রনাথের কাব্যভাবনায় এই 'যান্ত্রিক কৌশল'গত ছন্দচেতনা ত্র(মশ কাব্যের প্রে(িতে ফিকে হয়ে গেছে। কাব্য যখন মহত্বে উত্তীর্ণ হয় তখন সংখ্যার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক থাকে না আবার তখন তার ভিতরে পাওয়া যায় সুধীন্দ্রনাথ কথিত 'একটা বিরাট সহজতা'। ভাষার মতোই তাই ছন্দ তাঁর কাছে 'অকৃত্রিম' পদধ্বনি হয়ে ওঠে। সুধীন্দ্রনাথ যখন বলেন, আবেগের সঙ্গে ছন্দের সম্পর্ক কাল্পনিক নয়, তখন মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, ছন্দ ভাষার স্বাভাবিক ধর্ম। আসলে আবেগকে আপনার ছন্দ খুঁজে নিতে হয়। কবিতায় ছন্দের প্রাসঙ্গিকতা আবেগ সম্পৃক্ত( কেবল নয়— দু'য়ের সংমিশ্রণে কাব্যের উৎপত্তি ঘোষণা মধ্যে ল(ণীয় সুধীন্দ্রনাথের ছন্দচেতনা তথা কাব্যভাবনা। সুধীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত তাঁর কাব্যভাবনায় বিবিধ প্রকার ছন্দরীতি বা কৌশলের কথা উল্লেখ না করলেও ছন্দকে স্বতঃস্ফূর্ত বিষয় হিসাবে বিবেচনা করার প( পাতী।

...৩...

সুধীন্দ্রনাথ মনে করতেন, আধুনিক কবিরা 'প্রেরণা' (Inspiration) শব্দটিকে মানেন

কিন্তু তাঁদের কাছে 'প্রেরণা' শব্দটির অর্থ বস্তুগত। 'প্রেরণা বলতে সে বোঝে পরিশ্রমের পুরস্কার।'[১০] তিনি নিজেই পাগাধুনিককালের প্রে(িত ও ধারণার উল্লেখ করে এ-প্রসঙ্গে প্র(ে উত্থাপন করেছেন। তিনি কাব্যকে 'স্বয়ম্ভূ' প্রেরণার বিষয় মনে করলেও তাঁর কাছে কাব্য—'সেই অর্থে স্বয়ম্ভু যে অর্থে স্বয়ম্ভূগাছ। একদিন হয়তো সে বাড়ার আনন্দেই আকাশে হাত বাড়তি। কিন্তু বি(ে সেই আদিম উর্বরতা আজ আর নেই।'[১১] অর্থাৎ কিনা, সুধীন্দ্রনাথের কাছে 'প্রেরণা' অলীক কোনো বিষয় নয়। সারাবি(ে জুড়ে কবি 'বীজসংগ্রহ' রূপ কাব্যের বস্তুগত উপকরণ সংগ্রহ করেন এবং তা থেকে কাব্যের কল্পত(র জন্ম দেন। শুধু তাই বহু পরিচর্যার স্তর অতিত্র(ম করে কাব্য প্রয়াসে অগ্রবর্তী হন। তাঁর কাছে কাব্য কোনো 'দৈববাণী' নয়, 'অনিকাম বুদ্ধি র( ণাবে( ণ তার অবশ্য কর্তব্য'। আলঙ্কারিক উপস্থাপনায় তিনি বলেছেন 'আসলে তার প্রগতি ইজ্রেলীয়দের মতোই পতন ও অভ্যুদয়ে বন্ধুর। তার প্রতিশ্রুত নন্দনের পথ বারংবার ম(র প্রান্তরে দিশা হারিয়েছে, জনপদের কুহকে গন্তব্য ভুলেছে, দেবতাকে ছেড়ে অনুসরণ করেছে অপদেবতার।' [১২] এ-প্রসঙ্গে জীবনানন্দের 'কাব্য-প্রেরণা'র কথা স্মরণ করা যেতে পারে। জীবনানন্দ 'প্রেরণা' বলতে 'অন্তঃপ্রেরণা'র কথা বলেছেন। তিনি 'অন্তঃপ্রেরণা'কে স্বীকার করেন। কবিতা সৃষ্টিতে তিনি ইমাজিনেশন্ ও অনুশীলন ওই দু'টি বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দেন।[১৩] জীবনানন্দ অত্যন্ত সচেতনভাবে ইমাজিনেশনকে 'কল্পনা প্রতিভা'রূপে চিহ্নি(ত করেছেন। একই ভাবে বুদ্ধদেব বসুও 'অনুশীলনে'র উপর গু(ত্ব আরোপ করেছিলেন। 'অনুশীলন' ও 'পরিচর্যা' শব্দ দু'টির মধ্যে আভিধানিক পার্থক্যের মতো ব্যঞ্জনাগত ভিন্নতা থাকলেও প্রয়োগজনিত অভিপ্রায় কাছাকাছি।পরিশ্রমের মাধ্যমে কাব্যসৃষ্টি হয় সে-কথাই যেন ঘোষিত হতে দেখা যাচ্ছে সুধীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দের মধ্যে এখানে কাব্যভাবনাগত ঐক্য ল( ণীয়। সুধীন্দ্রনাথ যেখানে বস্তুবি(ে থেকে উপাদান সংগ্রহ করে 'পরিচর্যা'র[১৪] মাধ্যমে কাব্য সৃষ্টির কথা বলেন, সেখানে জীবনানন্দের ঘোষণা ছিল 'অনুশীলন'। আবার 'প্রেরণা'র প্র(ে দু'জনেই দৈব বা ঈ(ের প্রসঙ্গকে গু(ত্ব দেননি। দু'জনের কাছে কবিতা সৃষ্টি নিঃসন্দেহে পরিশ্রম সাপে( ব্যাপার। যদিও জীবনানন্দ শেষ পর্যন্ত 'ভাবনা প্রতিভাজাত' এই 'অন্তঃপ্রেরণা'কে চূড়ান্ত বলে মনে করেননি। প্রেরণাকেও তিনি 'সংস্কারমুক্ত( শুদ্ধ তর্কের ইঙ্গিত' [১৫] ইতিহাস-চেতনায় সুগঠিত হওয়ার কথা বলেছেন। কবির অসামান্য আত্মোৎসর্গ'[১৬] সুধীন্দ্রনাথের ভাষায় যে উর্ধ্বে উত্তীর্ণ হয় জীবনানন্দ সেখান থেকেও দূরবর্তী নন। জীবনানন্দের কাছে কবিতাসৃষ্টিতে প্রেরণা হল

'নিছকবুদ্ধির জোরে কবিতা লেখা সম্ভব নয়—আরো অনেক

> কিছুর প্রয়োজন—এবং সে সবের সম্মিলিত সম্বন্ধ-শৃঙ্খলের থেকেই প্রেরণার জন্ম হয়।'[১৭]

প্রেরণা তাঁর কাছে অন্যতর অভিব্যক্তি(তে পরিস্ফুট। তিনি মানস আবেগ ও প্রজ্ঞার মিলনের সঙ্গে প্রেরণাকে সুসংপৃক্ত( করেছেন। আর সুধীন্দ্রনাথের কাছে কবিতা পরিশ্রমের ফসল। কবিতার ভিতর 'অতিমর্ত্যতা'র আভাস নেই যেমন তাঁর কাছে তেমন তিনি মনে করতেন, আধুনিক কবিরা 'প্রথাসিদ্ধ ছাঁচ'কে ব্যবহার করতে অসম্মত। এ-প্রসঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের ভাবনায় ঐতিহ্যের কথা এসে পড়ে। আধুনিকতা যে ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে ভিন্নতর বিষয় সুধীন্দ্রনাথ তা মানতেন---মানতেন জীবনানন্দও। তাঁর কাব্যভাবনায় 'প্রেরণা'কে বারবার উল্লেখিত হতে দেখা গেলেও 'প্রেরণা'র প্রকৃতস্বরূপ স্পষ্ট হয়েছে ওই পরিশ্রমের 'পুরষ্কার' হিসাবে। কেননা তিনি কাব্যকে 'স্বয়ম্ভূ' হিসাবে বিবেচনাই করেননি।

সুধীন্দ্রনাথ মনে করতেন, আধুনিক কবিরা মহৎ কবিতা লিখেছেন। তাঁদের কাব্যে উৎকর্ষ আছে আবার জাতিগত ভিন্নতাও আছে। অর্থাৎ কিনা, তিনি কাব্যরচনায় উৎকর্ষের পাশাপাশি উপস্থাপনরীতি সম্পর্কেও সচেতন। কাব্যের কাছে তিনি প্রত্যাশা করতেন যে কাব্য অবশ্যই 'প্রমিতি'তে অবতীর্ণ হবে এবং তখনই তা 'অমর-পদবাচ্য' হওয়ার দাবি রাখবে। আধুনিক কবিদের কাব্য দুরূহ 'দুর্বোধ্য' এ কথা তিনি আংশিকভাবে মান্য করেও—'দুর্বোধ্য' হওয়ার কারণ কেবল কবির হাতে ন্যস্ত করতে চাননি এবং এ-প্রসঙ্গে তিনি পাঠকদের ও সংযুক্ত( করতে চেয়েছেন। তিনি মনে করতেন

> 'তবে আজকালকার শ্রেষ্ঠ কবিতা সম্বন্ধে একটা দা(ণ অভিযোগ আংশিকভাবে সত্য এখনকার কবিতা দুর্বোধ্য। কিন্তু দুরূহ তার দু'টো দিক আছে, একটা পাঠকের দিক, অন্যটা লেখকের।'[১৮]

সুধীন্দ্রনাথ যে দুরূহতার জন্য পাঠককে দায়ী করেন প্রধানত তা তাঁর আলস্যে কারণে, আর সে জন্য কবিকে দোষারোপ করা তাঁর মতে অন্যায়। প্রত্যেকটি কবি তাঁর পাঠকের কাছ থেকে অভিনিবেশ ও অনুশীলনের অপে(া করেন যেমন ঠিক তেমনই শ্রদ্ধা ও একাগ্রতা প্রত্যাশা করেন। পাঠকের কাছে এ দাবিকে তিনি সঙ্গত বলে মানেন। তবুও কবিতার দুরূহতার প্র(ে কবির দায়কেও তিনি অস্বীকার করেন না। তিনি মনে করেছেন 'কিন্তু যে দুরূহতার উৎপত্তি অনুকম্পার অভাবে, যার মূলে কবির দ্বিধা নিহিত, তার কতকটা যুগসন্ধির ফলাফল বটে, তবুও অধিকাংশের জন্যে কবিই দায়ী।'[১৯]

জীবনানন্দ দাশের কাব্যভাবনায় পাঠক-সমালোচক ও কবির সম্পর্ক নিয়ে একাধিক প্রসঙ্গ *কবিতার কথা*' (১৩৪৫), *আধুনিক কবিতা*'(১৩৫৭), '*কবিতার আলোচনা*'(১৩৫৬) , '*চি, বিচার ও অন্যান্য কথা*' (১৩৫৬) নামক প্রবন্ধে উত্থাপিত হয়েছে। তিনি যে পাঠকের মধ্যে অধ্যয়ন বা 'চর্চার অভাব' ল(্য করেছিলেন ঠিক তা নয়—'ধ্যান-গভীর' বোধ প্রত্যাশা করেছিলেন। যদিও এ-কথা সত্য, কবিতার ভালো সমালোচক হিসাবে তিনি কবিকেই বেশি গু(ত্ব দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন, যাদের মন কবিতা সৃষ্টির জন্য তৈরি নয়—তারা কাব্যালোচনায় 'পরিচ্ছন্নতা', 'পাণ্ডিত্য' প্রভৃতি দেখাতে সমর্থ হলেও শেষ পর্যন্ত গভীরতালাভে ব্যর্থ হয়ে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। [২০] সুধীন্দ্রনাথ তাঁর '*কাব্যের মুক্তি*' (১৯৩০) প্রবন্ধে কবির নানা জাতির কথা যখন বলেন তখন স্পষ্টতই বোঝা যায়, কবি ভেদে তাঁদের স্বাতন্ত্র্যের কথা তিনি বলতে চেয়েছেন। জীবনানন্দ দাশও কবিদের 'ব্যক্তি(ত্বের স্তরভেদ' স্বীকার করেছেন। '*কবিতার আলোচনা*' (১৩৫৬) প্রবন্ধে এ বিষয়ে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি মনে করতেন 'কবিদের ভিতরে পার্থক্য রয়ে গেছে( এবং কবিতার পাঠক ও সমালোচকদের ভিতরে। সমালোচক হিসাবে কোলরিজ ও এলিয়ট—ইয়েটস্ ও পাউণ্ড-এর উপলব্ধি ও অনুমিতির এত বেশি প্রভেদ তাই।' [২১] অর্থাৎ কিনা, জীবনানন্দ কাব্যালোচনায় পাঠক-সমালোচক কিংবা কবি-সমালোচক প্রত্যেকের কাছে গভীর কাব্যবোধ দাবি করতেন। কিন্তু তাঁর কাছে কবি ও সমালোচকদের এই স্তরভেদ----ভালো-মন্দের ভেদ যতটা নয়, তার চেয়ে বেশি উপলব্ধি ও অনুমিতির প্রভেদ। তাঁর পাঠকের কাছে প্রত্যাশা যে, একজন সচেতন পাঠককে ত্র(মাগত যুগের ভিতর দী(িত হতে হবে নতুবা সাহিত্যের শা(্বত প্রাণ ও অভিজ্ঞান পাঠকের প(ে গ্রহণ করা কেবল কঠিনই হবে না—একই সঙ্গে অসম্ভব হবে।[২২] হয়তো প্রায় একই কথা বলা যায়, সুধীন্দ্রনাথের কাব্যভাবনাসম্পর্কে—অন্যধ্বনিতে। যুগের সাহিত্যের রসাস্বাদন করতে হলে পাঠকেও প্রস্তুতি নিতে হয়। পাঠক যদি তাঁর 'আলস্যে'র কারণে 'যুগের ভিতর দী(িত' না হন তবে কবিতার 'প্রাণ' উপলব্ধিতে তিনি বঞ্চিত হবেন। 'কাব্য সম্বন্ধে কোনো ধরা-বাঁধা সংস্কার' নিয়ে কাব্যালোচনায় অগ্রবর্তী হওয়াতে জীবনানন্দের যেমন গভীর আপত্তির কথা '*দেশকাল ও কবিতা*' (১৩৫৬) প্রবন্ধ পাঠে জানতে পারি তেমনই ধারণার কথাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে সুধীন্দ্রনাথের কাব্যভাবনায়। সুধীন্দ্রনাথ বি(্বাস করতেন

> 'জীবনের সহজসূত্র পাঁচ হাজার বছরে যে জটিল ও কুটিল
> আকার ধরেছে, তাতে প্রাথমিক ঋজুতা স্বতই অনুপস্থিত( এবং
> আমাদের জ্ঞান যেহেতু কমছে না, প্রত্যহ বেড়েই চলেছে,

তাই প্রাক্তন বিশ্ববীক্ষার অবৈকল্য আজ অভাবনীয়।'[২৩]

সময়ের পরিবর্তনের কথা দু'জনেই মানেন এবং মানেন বলেই দু'জনেই কাব্যবিচারে সময় সমকালকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। যদিও সুধীন্দ্রনাথ তথাকথিত সনাতন সত্য সমূহে যতটা বীতশ্রদ্ধ জীবনানন্দ তা থেকে একটু স্বতন্ত্র অভিমতই প্রকাশ করেন। জীবনানন্দ মনে করতেন 'নিজের যুগে বাস করেও আরো অনেক যুগে বাস করবার খানিকটা স্বভাব (মতা, নিজের সমাজের পুরোপুরি জীব হয়েও অন্য অনেক সমাজে নিজেকে যথাসম্ভব স্বচ্ছন্দে স্থিত ও মিলিত করে নেবার মতো অনুভূতি ও বিচারের স্পষ্টতা না থাকলে নানা দেশ ও সময়ের কবিতা পাঠে বিশেষ ফল হয় না...।' এ-কারণেই তিনি সমালোচকদের পৃথিবীর বিখ্যাত সব সময়ের কবিতা সরস ও যুক্তিস্বচ্ছভাবে পড়বার কথা বলেছিলেন। তথাকথিত সনাতন সত্যে বীতশ্রদ্ধ হওয়ার আগে জীবনানন্দের মত হল, কবিতার প্রকাশ পরিবর্তিত হওয়ার পাশাপাশি সমালোচককে 'সেই সেই যুগের সমাজ ও কাব্য সম্বন্ধে নির্মল, সমীচীন লেখা'[২৪] অবশ্যই পাঠ করা প্রয়োজন। যদিও জীবনানন্দ মনে করতেন, এতসব পড়ে সমলেই ভালো সমালোচক হয় না, দু'একজন হয়। সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি অশিক্ষিত পটুত্বকে নিন্দা করে বলেছেন, জ্ঞানেরই দরকার বেশি, সেই জন্যই অধ্যয়নের দরকার। জীবনানন্দের কাছে অবশ্যই শাশ্বত-সনাতন শব্দের কোনো মানে হয় না—কেননা পৃথিবীর কোনো গ্রন্থ শাশ্বত নয়।

সুধীন্দ্রনাথের কাছে কবি ও পাঠকের সমস্যা সনাতন বলে বিবেচিত। '*ধ্রুপদ খেয়াল*'[২৫] (১৯৩২) প্রবন্ধে, তিনি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, পাঠক না লেখক কে স্থানচ্যুত হয়ে একে অন্যের কাছে নেমে আসবে? অর্থাৎ সাহিত্যের মর্ম গ্রহণে পাঠক না লেখক সর্বাধিক প্রাধান্য পাবেন। এর কোনো সরল রৈখিক নির্দেশ সুধীন্দ্রনাথ দেননি। তাঁর মতো, 'তবু ভিন্ন যুগের উত্তর ভিন্নচির পরিচায়কএবং এই বৈচিত্র্য স্বাভাবিক। কারণ সামাজিক জীবনের প্রতিনিধি হিসাবেই পাঠক কবির কাছে মর্যাদা পায়এবং জীবন যেহেতু পরিবর্তনশীল, তাই সাহিত্যের অবস্থান্তর অবশ্যম্ভাবী।'[২৬] জীবনের প্রাসঙ্গিকতা সাহিত্যের প্রেক্ষিতে উল্লেখিত হলে সুধীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সচেতনভাবে 'সৎ-সাহিত্য'কে জীবন সংপৃক্ত করতে অনাগ্রহী। ফলত তিনি মনে করতেন 'কিন্তু সৎ-সাহিত্যমাত্রেই যখন সুবিধা মতো জীবন্ত আখ্যা চেয়ে বসে, তখন সাহিত্যের সম্পূর্ণ জীবন্মুক্তিনিতান্ত অসম্ভব।'[২৭]

সুধীন্দ্রনাথ তৎকালীন সাহিত্যের মধ্যে দুরূহতার প্রসঙ্গ '*কাব্যের মুক্তি*' প্রবন্ধে উত্থাপন করলেও কি কারণে এমন 'দুরূহতা' কাব্যে জায়গা পেল তার কোনো ব্যাখ্যা

উপখাপিত করেননি। কিন্তু 'ধ্রূপদী খেয়াল' প্রবন্ধে তার একটা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। সংক্ষেপে আধুনিক কাব্যের দুরূহতা হল

১. কবিতাতে ছন্দোমুক্তি ঘটানো
২. ব্যাকরণশুদ্ধি হীনতা
৩. বিনা প্রয়োজনে বিদেশি শব্দকোষের ঋণ স্বীকার
৪. ছেদ যতি বর্জন
৫. অজ্ঞাতকুলশীলদের (পূর্ববর্তী) রচনা উদ্ধার
৬. ঐতিহ্যকে উপহাস্য করা ইত্যাদি।

আধুনিক কবিদের বিরুদ্ধে তাঁর এই অভিযোগ থেকে সুধীন্দ্রনাথের কাব্যভাবনার ইঙ্গিত লাভ করা যেতে পারে। স্বকীয়তাকে আধুনিকরা যখন গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন তখন সুধীন্দ্রনাথ স্পষ্টত বললেন যে, এই স্বকীয়তাই আধুনিকদের অনর্থের মূল। সুধীন্দ্রনাথ স্বকীয়তাকে মান্য করলেও তাঁর সাহিত্যের একমাত্র লক্ষ্য, লেখকের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে 'পাঠক-চৈতন্যের উদ্বোধন' ঘটানো। জীবনানন্দ অবশ্য কবিতার ব্যাখ্যায় পাঠকের চাইতে কবিকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন, যদিও কাব্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনিও সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে একই মত পোষণ করতেন। তিনিও মনে করতেন

১. কবির সিদ্ধিও তার নিজের জগতে কাব্য সৃষ্টির ভিতর।
২. শ্রেষ্ঠ কবিতা—অন্য যে কোনো শ্রেষ্ঠ শিল্পের মতো কবি-মানসের আপন অভিজ্ঞতাকে যতদূর সম্ভব অখুন্ন রেখে—নিঃস্বার্থ জিনিস। লক্ষণীয়, দু'জনেই আপন 'অভিজ্ঞতা' প্রকাশের কথা বলেছেন।

সুধীন্দ্রনাথ যে 'পাঠক চৈতন্যের উদ্বোধন' ঘটানোর কথা বলেন—প্রকারান্তরে তাকেই তিনি 'কবিপ্রতিভা' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। '*ঐতিহ্য ও টি . এস. এলিয়ট*' (১৯৩৪) প্রবন্ধে সুধীন্দ্রনাথ 'প্রেরণা' নামক এক অলৌকিকশক্তির প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করে যখন বলেন 'ব্যক্তিমানব কী উপায়ে বিশ্বমানবের সঙ্গে মিশবে, তার সন্ধানেই কবি প্রতিভার সার্থকতা', তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে তাঁর কাব্যভাবনা বিশেষ উদ্দেশ্যমুখী। তিনি মনে করতেন যে, শুধু কবি নয়, ভাবুকমাত্রেই যে রহস্যের উদঘাটনে বদ্ধপরিকর তা হচ্ছে---ব্যক্তি ও সমাজের, ব্যষ্টি ও সমষ্টির, বিশেষ ও সাধারণের সম্পর্ক নির্ণয়ে। তাই তাঁর কাছে সাহিত্যের মূল সমস্যা ও সনাতন দর্শনের সঙ্গে পার্থক্য কেবল ভাষায়— ভাবে নয়। আবার তিনি এও মনে করতেন 'কিন্তু ঐতিহ্য ব্যাতিরেকে— ট্রাডিশন ব্যাতীত— শিল্প সৃষ্টি একেবারেই অসম্ভব, শুধু তার অনুবৃত্তি

প্রাণহীন নয়, সংকল্পের সংস্পর্শে সঞ্জীবিত, তার অনুকরণের উদ্দেশ্য উদ্ভাবন।' [২৮] সুধীন্দ্রনাথের কাব্যভাবনায় 'প্রেরণা'র যেমন বস্তুমুখী দিক আছে তেমনি তিনি ভাষায় কিংবা বক্তব্য উপস্থাপনে সাহিত্যের সঙ্গে দর্শনের ভিন্নতা লক্ষ্য করলেও আস্বাদন তথা ভাবগ্রহণে অভিন্নতাকেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

এ প্রসঙ্গে তিনি টি. এস. এলিয়টের প্রসঙ্গ আনেন। তাঁর মতে, এলিয়ট হলেন সেই ধরনের কবি যিনি দার্শনিকতাকে কাব্যের উপকরণ হিসাবে ব্যবহার না করে কবি-প্রতিভার অংশ করে নিয়েছিলেন। এভাবে সুধীন্দ্রনাথ কাব্যের সঙ্গে দর্শনকে সংপৃক্ত করতে চেয়েছেন। যদিও এই একই প্রবন্ধে সুধীন্দ্রনাথের অন্যতর ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়, যা তাঁর পূর্বোল্লিখিত মন্তব্যের সঙ্গে অনেকটাই সামঞ্জস্যহীন। তিনি বলেছেন

> 'দর্শন বলতে আমি মগ্ন চৈতন্যের সেই দিব্যদৃষ্টিকে বুঝি না, যার আশীর্বাদে বিশ্লিষ্ট বস্তুবিশ্বের সম্বন্ধ শৃঙ্খল প'রে আমাদের বসে আসে, বুঝি মানবমস্তিকের সেই চিন্তাশক্তিকে, যার চেষ্টা বিসংবাদ ঘোচায়, যার অধ্যাবসায় বচন বিরোধের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতি আনে। এই অর্থের দর্শন আর যুক্তির অভেদাত্মা এবং দর্শনের সঙ্গে কাব্যের সম্পর্ক শিথিল।'[২৯]

সুতরাং দর্শন ও সাহিত্য সম্পর্কিত ভাবনায় সুধীন্দ্রনাথ কোনো একক সিদ্ধান্তে উপনীত হন না ঠিকই তবু তিনি কবিকে সমাজের মধ্যে অন্বিত করে দর্শনের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করতে প্রয়াসী বলে মনে হয়। কেননা, সুধীন্দ্রনাথ দর্শনকে বিস্তারিত অর্থে মনে করেছিলেন---শুধু কাব্য কেন, মানুষের সকল প্রক্রিয়াতেই এর প্রসার আছে। যদিও তিনি সতর্ক করে দিয়ে জানিয়েছে, 'কবির দর্শনিক মনোভাব আর কবিতায় তত্ত্ববিচার এক জিনিস নয়।'[৩০]

লক্ষণীয় যে, জীবনানন্দের কাব্যভাবনায় ব্যক্তিমানব ও বিশ্বমানবের সম্পর্ক, সাহিত্য ও দর্শনের মধ্যে সম্বন্ধ, সাহিত্যে ঐতিহ্য, কবি-প্রতিভা ও প্রেরণা প্রসঙ্গ নানাভাবে উত্থাপিত হচ্ছে। জীবনানন্দের কাছে কবিতা ও জীবন একই জিনিসের—দুই রকম উৎসারণ রূপে বিবেচিত হয়েছে। জীবন বলতে এক্ষেত্রে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন এক ধরনের অসংলগ্ন বাস্তব যা সচরাচর ঘটে। অন্যদিকে কবিতা হল, কবির 'কল্পনা-প্রতিভা'-র বিষয় যা সৃষ্টি করে কবির বিবেক শুধু 'সান্ত্বনা' পায় না— পাঠকের ইমাজিনেশনও তৃপ্তি পায়। সুধীন্দ্রনাথ যেখানে 'পাঠকের চৈতন্যের উদ্বোধনে'র প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন সেখানে জীবনানন্দ পাঠকের 'ইমাজিনেশনে'র প্রতি মনোযোগ

আকর্ষণ করেন। আপাতভাবে দু'জনের ভাবনার মধ্যে ভিন্নতা থাকলেও গভীরতর ব্যঞ্জনায় অভিন্ন বলে মনে হয়। কিন্তু এই ব্যক্তি(মানব ও বি(েমানব প্রসঙ্গ একটু অন্যরকম। জীবনানন্দের কাছে কবিতা ব্যক্তি( ও উত্তরব্যক্তি( সত্তাকে প্রকাশ করবার মহৎ দিক। ফলত তিনি শান্তির জন্য 'মাত্রাচেতনা'য় পৌঁছনোর কথা বলেন—জীবনে ও কবিতায়। সুধীন্দ্রনাথ ব্যক্তি( মানবকে বি(েমানবে উত্তীর্ণ করবার জন্য যখন কবি-প্রতিভার উল্লেখ করেন তখন '*সত্য বি(োস ও কবিতা*' (১৩৫৬) প্রবন্ধে জীবনানন্দ উচ্চারণ করেন যে, সৎ সমাজের ভাবিত মঙ্গল ছাড়া ব্যক্তি(র নিজের মাথায় কোনো মঙ্গল নেই—এই রকম যাঁরা মনে করেন তিনি তাঁদের মতের অভিমুখে মত দেননি। তিনি মনে করেছেন, সে রকম কোনো স্বাধীনতা নেই ব্যক্তি(র। আবার দর্শন ও সাহিত্য প্রসঙ্গে তাঁর মত সুধীন্দ্রনাথের অভিমুখী হলেও তিনি সাহিত্যে 'দর্শনে'র ভূমিকাকে প্রায় গ্রাহ্য করেননি। তিনি মনে করেছেন চিন্তা, ধারণা, মতবাদ, মীমাংসা কবির মনে 'প্রাক-কল্পিত' হয়ে কবিতার রূপ নিতে চাইলেও তা শেষ পর্যন্ত কবিতা নয়—পদ্য হয়। অর্থাৎ কিনা পদ্যের আকারে সিদ্ধান্ত, মতবাদ, চিন্তার প্রত্রি(য়া পাওয়া যায়—যাকে কবিতা বলা যায় না। জীবনানন্দের মত হল, এ সকল বিষয়ে জিজ্ঞাসা থাকলে সেই সব বিষয় যাঁরা জানাতে স( ম তাঁদের কাছে যেতে হবে। কবিতার কাছে নয়। কবিতার কাজ লোকশি(া দেওয়া নয়, কিংবা দর্শনের উদঘাটন করা নয়—কবিতা বিশেষ এক ধরনের রস সৃষ্টি করে, বিশেষ এক ধরনের প্রতীতি সত্যের জানান দেয় যা দর্শন বা বিজ্ঞান থেকে লাভ করা সম্ভব নয়।

এখন সং( েপে, সুধীন্দ্রনাথের কাব্যভাবনার কয়েকটি বিশেষদিক নিম্নোল্লিখিত উক্তি(র মাধ্যমে বুঝে নিতে সচেষ্ট হব। কবি ও কবি-সমালোচক হিসেবে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও জীবনানন্দ একই দেশ-কাল-সমাজের অন্তর্গত হলেও দু'জনের কাব্যভাবনায় ঐক্য যেমন আছে তেমনই বৈপরীত্যও আছে।

১. 'রসের নিমন্ত্রণে জাতিভেদ নেই---সেখানেই গদ্য-পদ্য উভয়েরই সমান অধিকার।'

২. 'শিল্প-প্রতিভা লোকোত্তর প্রেরণার মুখপাত্র।'

৩. 'সাহিত্যের একমাত্র ল( ্য লেখকের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে পাঠক-চৈতন্যের উদ্বোধন।'

৪. কাব্য 'চৈতন্যে-উদ্বোধক'।

৫. 'মহৎ কাব্য দঃখোদ্ভূত, সন্তুষ্টি কবি-প্রতিভার চিরশত্রু।'

৬. 'ভাবের রাজ্যে পদ্যই পুরোধা'

৭. 'দৈনন্দিন ভাষা আর কাব্যের ভাষা বস্তুতই বিভিন্ন, বৈধ মতেই বিভিন্ন...।'

৮. 'কবিতা শ্রেষ্ঠ শব্দের সর্বোৎকৃষ্ট বিন্যাস।'

৯. 'প্রকৃত দুর্বোধ্য হল সেই কবিতা 'যার মূলে কবির নিজের দ্বিধা নিহিত।'

১০. স্বকীয়তাই আধুনিক অনর্থের মূল( এবং উত্ত( মায়ামৃগের অনুধাবন-কালে আমরা কেবলই ভুলে যাই যে সাহিত্যের একমাত্র ল( ্য লেখকের অভিজ্ঞতা-সম্বন্ধে পাঠকচৈতন্যের উদ্বোধন।'

১১. 'লেখক ও পাঠকের মধ্যে অনুকম্পার সেতুবন্ধই যদি কাব্যের উদ্দেশ্য হয়, তবে কাব্যের শব্দ চিরদিনই অভিধানের মুখাপে( ী থাকবে।'

১২.'ভাষার বিষয়ে তার একমাত্র মানদণ্ড প্রাসঙ্গিকতা( কেননা ভাষারূপেরই উপাদান।' ১৩. অতএব কাব্যরচনা ও কাব্যবিবেচনা একই ব্যাপারের প্রকারান্তর( কিশোরের অব্যক্ত( কবিতা পৌঢ়ের বাচাল বৈদগ্ধ্য বদলাক বা না বদলাক, পরিণত কাব্য যে আশৈশব বিতর্ক-বিচারের মুখাপে( ী, তাতে আমার তিলার্ধ সন্দেহ নেই।'

১৪. 'ব্যক্তি(গত মনীষায় জাতীয় মানস ফুটিয়ে তোলাই কবি-জীবনের পরম সার্থকতা।'

১৫. 'কাব্য জীবনের সমালোচনা।'

পূর্বেই বলেছি, জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথের মধ্যে কাব্যভাবনায় ঐক্য আছে যেমন, তেমনই বৈপরীত্য আছে। আধুনিক বাংলা কবিতার বিকাশে দু'জনের কৃতিত্ব অপরিসীম। এঁদের কাব্যভাবনায় প্রতিভা-কল্পনা-প্রেরণা, পাঠক-সমালোচক, কাব্যের বিষয়-রীতি, দুরূহ ও দুর্বোধ্যতা, ঐতিহ্য ও আধুনিকতা প্রভৃতি বিষয় প্রধান্য পেলেও---সুধীন্দ্রনাথ যেখানে কবিতাকে জীবন থেকে ভিন্নতর দৃষ্টিতে দেখেছেন, সেখানে জীবনানন্দ কবিতা ও জীবনকে একই মাত্রাচেতনায় দেখার প( পাতী। আবার, কাব্যালোচনায় সুধীন্দ্রনাথ কলাকৈবল্যবাদী হলেও জীবনানন্দের এ-রকম কোনো ধারণায় বিশেষ বি(্বাস ছিল না। যদিও তিনি মানতেন, কবিতা'স্বতন্ত্র রসাস্বাদ'।

## সূত্র ও টীকা

১. সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সংগ্রহ / দে'জ পাবলিশিং, ১৪০৭, কলকাতা, পৃ ৬
২. ঐ, পৃ ১০
৩. ঐ, পৃ ১৩

৫. ঐ, পৃ ২০
৬. ঐ, পৃ ২২
৭. ঐ, ২৪
৮. ঐ, পৃ ২৪
৯. ঐ, পৃ ২৭
১০. ঐ, পৃ ৩০
১১. ঐ
১২. ঐ
১৩. কবিতার কথা কবিতা প্রসঙ্গে / সিগনেট প্রেস, কলকাতা, ১৪০৫, পৃ ৪২
১৪. কাব্যের মুক্তি( / ঐ, পৃ ৩০
১৫. কবিতার কথা কবিতা প্রসঙ্গে / সিগনেট প্রেস, কলকাতা, ১৪০৫, পৃ ৪২
১৬. কাব্যের মুক্তি(/ পৃ ৩০
১৭. কবিতার আত্ম ও শরীর কবিতার কথা, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, ১৪০৫, পৃ ৪৫
১৮. ঐ, পৃ ৩৩
১৯. ঐ, পৃ ৩৩
২০. কবিতার কথা, ঐ, পৃ ১০৪
২১. ঐ, পৃ ১২০
২২. ঐ, পৃ ৬৬
২৩. কাব্যের মুক্তি( / ঐ, পৃ ৩৩
২১. কবিতার কথা / ঐ, পৃ ১২০
২২. ঐ, পৃ ৬৬
২৩. কাব্যের মুক্তি( / ঐ, পৃ ৩৩
২৪. কবিতার কথা/ ঐ, পৃ ৭৭
২৫. স্বগত সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সংগ্রহ—দে'জ, ১৪০৭ পৃ ৩৭
২৬. ধ্রুপদী খেয়াল/ ঐ, পৃ ৩৭
২৭. ঐ পৃ ৩৭
২৮. ঐতিহ্য ও টি. এস. এলিয়ট / সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সংগ্রহ, ১৪০৭, পৃ ১৪০
২৯. ঐ, পৃ ১৪৬
৩০. ঐ, পৃ ১৪৬

পত্রিকা দেখুন ওয়েবসাইটে

http://ebongprantik.wordpress.com/

₹ 135/-

Published By : Ashis Roy, Vill - Bhagwanpur, P.O. - B.H.U, Varanasi - 221005, Uttar Pradesh &
Debasish Roy, Kestopur Chandiberiya Sarada Palli, Kestopur, Kolkata - 102
Ph : 09415243816, 9332358644
Email : ashis.jibonda.roy@gmail.com